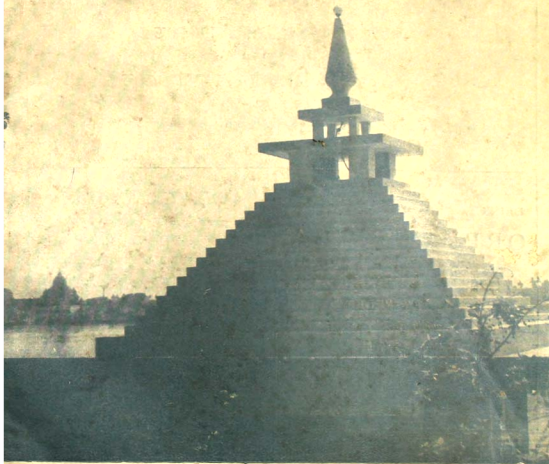


ভানুশে



জ্যৈষ্ঠ • তেরশ' একানব্বই • অষ্টাত্রিংশ বর্ষ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম । সিউড়ী



ভারতের মোটর পার্টস ব্যবসায়
একটি ঐতিহ্যপূর্ণ বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
হাতড়া মোটর কোম্পানী
- লিমিটেড -

রেজিষ্টার্ড অফিস-১৬৫, শরৎ বোস রোড

কলিকাতা - ২৬

প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র-১৬, রাফেল্ল নাথ মুখার্জি রোড

কলিকাতা - ১

অগ্রান্ত শাখা--দিল্লী ঃ কটক ঃ ধানবাদ ঃ শাটনা ঃ শিলিগুড়ি ঃ গোঁড়াট



DRINK

ORPHAN'S TEA

For

HEALTH & ECONOMY

ORPHAN TEA SYNDICATE

133 Cornwallis St., Shyambazar

Phone : 55-2704

ফোন : ৫৪-৭২৪৬

এন্, কে, স্পোর্টস্

৬৭৫, মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলিকাতা-৬

স্বাভাবিক খেলাধুলার সবচেয়ে এবং কাশ
শীল্ড ইত্যাদি বিক্রিতে বিভিন্ন ক্রীড়ামোদী
কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও নিউক্লিও প্রতিষ্ঠান।

ঔষধমূলক আশ্রম পরিচালিত বিজ্ঞানী
সমূহের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় খেলাধুলার
সবচেয়ে আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

"স্বাস্থ্যের মাঝে স্বাস্থ্য রতন আছে"- ডাঃ প্রীতীকর

D. RATAN & Co.
Photographers **PHOTO**
27, CORNWALLIS ST. CALCUTTA
PHONE : 54 - 8711



ডি. রতন কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফোন ৩৪-৮৭১১
২২০, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

জৈষ্ঠ
দ্বিতীয় সংখ্যা



অষ্টাত্তিংশ বর্ষ
'ভেরশ' একাদিকই

গীত	২৭	শ্রীশ্রীঠাকুর
"কথামতের কথা সে যে সবার মূখের বাধা"	২৮	স্বামী সত্যানন্দসেব
নব সে দ্বিগুণাপ্ত	২৯	স্বামী সাধনানন্দ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য	৩১	শ্রীঅর্চনাপত্রী
গান	৩১	শ্রীসোমেশ্বরনাথ স্বাম্যাপাথার
শ্রীশ্রীভবতারিণী স্মৃতি আলোচ্য (১)	৩২	স্বামী বোধানন্দ
প্রবণ-মঙ্গলম্	৩৩	শ্রীসান্দ্যাপত্রী
মাতৃ-বন্দনা	৩৫	শ্রীগোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী
সিউডুইড গোপালজী	৩৬	শ্রীনিরঞ্জন স্বাম্যাপাথার
আমার আত্মকথা	৪১	শ্রীসরগাপত্রী
শ্রীশ্রীসারদা পুঁথি (৪)	৪২	অধ্যক্ষ স্বামী কৃষ্ণানন্দ

English Publications of Swami Satyananda Dev

Divine Flashes : This contains the practical aspects of religion. Rs. 5-00

Song of the Soul : This is a composition of songs on Sree Ramkrishna The Holy Mother, Swami Vivekananda, Swami Abhedananda and others. Rs. 5-00

Abhedananda - The Messiah of Vedanta : This is a biography of Swami Abhedananda, the philosopher and the Seer. Rs. 7-00

The Philosophy of Swami Vivekananda and Swami Abhedananda This is a comprehensive account of the philosophies of the great Swamis Rs. 4-00

Divine Rhyme : This has thrown a rare light on spiritual sadhana.

Abhedananda Speaks : This contains some sayings of the great Swami Rs. 5-00

SREE SREE RAMKRISHNA ASHRAM

(Publication Department

2, Prankrishna Saha Lane, Baranagar, Calcutta-700036. Phone : 52 7133



শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, সকল রকম শীতের পোষাক, বেনারসী, সিদ্দ, তাঁতবস্ত্র,
মিলবহু, সর্বপ্রকার তৈয়ারী পোষাক, হোসিয়ারী ও আধুনিক ডিজাইনের
ডেকরণ, টেরিলিন, টুফিল ও ওয়াশ এণ্ড ওয়ার শাড়ী বিক্রোতা ।

রামকানাই ষ্মানিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

বড়বাজার, কলিকাতা-৭ ফোন : ৩০-১৩০৩

**Electrical Motor, Double Ended Grinder, Polishing
& Buffing, Flexible Shaft Grinder Etc.**

MANUFACTURED BY

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2, PRIYANATH MIDDYA ROAD (Belgharia)

CALCUTTA-700056. Phone : 58-1575

With Best Compliments From :

RELIABLE ENGINEERS & TRADERS

25, Harachandra Mullick Street.

Calcutta-700005

Gram : DISWASHING

PHONE : { Office 24-1236
Works : 55-1738

PELICAN ENGINEERS

Fabricators of Stainless Steel Chemical Plants,
Pharmaceutical & Fruit Preservation Equipments.

4, HARTFORD LANE, CALCUTTA-700016.

Works : 161, Upper Chitpur Road,
Calcutta-700005

ন জাতু কামা কামান্য উপভোগেন সার্যতি ।

হবিষ্য কুবব্ধেণ কৃত এবাভিব্যক্তে ॥ (২)

রূপ-সাধনার

উদাসী গৌরীনাথ

বৃন্দপর্ণিমা

পুরাতন ভাবমুখে

আশ্রম-সংবাদ

গদ্যব্যাসন

দ্বীপী গঙ্গল

This Divine Land

The Truth of Yajna 5)

Kundallni

The Goal of Our Life

৪৫

৪৭

৫৮

৫৯

৫২

৫৪

৩

৪

9

10

12

13

শ্রীমতী-প্রদ্যায়ন শাস্ত্রী

শ্রীকৃষ্ণ মথোপাধ্যায়

শ্রীজ্যোতিষপুরী

স্বামী শিবানন্দ

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

দ্বীপুমাধুরী

রংজন বীরমুদ্রী

Swami Sadhanananda

Sri Sri Baba Thakur

Swami Dilyanandaji

Dr. H. P. Chakraborti

‘ভাবমুখের নিয়মাবলী’

‘ভাবমুখ’ মাসিক পত্রিকা—সিউডী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের মুখপত্র ।

বর্ষান্তে বৈশাখ মাসে । বর্ষের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু কমপক্ষে ৬ মাসের গ্রাহক হইলে সুবিধাজনক হয় । বার্ষিক চাঁদা বছরের প্রথমেই অগ্রিম দিতে হইবে ।

বার্ষিক মূল্য সভ্যাক টা: ১৪.০০ । স্বাধ্যাসিক টা: ৭.০০ ।

রচনা : ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ হইয়া থাকে । প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠান প্রয়োজন । ভ্রমণের পথে অমনোনিষ্ঠ প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয় । কোন রচনা প্রকাশ করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ । সমালোচনার প্রয়োজন হইলে দুই কপি করিয়া পুস্তক প্রেরণ করা আবশ্যিক ।

বিজ্ঞাপন : বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞপকল্প পূর্বমাসের মধ্যে পাঠাইলে উহা পরবর্তী মাসে প্রকাশ করা হয় । বিজ্ঞাপনের হার পরোক্ষে জানিতে পারিবেন ।

বিজ্ঞাপন গ্রাহক গ্রাহিকাদ্বয়ের প্রতি নিরক্ষণ এই যে, পত্রিকা উপযুক্ত সময়ে না পাইলে সর্বপ্রথম স্থানীয় ডাকঘরে সম্মান লইবেন এবং পরে অফিসে জানাইবেন । পত্রাদি লিখবার সময় গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করিবেন ।

কোন গ্রাহক-গ্রাহিকা ঠিকানা পরিবর্তন করিলে উহা পূর্ববর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে কার্যালয়ে জানান আবশ্যিক ।

বার্ষিক চাঁদা বৈশাখ মাসের মধ্যে মণিঅর্ডার দ্বারা, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা মণিঅর্ডার কর্মের সর্বনিম্ন স্থানে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া ‘স্বামী পরমানন্দ, ভাবমুখ পত্রিকা সচিব, ২, শি. কে. সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬’ (ফোন : ৫২-৭১৩৩) এই ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন ।

ঐতিহাসিক ভাষা

স্বাধীনতা যোদ্ধা প্রতিষ্ঠান

নারিকেলডাঙ্গা রোলার ফ্লাওয়ার মিলস্

১৭/৪, কানন গার্ডেন রোড, কলিকাতা-৬

স্থাপিত ইং ১৮৮৬ সাল

২৮ বৎসরের

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

{ ৩৫-৪১২৪
৩৫-৪১১৫

। স্বত্বাধিকারী ।

রথীন্দ্রনাথ ঘোষ এ্যাণ্ড বানার্স

ঐতিহাসিক সত্যানন্দদেবের নবপ্রকাশিত কয়েকটি পুস্তক

সাপুর চলার পথে

সাপুরের জীবনের পথ নির্দেশ মূল্য—৬'০০

উপনিষদ চয়ন

উপনিষদের কয়েকটি প্রকারের অনুপম ব্যাখ্যা
মূল্য—৪'০০

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও অবতারবাদ

ঐতিহাসিকদেবের অবতারত্ব সম্পর্কে নবীন
দৃষ্টিতে আলোচনা মূল্য—৩'০০

৪। আশীর্বাদ—

স্বামী সত্যানন্দদেবের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত
আশীর্বাদের সংকলন মূল্য—৪'০০

। প্রাপ্তিস্থান ।

ঐতিহাসিক গ্রন্থমালা, ২, প্রাণ কৃষ্ণ সাহা গেষ

কলিকাতা-৭০০০০৬, ফোন : ৫২-৭১০০

জ্যৈষ্ঠ : তেরশ' একানব্বই]

চাবমুখে

[অষ্টাবিংশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা]

* আশ্রয় পক্ষ পঞ্জী : আষাঢ়, ১৩৯১

৭ই আষাঢ়	বৃহস্পতিবার	২১শে জুন	— অম্বুবাচী প্রবর্তিত ।
১১ই	সোমবার	২ শে	— একাদশীর উপবাস, অম্বুবাচী নিবর্তিত ও রাতে হোম ।
১৫ই	শুক্রবার	২৬শে	— রাতে অমাবস্যার হোম ।
১৬ই	শনিবার	৩০শে	— শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ।
২০শে	শনিবার	৭ই জুলাই	— শ্রীশ্রীবিপ্লবভারিণী কুজোপবাস ।
২৪শে	রবিবার	৮ই	— শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পূর্ণিমা ।
২৯শে	শুক্রবার	১৩ই	— পূর্ণপূর্ণিমা ও রাতে পূর্ণিমার হোম ।

* বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে ।

57-4562

TRINAYANI ELECTRIC Co.

Electrical Engineers & Govt. Licensed contractors

145, LAKE TOWN, Block—'A'

CALCUTTA-700089

মডার্ণ ডেকরেটিস

শুভবিবাহ ও যে কোন উৎসবের

পাণ্ডুল ও গৃহসজ্জায়

১৭এ, ডব্লু. সি. বানান্ধী স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ফোন : ৭৭-২১৪২, ৪৭-৬৭৬৪

N. G. Chakrabarti Alloy Steels (P.) Ltd.

INCORPORATING
N. G. CHAKRABARTI & CO.

Manufacturers of

Alloy Steel Castings

Such As

Nickel Chrome Steels

Heat Resisting Steels

Stainless Steels

Austenitic Manganese Steels

Made in

Induction Furnace.

2. Alloy Iron Castings

Such As

Heat Resisting Alloy Iron Castings

High Duty Iron Castings

NIHARO Castings

Graded Iron Castings

of

All Special Grades & Sizes

Direct Arc Electric Melting Furnaces

for Melting all Grade Steels.

Alloy Steels & Alloy Iron etc.

MINI MODEL

SR-1 - 150 Kgs. Batch

SR-2 - 250 Kgs.

SR-3 - 500 Kgs.

MAXI MODEL

SR-4 1000 Kgs. Batch

SR 5-3000 Kgs.

SR-6-5000 Kgs.

●
Quality Guaranteed

Works

K-65, Howrah Industrial Estate,

P.O. Balitukuri

Howrah, (West Bengal)

Telephone : 69 2890

Head Office

3D, Nandy Street

Calcutta-700029

Phone : 42 5197

Cable : ENGEEC

Calcutta.



ভাষা



শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেব প্রতিষ্ঠিত

অষ্টাঙ্গশ্লোক বর্ষ	ভেদনং একানব্বই	চৈষ্ঠ	দ্বিতীয় সংখ্যা
--------------------	----------------	-------	-----------------

গীত

শ্রীশ্রীঠাকুর

প্রভু তুমি আমার গানের মালা
 তুমি আমার গানের বাণী ।
 আমার এ বাখার ডালা
 তোমার পায়েই দিলাম আনি ।
 ফিরেছি হাটে হাটে
 আমার এ গান যদি কাটে
 ওগো এই কথার নাটে
 শুনিতে কানাকানি ।
 ফিরেছি ঘরে ঘরে
 ফিরায়ে আপনারে
 আজি তাই একেবারে
 বিকতে এলাম আজি ।
 যদি হয় কথার কথ্য
 জ্বলে তার যাবে কি-তা
 যদি বহু বাখার সৌতা
 বুকে কি লবে টানি ।

“কথামৃতের কথা। সে যে সবার মুখের বাণী”

স্বামী সত্যানন্দদেব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এ যুগের পঞ্চম বেদ। এত সহজ সরল ভাষার সহজ উপমা দিয়ে বেদ বেদান্ত বোঝা-এ সবার কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর বাক্যেরছেন যে ভাঙল অধিক হ’তে হয়। নিরকর জ্ঞান—সিধুর এক একটি কথাই লুকিয়ে আছে যেতো জ্ঞানের গভীর তত্ত্ব, ততো সাহিত্য মাধুর্য, ততো সারস্বত—সার বাণীর দ্বারা দ্বারা পত্রীর শার্মাঙ্গাধতা, যেতো পণ্ডিত ততো অধিক হই। গীতা, কে বেদান্ত এইজনা এখন মানুষের মনে যেতো ছাপ না দেয়, ততো বেশী গভীরভাবে ছাপ দেয় কথামৃত।

কথামৃত হচ্ছে এ যুগের মানবতার বাইবেল। মানবতার এই বাইবেলে রয়েছে ধর্মের কত না গুঢ় তত্ত্ব; যেমন সাংখ্য দর্শনের পুরুষের নিশ্চেষ্টতা আর প্রকৃতির প্রসবধর্মী স্বভাবের সঙ্গে বিবাহ উৎসবে নিশ্চেষ্ট গৃহকর্তার আর চক্কল গৃহকর্তার তুলনা। মার্গা মেসারি অনুভূতগের কথা, মহামহিম আল্লাহর কথা; ভগবান বুদ্ধের কথা, কি যে নাই।

আরো রয়েছে সন্যাসমারিক ভক্ত মহাপুরুষদের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের আলাপ-সংলাপ। এঁদের মধ্যে রয়েছে নরায়ণ সাগর বিদ্যাসাগর, সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্র, কবি মাইকেল, ভ্রম্মানন্দ কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আরো কত না জটিলনাথ হো এরা পত্র। ধর্মিক ভ্রাতার রামের ইচ্ছার জীবনানন্দ, ভোস না কহা সাপের চরিত্র, এমন কত তত্ত্বমনিই যে ছড়ান রয়েছে কথামৃতের পাতার পাতার। কথামৃত যেন জগতের এক বিরাট চিত্রশালা। অদ্ভুত সব চিত্রের সমাবেশ হয়েছে এই কথামৃত মুখে।

আর আছে বিট কথার নিজের লীলাঙ্গন নানা ভক্ত সঙ্গে, নানা পরিবেশে, রসিন তার পর্ণপুট আর তারই সঙ্গে সঙ্গে ছানিত হয়ে রয়েছে কত মধুর কণ্ঠের সাধন সঙ্গীত—সমস্ত মিলিয়ে কথামৃত যেন এক সব-পেরোয়ার মল্ল... মর্তের বৃক্কে অমরার অবধান—নিভা বৃন্দাবনে নিভা ভগবানের সঙ্গ।

গীতা, কথামৃত এগুলো ভগবানের direct বাণী, বিশেষ কথামৃত। কালে ওই এক একটি বাণী নিয়ে হুড়ি হুড়ি পর্ণন লেখা বাবে বা সন্দেহ হবে। ভাবিতে কত উপকারে লাগবে ওই বাণী। তাছাড়া কথামৃত শুনতে শুনতে বা পড়তে পড়তে যদি সেগুলো ধ্যান করা যায়—‘সিদ্ধিবানন্দ বাগের সত্যের কার্টাছ’ ইত্যাদি মনে হয় ভালই লাগবে। তারপরে মারের বাণী—“ভর কি? তোমাদের জন্য আমি জাহি।” এটি ওই মৃত্যু মুখে মনে পড়বে আর মনের অনেক জ্বালা ধপ্পা নষ্ট হয়ে বাবে, মনে শান্তি পাবে। সাহস আসবে, ভরসা আসবে, মৃত্যু ভয় কাটিয়ে যাত্রার পথ শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে। যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে, যাত্রা করতে হবে, তখন পরপারের পথে আর কেউ থাকবে না। তখন ওই ঠাকুরের নাম, ধ্যান, পূজা পাঠের ফলই বাবে সঙ্গে। এগুলো ভগবানের সঙ্গে যত হবার জন্য Direct কর্ম। আর এ ছাড়াও আরও অনেক কর্ম মানুষকে করতেই হই যেগুলো না করলেও চলে না। কিন্তু সেগুলিও ঠাকুরের নাম স্মরণ করে করতে পারলে ভাল হয়। সেগুলো Indirect কর্ম। কথামৃতের বাণী, গীতার বাণী, শ্রীমার বাণী এগুলো সব পড়তে হবে আর মনে মনে আঙড়েতে হবে। সেই অনুসারে কিছুটাও চলার চেষ্টা করতে হবে, সেই লীলাঙ্গন ধ্যান করলে ক্রমশঃ জগৎ থেকে মনকে Switch off করা কত সহজ হবে, কিন্তু ওই গতানুগতিক পল্ল্যাম আর কুলে ফেলাস, তা করলে চলবে না। বাণীগুলো মনে গেঁথে নিতে হবে।

কথামৃত বক্তে না পারলেও, ভাল লাগুক বা নাই লাগুক রোজ পাঠ করতে হবে। আমি নিজে নিয়ম করে নিয়েছি—সেজনা পাঠ করে বাই তিনবার। তাছাড়াও আমার পরবানা বাগার সঙ্গ, মানের সঙ্গ ও বাগার সঙ্গ বাইরে থেকে আমাকে পাঠ শুনায়। ভাগবৎ গ্রন্থ নিয়ে পড়ি থাকতে পারলে তাতে ভাব-সত্তা প্রকাশিত হয়।

সহসা একটি বৃক্ষ ফাটা ডাক ঘুংখরিল দুই কুলে
কে কোথায় তোরা আর ওরে আর আর
এমন কাণ্ডের কে ভাবিবে ওগো কাহাদের নাম ঘর
ও যে গম্বীর এ বৃক্ষের গোড়া রায় ।

আকুল কণ্ঠ ভাবিবে সে তার অন্তরঙ্গ জনে
আমি যে এসেছি আর তোরা আর ওরে
না পৌঁখ তোদের রহিব কেমনে শত আনজন সাথে
কেমনে বা রব শূন্য একলা ঘরে ।

বলে, তোরা ছাড়া কে বৃক্ষের বাধা তার সনে কব কথা
মরমাই বোঝে মরনের আকুলতা
বিঘ্নরীর সনে কথা করে করে ঘুং গেল ঘোর পড়ে
ভুলে গেল বৃক্ষ সহৈ না এ নীরবতা ।

কে কোথা আছিল আর ওরে আর সহৈ না যে আর দেরী
এত ভাবি তবু ভাঙে না তোদের ঘুম
ওপার হইতে ভেসে আসে যেন বাই বাই ওগো বাই
ঘন ঘন তল নিম্ন নিম্নকুম্ভ ।

আঁশর রাতের বৃক্ষটির যেন আলোর পাগল কাদে
কুঠীর ছাতের কাণো পরিবার থাকে
ছিল সবুজ কণি শৈবালে সে অগ্র কথা লিপি
গুঞ্জে যেন অবেগা অন্ধকারে ।

পবন স্নানিত পত্মের পত্মসম্মিলনে
বৃগদেবতার বৃক্ষভাঙা সেই ডাক
নিখিলের শত রূপন ঠেঁলি থাকে থাকে কর হারি
কারে যেন স্থল জাগ জাগ ওরে জাগ ।

ঘরে ঘরে আছে কোন চেনা জন লুকাইরে আনমনে
অপরিচয়ের ঘন ঘূমে অচেতন
বৃগদেবতার কান্নার বাঁশি তারে খুঁজে খুঁজে ফেরে
টেনে নিতে ওগো চিহ্নিত সেই জন ।

সপ্তলোকের রম্ভে, রম্ভে, গুম্মারিছে সেই সূর
আর আর ওরে আর তোরা ছুটে আর

গগনে কুন্ডল কারা যেন বলে বাই বাই ওগো বাই
ভিড় করে কারা মরমের মোহনার ।

সোণিন লিখনাপূরের ঘুরারে ঘাঁড়ালো পাঁখক দুটি
গ্রীষ্মামন্ত গ্রীষ্মানোমোহন নাম
শান্তির লাগি এদেখে তাহারা গ্রীষ্মভূমিরে কাছে
সব ঘুং হতে পেতে চায় আরা চাপ ।

ঘুংজনেরই চোপে ঘুংজনের আত্মক যেন মাথা
একই প্রাণনা ঘুংজনেরই বৃক্ষে জাগে
প্রচুর পেউলে বৃক্ষ ঘুংজর উন্মোচি তাই পৌছে
জানালো প্রশ্নম জাগ্রত বেবতাকে ।

গ্রীষ্মানোমোহন দেখেছে স্বপ্ননে—অন্তল জলাধি বৃক্ষে
ভেসে গেছে তার গৃহ প্রিয় পরিজন
স্বপ্ননে সে ভাবে ; কি হবে বাঁচিরা হারায়েছে সাব যদি
কে যেন কহিল, কেন ভাবে অকারণ ।

কেহ নাহি থাকে আছে একজন জাগিরা তোমার লাগি
এলো সে ধরায় শূন্য তোমাদেরই তরে
ঐ শোন তার প্রেমের ময়লী কুন্ডল ভবনে বাজে
দাও সাড়া তারে চল ছুটে করা ক'রে ।

গ্রীষ্মামন্ত সেও দেখিরাছে নিশীথ স্বপ্নে হায়
তার দুহিতার হেরেছে মৃত্যু যেন
কল্পিত ভরে স্তিরমান রাম হল তাই দিশ্বেহারা
সতাই যদি বিপদ ঘটে এ যেন ।

কি হবে উপায় অকূল চিন্তা পাথারে স্নেহে না কুল
বিফল পরাণে কান্দেছে পিতৃমেহ
অশান্ত প্রাণ বাধা নাহি যানে সব লাগে বিষম
মোহে না নরনে কাল স্বপ্নের মোহ ।

গ্রীষ্মভূমি পানে দুটি আঁধি মৌলি চাঁহতে দৌহার মনে
পরাণে পরাণে কি যে হল আদারাজানি
দহন নশ্ব প্রসরে কে যেন বলালো অসীম মেহে
শিশির সিত ঘুং সান্দ্রনা পাণি ।

জ্যোত : ভেরশ' একানব্বহ ।

অমর মেঘের একটি গভীর চাহনীর বিনমরে
বিলম্বের আগে সবই হয়ে গেল বলা
মধু আলাপনে মনে হয় যেন পোশাকী পরিচর
নৃতন করিয়া বৃক্ষেরা নেবার পালা ।

গ্রীষ্মমন্ডলে শ্বাশলেন প্রভু, 'তুমি তো চিকিৎসক ?
খেতোতো দ্রুত জ্বর আছে নাকি আর
বিশ্মিত রাম ভাবে প্রভু কাছে এই তো প্রথম আশা
কমেনে জানেন আমি এক ডাক্তার ।

এ দাঁখনাপুরেতে যেন কেহ নাই তাহারে চিনবে যেবা
অন্তর্যামী ইনি কি চিন্তাবিৎ ?
ভাবিতে ভাবিতে ভ্রম রাসের কি যেন হইল মনে
বেছে ওঠে বৃত্তে আনন্দ সসীত ।

অন্তর যেন করিল প্রভুর ওগো অন্তর্যামী
চিনেছে। সবকে ফিরায়োনা যেন আর
গ্রীষ্মনোমোহন সেও বিষ্ণুর চক্রে রর প্রভু পানে
নীলর হরেক্ষে সব কষা যেন তার ।

ফলরের নাড়ী দেখা হ'ল শেষে জ্বর বৃদ্ধি তার নাই
এবার গ্রীষ্মে গ্রীষ্মমে বহেন চুপে
খেতোতো আমার অঙ্গপর্শন ভিন্ন ধরণ যেন
সবার হইতে গড়া কি আলাদারূপে ।

হতবাক বিষ্ণুরেতে গ্রীষ্মমন্ডলে না নিসরে বাণী
প্রভুর পরশি হোরিলেন তার অস
বৃক্ষলেন এষে অধরা নাথের পরশ দেওয়ার জলে
দীন ভক্তেরে বনা করার রঙ্গ ।

মুখে কাঁহিলেন সত্যই প্রভু তোমার এ বেতন
গঠন ইহার নাহে সাধারণ সম
এ রূপ বরণে এ তনু পরশে ঘনা হল্যাম আমি
গ্রীষ্মরূপে নীতি লহ অন্তরতন ।

নানা আলাপনে কেটে যায় দিন, অসীম যতনে প্রভু
দেঁহায়ে দিলেন মায়ের প্রসন্ন ধাঁস
জঠরের সাথে ভাঁয়ে গেল মন জড়ালো হৃদয়িত চিত্র
গ্রীষ্মকুর মেহে দুটি অর্থাৎ আসে ভাঁস ।

দূর মেঘপারে উধাও বখন সফার রাষ্ট্রা শ্রেণা
বিস্ফোরকের দুসর কিনারে ঘূঁরে
ভেসে চলে গেল বলাকার দল ক্রান্ত নীড়ের পানে
অলস পাখাটি প্রাণ্ডিতে পড় নূরে ।

সেদিনের মত লইল বিবার চিহ্নিত জন দুটি
প্রভুর চরণে প্রশ্নের পালা সারি
আশা আশ্বাসে দুচোখের কোণে নির্ভর লৈল
দৃশ্যবস্তুর নিশি পারে দেয় পাড়ি ।

(ক্রমশঃ)

—১০১—

গান

ত্রিসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দূরে ধাঁসি রাখিবি আমায়
তুই কেন বাসালি ভালো
জীবন হিয়া মাকে মাগো
জন্মালি কেন প্রেমের আলো ॥...

মুহুরূপা ভালবাসা
মনে আসে কত আশা
ভালবাসায় জ্বির্জ্বিষ্ট
ভোলানাথ শিব পাগল হলো ॥...

তোরে প্রেমে মা পাগল হয়ে
শিব দিলেছে বন্ধ পাতি
দাঁখনাপুরে গ্রীষ্মমন্ডল
মা-মা বলে উঠলো মাতি ।

সিদ্ধ বোণী কাঁধ কত
বন্দনা গায় শত শত
তোরে চরণে সেবার মত
মোর কিছু নাই দলোয়লো ॥...

শ্রীশ্রীভবতারিণী গীতিআলেখ্য

স্বামী বোধানন্দ

(১)

ও মা ধর্মপুত্ররি। ভববন্দনগ্রন্থঃ—ভবতারিণী। এই ভবসংসারে সবার মা যে গো তুই। শূন্য কামার
মা তো ন'স, নিখিল বিশ্বর আধারভূতা তুই যে জননী ! ও মা নরায়ণি ! হুগে হুগে গ্রাসে সীতা সারঙ্গারূপে তুই
যে লীলার কমল। মেঘলা কবিগণ তোকে—উমা দেবী সত্য চন্দ্রী সুন্দরী সুভগা—জরনী মঙ্গলাকালী ভয়কালী
কপালিনী—দুর্গাশিবা কামাখ্যেী শ্বাহা শ্বধা—আরো কত নামে কতরূপে বন্দনা করেছেন। বশমহাবিদ্যা—কালী তারা
যোড়শী ভুবনেশ্বরী তৈরবী ছিন্নমস্তা হুমাধতী বগলা মাতঙ্গী কমলারূপে তুই যে মা ভগবতী তোর সন্তানদের এই পরম
আশ্বাস দিরোঁহস—

ইহং বদা বদা বাবা দানবোথা ভবিষ্যতি।

স্ত্রীভবতারিণীং করিষ্যাম্যসি সাক্ষরং ॥

: গীত :

সকলদেবের ভেজোরাশি
নিরে কবে জাগু'বি মা
চক্রে লক্ষ বচী
বল্লবণে সাজবি মা।
কালক বলা পাল
অকম্বালা চর্ম আর
মুস্তা হার চন্দ্রলেশে
পদ্মবালায় হাসবি মা।

হৃদয়'হু অঁহালে
সকল লোকে প্রপু'রি
দেবতাদের জরনামে
সিহে'পরে বসু'বি মা।
মুনিগণ ভক্তিতে
জুবেই হবে নরশির
অসুর গণে দৈতরী গো
জাবার কবে আসু'বি মা।

(শ্রীশ্রীভবতারিণী অনুরণে) —স্বামী সত্যানন্দদেব

(২)

পুণ্যলোকা রাণীরাশর্মণ। জগজ্জননী'র অষ্ট নারিকার প্রধান নারিকা রাণী রাশর্মণ। তাঁর বহুকালের
অভিলাষ কাশীঘরে শ্রীশ্রীবিষ্ণুনাথ আর অন্নপূর্ণা মাকে দর্শন আর বিশেষ পূজা। কিন্তু জগদ্ব্যবস্থা ইচ্ছা যে অন্যরূপ।
সেদিন কে জানতো মা'র জন্য নব-বারাণসী প্রতিষ্ঠা হবে এই বাংলার বুকে ? কে জানতো ইচ্ছাকরী ভবতারিণীর
প্রভাবশেষ রাণীর স্মৃতি থেকে মুছে বাবে তাঁর বহু আশাপোষিত তীর্থলব ? মা'র চিহ্নিত নারিকার জীবনের স্বপ্ন
সাব হলে দাঁড়ায়ে গম্বীর পূর্ব উপকূল আলো ক'রে ধর্মপুত্রবস্ত্রের বিরাট ডেউল ?

সে এক দিবা নির্মাখিনী—রাণী রাশর্মণ শয়ন নিবন। সহসা তিন দেখেন—এ কি। মা ভবানী,
ভবভরহাণী ভবতারিণী দিব্যরূপের অমলশিখার তাঁর শিরে ! হস্তে ক্রান্ত, দীপ্ত নয়ন কঙ্কার নিকরিতনী। তাঁর
শ্যাম লালিত কণ্ঠে জাগে হুগের জাগরণী—“ভাগ্যিণী তীরে আমার প্রতিষ্ঠা কর।”

সেই পরমন্ত্রে বিশ্বজননীর আলোর ভরণীকরে, নব অরুণের বার্তা নিজে, জাতি জীবনে এল জাগরণী ধ্রুপ—
মাতৃসম। হুগে প্রয়োজন এই ধ্রুপদ হৃৎ হরে উঠেছে হৃদ্যকতার গ্রীষ্মকুসুম। জগত্তে বেখানে বস সন্তান
আছে জাতি-বর্গ-বর্ষ-নির্বিশেষে তারা সবাই সেই অসীম অপার মাতৃদেহে পায়োবরে জীবনতরী ভাসিয়ে দিলে নিশ্চয়

নিভর হবে। তার এ বৃগের সম্মান আমরা। গ্রীষ্মের পর্বে সকল বাধা তুলে ক'রে, পথের কটক দলিত নদিত
ক'রে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। কোটি কোটি সম্মানের ব্যাকুল হৃদে আজ শূন্য এই প্রাণনা—জননি! জাগ্রহি!
জাগো কল্যাণধারি। জগৎজননি! আমরা কি জনক ছাড়া? আমরা কি মাতৃহারা? তোমার সম্মানের অঙ্কুর
আজ জাগো না তুমি। ডাকো গো জননি এবার! ওরে, কে কোথায় আছিস না হস্তা ছেলে মেয়েরা!

: গীত :

মায়' ডাকে আর মিই সাড়া
কে আছিস রে মা হস্তা।
চল্ ছুটে চল চলি
পথ জাগ্য দুই পারে দলি
মা বুলি বল্ প্রাণ ছাড়া।

ফিরাব আজ আপন মাকে
না রেড়ে বন ক'নির থাকে
মায়ের আশিস' ঠিকরে পরে
অরুণ আলোর দিক্ হারা।

—স্বামী সত্যানন্দদেব
(তবশ)

—১০—

শ্রবণ-মঙ্গলম্

ঐশ্বর্যপূর্বী

৫ই এপ্রিল, ১৯৬২ :

আজ রবিবার গঙ্গাতীর আলো করে গ্রীষ্টাকুর বসেছেন—
গ্রীষ্টাকুরের সান্নিধ্যে সেজকা, ফটিকসা, মানিকঝাটা,
প্রিন্সডেউট মহারাজ, শঙ্কর, ধ্যান, অমল, চিত্তাহরণ, বাদু,
সুরেশ, স্যার ইত্যাদি সাংসদ ও গৃহীতদের মধ্যে পদ্মপতি
মুখোপাধ্যায়, হরিপদ বাবু, সেনকা, আনন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
জিজন সেনগুপ্ত, মনিবাবু, সুকোমলবাবু, অম্বিকবাবু, শচীন
সাগরাল, মিলের ডাক্তারবাবু, মনোরঞ্জন মাস্টার মস্যার
কমলকৃষ্ণ গোস্বামী এছাড়া যেরকজন ভক্ত আছেন। পাঠচক্র
ও শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা শেষে বললেন।

গ্রীষ্টাকুর—এ এক বিদ্যার অহংকার প্রকাশ করতে ইচ্ছা
করে ততক্ষণ জানবে মন বহির্ভূতী কিন্তু বন্ধ মনটা
অন্ধবুদ্ধী হবে তখন আর বাজে কথা করতে বা বিদ্যার
অহংকার দেখাতে মন চাইবে না। ঘিরে লুচি ছাড়া হলে
বভলকম কাটা থাকে ততক্ষণ আওয়াছ হর আর লুচি ভাজা
হলে সেলে আওয়াছ থাকে না। ওই আওয়াছ হওয়া আর
না হওয়া যেন কাঁচা আমি আর পাকা আমি উদাহরণ।

দৈনক—ঠাকুর তারেলে আচার্য্য শঙ্কর স্বামিজী এ'রা
যে সব জ্ঞানের প্রকাশ দেখিয়েছেন এটাও কি অহংকারের
প্রকাশ ?

গ্রীষ্টাকুর—ও'সের কথা আলাদা—ওয়া অবতার রূপগুরুষ
বা শিবাবতার তাও আদিত হইয়াছিলেন লোকালীক্ষা নিতে।
আচার্য্য শঙ্করও দেহ ছেড়ে দিতে চেষ্টাছিলেন কিন্তু ব্যাসদেব
পরমাদু বাড়িয়ে দিলেন ও বৈদ্য প্রচার করতে বললেন।
স্বামিজীও দিনরাত শূন্যদেহে মত সমাধিতে জুবে থাকতে
চেষ্টাছিলেন কিন্তু ঠাকুরের আদেশে তাঁকে প্রচার করতে
হল, লোকালীক্ষার্থে বস্তুতাদিও দিতে হল। এটা অহংকার
বশীভূত কাজ নয়, অবিকার আমিও নয়। তবে সাধারণ
ক্ষেত্রে অহংবশতঃ নিজের বিদ্যা লাহির করা ঠিক নয়।

পদ্মপতি মুখোপাধ্যায়—ঠাকুর তাহলে ধর্ম'কথা কেউ
জানতে চাইলে অহংকার প্রকাশ হবে বলে কি হুপ ক'রে
বাঁধা উঠি :

গ্রীষ্টাকুর—তা কেন? ভক্তরা পরস্পর ভগবৎ কথা

আলোচনা করবে এতো খুব ভাল কথা ! ভক্তরা এই দিবা আলোচনা সং প্রদত্ত এ ক'রেই থাকে । পীঠামুখও কৃক জগদান বলেছেন—‘গোবিন্দ পরমপদম্’ । শ্রীমদমহাপ্রভু বলেছেন, পরম্পর ভগবৎ তত্ত্ব আলোচনার বধা ‘ইন্দ্রগোষ্ঠী করা’ । এ ছাড়া অন্য জিজ্ঞাসা নিয়ে কেউ এলে তাকে সাধ্যমত শ্রদ্ধা করা বলা চলে । আর গুরু বা আচার্য্য তো শিষ্যকে শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা দেবেনই । কিন্তু অহমিকা নিয়ে বিদ্যা প্রকাশ এটা ঠিক নয় ।

মহাপ্রভুর শিষ্য ‘তুণ্যার্ণব সুনীচেন তরোরিষ সহিকৃনা’ : এই আদর্শ শ্রীরাধ গোম্বামীর মধ্যে রূপারিত হয়েছিল । রূপ গোম্বামী ছিলেন দিকপাল পণ্ডিত ও অতুলনীর কৃষ্ণসংকল্পিত কিন্তু বৈষ্ণবের দীনতা ও বিনয় ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ দিক, প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর কাছে শ্রদ্ধার মত । কত দিশীজ্ঞানী পণ্ডিত তাঁর কাছে আসতেন তর্কযুদ্ধের জন্য, তিনি বিনা ছিঁয়ার তখনই সানসেদ তাঁদের জয়পর লিখে দিতেন । একবার আচার্য্য ব্রজ ভট্ট রূপ গোম্বামীর কাছে আসেন তাকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করার ইচ্ছা নিয়ে তখন রূপ গোম্বামী তাঁর কুটীরে ভক্তিরসামৃত পানি রচনার মন-ভট্টজীকে সাদরে বসালেন । কিছুক্ষণ কথা ইত্তার পর ভট্টজী তাঁর সবা রচিত দুইটি চোক শুনতে চাইলেন । রূপ গোম্বামী দুটো শ্লোক পাঠ ক’রে শোনালেন । ভট্টজী বললেন,—‘এতে তো যথেষ্ট তুল রয়েছে ।’ রূপ গোম্বামী সানসেদ বললেন, ‘আপনি সপোষনে করলে খুব উপকার হবে । আমার তো ঠাকুর সেবার কাল আছে । আমি চান করে আমি, আর্পনি ঠিক করে দিন’ বলে পুণিটি পণ্ডিতকে গিয়ে চান করতে গেলেন । রূপ গোম্বামীর শিষ্য ও ভাইপো জীব গোম্বামী তখন সেইখানেই উপস্থিত ছিলেন । পণ্ডিত যেই তুল সপোষনে করতে যাবেন জীব গোম্বামী তখন বেশ কিছু রেগে উঠে বললেন, ‘আনাদের রূপ গোম্বামী সৈন্যের প্রতি মতি’ তাই অতি চমৎকার, নির্ভুল শ্লোক আপনাকে সপোষনে করতে দিলেন—আপনার অহংবোধকে উনি এভাবে কিছুটা প্রসন্ন দিলেন । এইভাবে দু’জনের মধ্যে বেশ অর্কব সৃষ্টি হল । পণ্ডিত ভট্টজী জীব গোম্বামীর কাছে পরাজিত হলেন ও কিছুমুখে ফিরে যাচ্ছেন

পথে রূপ গোম্বামীর সঙ্গে দেখা হলে তিনি পণ্ডিতের বিমরতার সমস্ত কারণ জানতে পেরে কুটীরে ফিরে জীব গোম্বামীকে বললেন, ‘তুমি তো জানো বিনা তর্ক’ কত পণ্ডিতকে আমি জয়পর লিখে দিয়েছি ।

আজ তুমি স্রোত বশত ও স্কন্ধ অহং বশত পণ্ডিতকে পরাজিত করেছ, বৈষ্ণবের তো এসব ধাক্কা উচিত নয় । এগুলো জয় করতে না পারলে আমার কাছে আসবেনা’ এই বলে প্রাণার্থক ভাইপো ও নিজ হাতে গড়া দিকপাল শিষ্যকে মহাবর্তে তাড়িয়ে দিলেন । জীব গোম্বামীও তুল বৃকতে পেরে কসতে কসিতে চলে গেলেন ও বনের মধ্যে কুটীর বেঁধে কঠোর তপস্যা, উপবাস, নাম সাধনা এসব ছুঁ দিলেন । বরষেক মাস পরে সে পথ দিয়ে সনাতন গোম্বামী যাইছিলেন লোকমুখে কৃষ্ণ তপস্বী বৈষ্ণবের কথা শুনতে শুনলেন—কাছে গিয়ে দেখলেন বৈষ্ণব তপস্বী আর কেউ নয়, তাঁরই প্রাণপ্রিয় ভাইপো জীব কিন্তু শরীর খুবই কঠিন, সেহে প্রাণ মাত্র আছে—নমস্ত কথা জীব গোম্বামীর মধ্যে শুনলেন ও সাধুনা দিলেন । ফিরে গিয়ে রূপ গোম্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর রচনা কতটা এগোয় ?’ রূপ গোম্বামী উত্তরে বললেন, ‘এগোচ্ছে তবে জীব কাছে থাকলে এতদিন তার সাহায্যে পেরে শেষ করে ফেলতাম ।’ এই বলে সোঁদনের ঘটনা বললেন । সনাতন গোম্বামী বললেন, ‘রূপ, আমি সব শুনছি—আমার আনন্দপ্রায় অনাহারে কৃষ্ণ তপস্যার তার দিকে আর তাকানো যায় না—খুব রোগা, খুব দুর্বল । সেহে শ্রদ্ধা প্রাণটুকু মাত্র আছে । সনাতনের দৈনন্দিন রূপ বৃকতে পারলেন । শিষ্যকে কমা কলেন ও কাছে ডেকে নিলেন । এই হচ্ছে বৈষ্ণব বিনয় নিয়মসম্মততার কথা ।

আমার কাছে এক সপ্ততীর্থ পণ্ডিত যিনি কেড়ে সন্তুত পড়াতেন তিনি এসেছিলেন—খুব তর্ক জুড়ে দিলেন—কিছুতেই বৃকতে চান না—মারের কৃপার আমি হূপ করে হুইলাম—প্রচাকরের সঙ্গে তিনি অকথা খুব তর্ক’ আলোচনা এসবের পর চলে গেলেন । তিনি নিজের বিদ্যা জাহির করতে এসেছিলেন আর কি ।

আসলে কি জানো সাধনার গভীরে ছুঁ না দিলে শ্রদ্ধা

ভক্ত কথা, জ্ঞানের কথা, শাস্ত্র বা কথা শুনলে বিশেষ ফল হয় না—সহ্যাতরতে বসে 'শ্রুতেন কিং যো ন চ ধর্মমার্গেরং' যদি ধর্ম আচরণ না কর তাহলে বৈদ্য শাস্ত্র পড়লে কি হবে ?

আচার্য্য শব্দর বলেছেন—

বাগ্য বৈতরী শব্দবরী শাস্ত্রব্যাখ্যা কোশলম্ ।

বৈদ্যবৈ বিদ্যাবৈ তবন্তুভয়ে ন চ যুক্তয়ে ॥

নানান শব্দর কংকট, বাক্য, বিন্যাস শাস্ত্র ব্যাখ্যার কোশল পাণ্ডিত্যের এবং পাণ্ডিত্য কেবল ভোগের জন্য যুক্তির জন্য নয় ।

আচার্য্য শব্দর আরেক ভাষ্যর বলেছেন—

'ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাখ্যারোহঃ শব্দরঃ ।

কিনাংপ্রাকানুভবং ব্রহ্ম শব্দেন' মৃত্যুতে ॥

শব্দবৈ ওষধি কথাটিতেই রোগ ভালো হয়না—

অপ্রাকানুভূতি ছাড়া শব্দ ব্রহ্ম বললেই যুক্তি হয় না ।

এ যুক্তির ঠাকুর কেমন সহজ উপমা দিয়ে ব্যক্ত করেছেন, 'কেবল শুনলে কি হবে ? কিছু করা ।' সিদ্ধি সিদ্ধি শব্দ মধ্যে বললেই নেশা হয় না—সিদ্ধি আনতে হয় বাটতে হয় সরব করে খেতে হয় তবে তো নেশা হয়—তাই বলি কিছু সাধন কর ।'

—১০৪—

মাতৃ-বন্দনা

ঐগোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী

সারস্বতীর হৃদয়ে আলোর
আলো করে আছে ছুঁকন ।
শারদী চাঁদ স্নিগ্ধ আলোর
প্রেমের পরশ দেয় যেমন ॥
আলরে তোরা আলরে সবাই
মাঝের চরণগুলো লুটাই
মা যে মোদের পরামর্শী
ঐর কল্পনা অসীম যখন ॥

সাধন অকৃত্রিম অকরের গভীরে ছবি দিয়ে ইচ্ছা চিত্রা নাম
তপস্যা এসব করতে হয় । শাস্ত্রকথা ঈশ্বর প্রসঙ্গ এসব খুবই
ভালো—এতে সময় বিব্যভায়ে কেটে যায় কিন্তু এতে
অহংকার হ'ল থাকলে চলবে না । সেজন্য সাধনার সিদ্ধি
লাভ হলে তখন উপদেশ বস্তুতা তত্ত্বালোচনা কর—লোক
কল্যাণ কর—তাতে মঙ্গল হবে । দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরও
বলেছেন,—'তাকে ফল মর্শ্বের আগে প্রতিষ্ঠা কর । বস্তুতা
লেখচার তারপর ইচ্ছা হয়তো কোনো ।

সেই কথা সাহিত্যিকের মত শব্দ সাংলীল মধুর ভাষার
পদ্যলোচনের গণ্য এই প্রসঙ্গে বলেছেন—শেষে বলেছেন,
'লৌক্যশিক্ষা পেওয়া কঠিন । ভগবানকে দর্শনের পর যদি
কেউ তাঁর আদেশ পায় তাহলে লৌক্য শিক্ষা দিতে পারে ।'

তোমরাও এখানে যা শোন সেই অনুসারে চলার চেষ্টা
রাখলে, সাধন ভাল করলে তবে তাঁর রূপা পাবে ।

আমি যম নিম্নম আসন প্রায়গায়ম্ প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা
সমাধি এই অতীত রাজবোনের সাধনা করছি । গীতার মন্ত
'সবা' সজ্জতে চারং কৃষ্ণ'সানিধি স্বর্গ' ॥ এই বাণীটি নিয়ে
দিনের পর দিন সাধনা করছি । শব্দ পড়লে বা শুনলে
হয় না সাধনা চাই ।

—১০৫—

সিউডীতে গোপালজী

নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

‘কালী পূজা হল শেষ। এখন শীতের প্রবেশ।’ বরানগর আশ্রমে এই সময় একটা সাদা জাগার বীরভূমে বাওয়ার তাক। ঠাকুর সত্যানন্দদেবের মঠালীলার বীরভূমের রয়েছে এক ঘুংখা স্থান। তত্ত সাংখ্যার ভূমি হল বীরভূম। মঙ্গলভার্গবের বীরভূম নয় বীর সাংখ্যের সাংখ্যার ক্ষেত্র এই বীরভূম। শতযুদ্ধ জয়ের চেয়েও বড় হল আত্মজয়। তপস্যা তো বীর ছাড়া কেউ করতে পারে না। পুরাণে পাই বলবান অসুরদের অতীতলাভেক্ষার মাথাকাটা তপস্যা করার অসংখ্য কাহিনী। তাই বলজীর শিকার অস্ত্রে বন্ধন ‘করেছে ইলা মগেছে’ রত নিয়ে সাংখ্য সত্যের তুব দিলেন তাঁর সাংখ্যার, তখন বীরভূমকেই বেছে নিয়েছিলেন তিনি। গ্রীষ্মাক্ষক প্রার্থনা করেছিলেন ভবতারিণীর কাছে, সন্ন্যাসীর রাম্য হতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই সত্যানন্দদেব, যিনি শূদ্ৰ যনে নয় দেহেও ছিলেন রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারী, তিনি সহজ উত্তরাধিকার সূত্রেই হয়েছিলেন একজন প্রেম্য সন্ন্যাসী, ভুলনাহীন সন্ন্যাসী এই যুগে। তা ছাড়া দীক্ষণেশ্বরে যিনি নৈর্মোহিলেন অকম্পনীয় কঠোর তপস্যার, নিঃশূলক নেত্রেই যিনি কাটেরোছিলেন একটানা ব্যোমটি বছর, বীর তপস্যার ব্যোমটি বহন করে যোগীপুত্র কালীপ্রসাদ হয়েছিলেন কালীতপস্বী নামে খ্যাত, তাঁকেই জীবনের প্রধান অকলঙ্ক করে কালীতপস্বীর সুযোগ্য সন্তান সত্যানন্দ স্বভাবতই হয়ে পড়লেন তপস্বীর রাজা। শূদ্ৰ থেকে শেষ পরীক্ষা সমগ্র জীবনটাই ছিল তাঁর তপস্যার আলোকে সম্বন্ধহীন।

শোনা যায়, সিউড়ীর আদি নাম ছিল শিবপুরী। শিবপুরী হল শিউপুরী, তার থেকে শিউরী, বার বর্তমান হুগ হল সিউড়ী। শিবপুরীতেই সত্যানন্দদেব পেতেছিলেন ধ্যানের আসন। এখানে কেটে গেছে তাঁর কতদিন অনাহারে অর্থাচ্ছিন্ন ধ্যান, কেটেছে কত বিনিমুরজনী কলঙ্কজননীর জন্য আকুল ক্রন্দন। শিউপুরীতে তাঁর বিশ্রমের সেই তপস্যার কথা শিহরি শিহরি পরমশূলকে প্রকা করে, স্বয়ং করে সিউড়ীর ভক্তজন। তাঁর শূল দেহটি হয়েছে অপ্রকট কিন্তু তিনি হয়েছেন আরো নিকট। অগ্নি বধা ভুবনং প্রবিন্দং তেনই ভক্তের স্মৃতিতে ওজস্রাত মিশে গেছেন তিনি। চিত্ত তরুই ধামে নির্বিন্দং। তত্ত্বজ্ঞের পাতা আসনে তিনি বিরাজ করছেন, দ্বন্দ্ব কমল মধ্যে রাজিতে সত্যানন্দ।

যখন বাইরের দৃগতে কেউ তাঁকে জানত না, চিনত না তখন এই শিবপুরী সিউড়ীই আশ্রয় দিচ্ছিল একপ্রাণে স্থিত এই ক্ষুদ্র অপাবনে এই নবপাতকে। এই অপাবন কদরে এসে দাঁড়াল নবপাত। অপাবনকে উন্মোচন দিলে নবপাতই তো হল। যুগে যুগে ভগবান যে জাহাজ পাঠান ভূবিত তপিত মানস্কক ভবসমুদ্রের পারে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই জাহাজই সত্যানন্দরূপী নবপাত।

এই অপাবনে সেরা ফুলটিও ছিলেন তিনি। তাঁর অনুপম শোভার, গম্ভীর আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এসে শত শত ভক্তভ্রমর। মৎগানে হল ভূত, কৃপার রসেতে সিন্ধ। অন্য রসে সিন্ধ হলে দীক্ষিতার প্রাণ নাশের ভয় আছে কিন্তু এবে অনুভব, কপামৃত! এতে সিন্ধ হলেও মরণের আলংকা নেই। গম্ভীর বালিকের সৎলংক আহরণ করা যায়।

নিজে সূত্রীভূত ফুল হয়ে শোভমান ছিলেন বলেই সকলের জন্য তাঁর বাণী ছিল ফুল সূক্ষ্ম হও। ফুলের মত রূপে গম্ভীর স্বকলঙ্ক আনন দিয়ে ইন্দ্ৰিয়গে নির্বোধিত হতে, করে পড়তে বললেন। এ যুগের অসংখ্য মানব শৈল আত্মকোটা ইঙ্গিত। ওদের হয়েতা তিনি বলছেন ‘ফুল’ (full) সূক্ষ্ম হতে। ‘হাফ’ (half) সূক্ষ্ম নয়। ভিতরের মালিন্যকে বাহ্য চাক্ষুরিকো দেক রাখাটাই এখনকার প্রকৃত্য। তাইরই হয়েতা বলেছেন এই ‘হাফ’ সৌন্দর্য্য ভাষণ করে ‘ফুল’ সূক্ষ্ম হতে। নিখুঁত সূক্ষ্ম হতে, ভেতরের বাইরে সমান সূক্ষ্ম হতে।

আজ সেই ফোটাফুলটি নেই, পাঁপড়িগুলি হয়ে গেছে। মৌমাছিরা এক একটি পাঁপড়ি আগ্রহ করে বসে আছে তাঁর মধুর স্মৃতি নিয়ে। পাঁপড়িগুলি কোনটি তাঁর গান, কোনটি তাঁর উপদেশ বাণী, কোনটি তাঁর জপ, কোনটি তাঁর ধ্যান, কোনটি তাঁর নবীন হৃদিতরঙ্গিত শাস্ত্রবাখ্যা, কোনটি তাঁর শিশুদের নিয়ে আনন্দ, কোনটি তাঁর ভক্তদের রক্ত কণা। যার যেমন কৃপা, যার যেমন পিপাসা তেমনই তার মিটেছে আশা। যেমন হৃদিত তেমন বাছাবাছি। কেউ পেরেছেন তাঁর লেখনীর উত্তরারিকার জনকে দিয়ে চলেছেন গান কবিতার উপহার। কেউ তাঁর সূরের তরলিতে তুলে দিয়ে পাল জনক পারাবারে আনন্দ কাটাচ্ছেন কাল।

এই অপাবনের ঝঞ্চ হাওয়া যার গারে একটু লেগেছে সে আর তাঁকে ভুলতে পারেনি। তিনিই হো বীরভূম-বাদ্যকে অবাধ্যপে অর্পণ করলেন শ্রীমাক্কু চরণে, তাঁর নিজের বিশিষ্ট ধরণে। জীবনের প্রতিটি ধারায় এনে দিলেন রামকৃষ্ণকে। খেলাধুলা, গানবাছনা, লেখাপড়া, জনসেবা, সাহিত্য, সন্তোষিত সর্বত্র বসিয়ে দিলেন শ্রীমাক্কুকে। পতিত মানবজাতিকে আবার করে সোনা ফলাবার পথ দেখালেন তিনি। আবাদ করতে হলে সার চাই। তাই তো চালু করে ছিলেন সারসামেলা। মেলা সার। বত বংশী নাও। পতিত জমিতে রামকৃষ্ণ তাঁর ফসল ফলাও। কেবল সেই ফসলেই জীবন সফল হয়। তখনই বলা যায় শ্যোহং কৃতকৃতোহং সফল জীবনং মম। ঐ সার প্তের জমি ব্রহ্মাল হবে। ক্রিষ্ট জমি কৃষ্ট হবে সহজে। অর্থ আর অনর্থ নয়। বাবসা কর তাঁর নামে দেখো তাঁর কৃপা নামে কিনা। বাবসা কর তাঁর জর দিয়ে লোকদানের ভর কেটে যাবে। বাবসা কর তাঁর নামে দেখো তাঁর কৃপা নামে কিনা। বাবসাকর তাঁর জর দিয়ে লোকদানের ভর কেটে যাবে। শর্তকাটে নয়। মোকানগার কর কিন্তু বাবসা কর সম্প্রদে খেটে, দু'কান কেটে কর না। বিত্ত অর্জন অপরাধ নয়, অপরাধ হল চিত্ত হতে তাঁকে বর্জন। সংভাবে উপার্জিত হন লোকহিতার্থে বার কর, পরমবন অব্যয় হবে।

টাইনের বৃকেই তপস্যার আসন পেতেছিলেন সত্যানন্দসেব। প্রথমে কাশীপুরে তারপর কাশীনাথপুরীতে। সিউড়ীই হল কাশীনাথপুরী। সিউড়ী ইতিহাস নিয়ে বাঁরা নাড়াচাড়া করেন তারা এই তথা পরিবেশন করেছেন যে সিউড়ীর আদিনাম হল শিবপুরী। শিবপুরী থেকে শিউপুরী, তার থেকে সিউড়ী। এই কারণে তাঁরা বলেন বানানটা সিউড়ীর পরিবর্তে শিউড়ী হওয়াই সম্ভব। অপাবন গড়ে উঠল এই শহরে। অপাবন তো শহরেই হবে এখন। কেনর স্বধা ঘটেছে মানবের অনুপ্রবেশ। বন কেটে বসত হয়ে যাচ্ছে। বনবাগী নবাবোঁ হয়ে বাইরের আলো উপভোগ করছে। তাদের বাইরের কালো রঙো মনে গিরে ঢুকছে বাইরের কলমলে আলো সহ্য করতে না পারে। টাইনের আরম্ভে আজ সব কিছু ডাউন। হিমালয়ের নিচুত তাঁর স্থানান্তরিতও বাজার হুসে গেছে আজ। বাগীনাহী বাস সেখানে স্থায়ী বসবাস শুরুর করেছে। নিকরের মধুর তানের সঙ্গে পান্না দিচ্ছে বাস ইঞ্জিনের ঘণ্টার গান। জিজ্ঞাসের হৃৎলোচন নৈর্দর্শক শোভাকে ভয়ানক ভয়ানক করতে উদাত। শ্বিগের চিল্ল আর সেবা যার না, কিন্তু সহজেই দেখা মেলে ভেজাল খাবার বাওয়া ভেঙে শব্দ উদয়শ্লের। বত ঘুরেই বাই না কেন আমার নাক কখন—“টাইনের গন্ধ পড়ি”। একে এড়াবার উপায় নেই। এটি কালের ধান।

একশো বছর আগেই শ্রীমাক্কুসেব এই গন্ধ পেতেছিলেন। গৌরীমাকে তিনি বললেন—“আমি জল ঢেলেছি তুই কাপা চটকা”। গৌরীমা তাঁকে বলছিলেন—“কতগুলো মেয়ে মাও আমি হিমালয়ে নিয়ে গিয়ে তৈরী করে নিয়ে আসি।” ঠাকুর উত্তরে বললেন—“না, এই টাইন কনসই করতে হবে।” তাই সিউড়ী টাইনেই অপাবন গড়ে তুলেছিলেন সত্যানন্দসেব।

সেই অপাবনটি আজও আছে, অপাবনের কবি আর মূল সেহে নেই। সেই ঘর, সেই উঠান, সেই স্টেজ, সেই ছায়াছাড়া। এরা সব তাঁর অগণিত লীলার সাক্ষী। মোটোগাড়ির জামাছটার ডালগুলি অনেক সত্যানন্দসেবের

তপস্যার ছল হইয়াছিল এক সময়ে। গাছটি আজও তেমন দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু যে কুড়িগুলো চুটছে তার সামান্য বাতাসের আন্দোলনেই করে পড়ে নীচে। পড়বেই তো। এরা তো তার সম্পন্ন পাল্ল নিন। নীচের আঁকিনাটা পেরোছিল তার চরণ সম্পন্ন, বহনিন। তাই কুড়িগুলো নেমে আসে নীচে, শ্বেতহার মাথতে চায় সেই দুলো।

এই অপ্রাচ্যনে এসেছেন গোপাল। বৃন্দরূপে—গদাধর গোপাল এবং গিরিধারী গোপাল। গিরিধারী গোপালকে তো সবাই চেনে, সবাই জানে তার কথা। সেই নটনট গোপাল যার বায়না ধরা কতু হয় না সারা। কিন্তু গদাধর গোপাল? না, কেউ এ'র কথা আগে শোনে নি, কেউ দেখেনি এ'র রূপ। সত্যানন্দের একাঙা নিজের এই গদাধর গোপাল। তিনিই এই নবীনরূপে গ্রীষ্মকৃষ্ণকে বদ্যলেন করার বৃকে। রামকৃষ্ণ ভক্ত পেল খেলার সহী, পেল ভালবাসার ধন। সেখানে যোগদা দুলাল কানাই, এখানে চন্দ্রা দুলাল গদাই। সেখানে ননী দৃক খেয়ে পুষ্টি, এখানে মরুপ ভোজন পান তামাকেই কুট, তার শিরে ময়ুরে মৃকুট পীতাম্বর শোভে প্রগণ, এ'র কালেকথ কোট চটিজুতা পাবে চরণে। একজন শ্যাম মনোহর, আর একজন শ্যামা মনোহর। সেখানে বহুনাভীর, ময়ুরীতে রাখা তান; এখানে জাহ্নবী নীর, মা ডাকে ধারা বহান। সেখানে বংশীংগটে বংশীতে মুর লয়, এখানে বাণীতে মায় লয়। একজন বলে "মা শূচ..." অভয় দেন, আর একজন বেচে বকল্যা নেন। বত হ'ক গরল বাঁটা একবার শরণ নিলেই শূচ হ'বে সরল হাঁটা।

আশ্রমে গোপাল এসেছেন। ধর পেরে ভক্তদের বাড়ীতে সাদা পড়ে বার। সবার হৃদয়কে নাড়া দিয়ে দেন নারায়ণ। দর্শন অভিলষে সকাল, দুপুর, সংখ্যা সব সময়েই ধ্রুগে থাকে ভিড়! এ যে শক্তির নীড় তাই গুহ্যভিমুখী হতে চারনা কারো মন। গোপালের জন্য সবাই এনেছেন কিছু না কিছু। আনতেই হবে। আর যে নিতা নতুন স্কোলের খেলা। কতিন হলেও তার ঠালা সামগ্যতে সবাই বংশী। তাঁর বায়না প্ররণ করল মনের আয়না বার খুলে। কলম্বিরে ওঠে অস্ত্রচটা। তখন হৃদয় বন্দাবনে অহরহ শোনা যায় তাঁর বংশী আর মানসগঙ্গার ডেউ জুল বার দাঁখানাপুত্রের রসনরের হাসি।

বহিন কাটল ভরপুর আনন্দে। এল কর্দিন। ২৫শে ডিসেম্বর। প্রায় দু'হাজার বছর আগে এমন দিনে বেথলেহেমে হেমবরণ শিশু বীন্দু রূপে বহিন আবির্ভূত হইয়াছিলেন তিনি তো আমাদেরই গোপাল। গ্রীষ্মকৃষ্ণের ঐক্যক জন্মদ্বিধলেন আভাবলে তাই তাঁর দিশিভরী অস্থ জয় করল প্রায় গোটা বিশ্ব। ঐশ্টোন সাধনাকালে এই ঐক্যকই প্রবেশ করলেন রামকৃষ্ণের পেরে ভিতর। গ্যালিলির ভীরে তিনি দিলেন ডাক "কি নিয়ে বাত তোমরা সব, সব কিছু ছেড়ে দাও আমার পিছনে এঁড়াও।" এ ডাক উৎপেক্ষা করা যায় না। যাদের প্রাণে বিল নাড়া, তাদের মাছ ধরার জাল হল হাতরাড়া, মানুষ ধরার জাল হাতে নিল 'তারা। দিকে দিকে ছাড়িয়ে দিল ঐশ্টের বাণী, তাদের প্রাণ নিয়ে টানটানি। অত্যাচার, নিপীড়নের মধ্য দিয়ে তারা ক'রে নিল পথ, এগিয়ে চলল ঐশ্টের জয় রথ। কারাগারের কুঠই এসাঁলেন আভাবল কাঁকক হয়ে, অব্যার তিনিই এলেন ঢেঁকিশালে রামকৃষ্ণরূপে। সেই আভাবলে মেরী মায়ের কোলে আবির্ভাবের দিনটি আজ। আশ্রমের মন্দিরে বৈদীর সাধন সাধান হরুহে মেরী মায়ের কোলে শিশু-বীন্দুর মর্তি। সাধনে থালয় মোমবার্তার মালা জ্বলছে। শিশুরা প্রিয় ছিল বীন্দুর। তাদের সারলা মঙ্গরাজ্যের প্রতীক। এখানেও আজ লেগেছে শিশুদের মেলা। কেক, লজ্জম, টাফ প্রদাসের আকর্ষণ আছে। হল গান, হল বীন্দুর বাণী পাঠ, হল প্রদম বিতরণ। সব কিছুর মধ্য দিয়ে হল আনন্দের বরিকল। আতের আর্তি ঘোচাতে বহিন নেমে এসাঁলেন করার বৃকে ত্রীক অর্গাত করার এই বিশেষ দিনটি উৎসাহিত হল গ্রীষ্মকৃষ্ণরূপে প্রবর্তিত ধারায়।

সিউভী থেকে একদিন গোপাল গেলেন রাসকল আশ্রমে। এখানে সত্যানন্দসেব আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন তপস্যার ছল হিসাবে। নরুত্রাকী ও কানানদীর আবেশনে একটি ছোট বীল নরসিংপুর। নরদেহী ডাশদাঁসে

সত্যানন্দসেব এই মনের দ্বারা পেয়েছেন পঞ্চদশী, সেখানে পাতনের পঞ্চদশীই আসন। আমরা যারা সত্যের কান্দা-
গলিতে পথ খুঁজতে খুঁজতে ক্রান্ত তাদের জন্যই তো কানানব্বইর স্বপ্নের তার ধানের আসন পাতা। স্বপ্নের তীক্ষ্ণ আঁকস
সামনে আমাদের বাসনা সর্গগলি ফলা তুলতে অক্ষর। এইজন্যই তো তার আসা। বসন্তের পঞ্চদশীতে তার সাধনার
শব্দ, আর হাসানের পঞ্চদশীতে স্বপ্নের তখন তিনি গুরু। এখানে শরৎকালের ধারে ধারে বসে তিনি শর নিক্ষেপ
করলেন চারিদিকে। রামকৃষ্ণ মঠে শর, বীরভূমে তুলসী কৃপার কড়। সেই ঝড়ে অনেক আহত হল প্রবর অবর।

তিনি নাম দিয়েছিলেন বিপ্লবের তার। এনা এখানে, স্বপ্নের চিত্রায় মন হয়ে জগৎকে বিম্বরণে ফেলে দাও
—এই ছিল তার নীরব আহ্বান। এখানে তোলা হয় তার প্রথম আলোকচিত্র। ধানের অংশে জ্বর দিয়েছেন তিনি
আমাদের জ্বরে বাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে।

রামধনে নর্দানর্দিত স্বেচ্ছা মন্দিরে সৌন্দর্য বহুভর জড় হয়ে আনন্দে কাটলেন গোপালক পেয়ে।

এরপর একদিন গোপাল পেয়েছেন বাতিকার। গুরুভাবে ভাবিত সত্যানন্দসেব স্বপ্নের তার সাধনকৃতীর মূর্ত্তায়
থলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন তখন এক একে আকৃষ্ট হয়ে আসতে লাগল ভক্তরা। কিন্তু স্বপ্নের সিউডী তার আহ্বানে
ঠিক মত সেরনি সাজা তখন বাতিকের পড়ছিল নাড়া। সত্যানন্দসেবের করুণভাবের আলোকে পথের হালি পেয়ে কত
জন সোবারে যাত্রা শুরু করেছে। তাদের হুটলি চোখ, বাড়লি রোখ। একছোটে গল্পের পৌছবার অভিজ্ঞতা তাই তার
চরণে সর্বাঙ্ক নাস ক'রে রত নিয়েছে সত্যাসের। সেই বাতিকের এসেছেন গোপাল। ফুল, পাতা দিয়ে আশ্রমে সাজান
হয়েছে। মাইকে নামগান হচ্ছে। বাতিকের নরনারী এসে তাড়াতাড়ি। সত্যানন্দসেব তোমাদের মনের আঁধার
ঘুচাবার জন্য যে বাতি জ্বলিয়ে দিয়ে গেছেন তাকে নিভতে দিও না। তোমাদের মূর্ত্তি কর দিয়ে আঁকল করে রেখে সেই
বাতিকের, স্বপ্নের কোড়ে। হাওয়া সেন তাকে নিভিয়ে না দিতে পারে।

উলস তাই সবই আছে। আছে পুঁজা, আছে পাঠ, আছে হোম, আছে নামগান সঙ্গে আছেন প্রদান
ভগবান। খালি পেটে খবর হয় না তাই প্রদান ভগবান সঙ্কলক তৃপ্ত করছেন। কুন্ডলিনী স্বপ্নে জাগে তখন উলস পার
হয়েই ওঠে চলতে। গানে গানে গোপাল হলেন বন্দিত ভক্ত উলস নন্দিত। মোহাবিশিত, বাসনার্ষিত মন ইচ্ছাকৃত হয়ে
দ্বিধ হয়ে গেছে। মূর্ত্তি চাইলে শক্তি হতে হবে। যে বীজ দিয়েছেন সত্যানন্দসেব তাকে নিয়ে জ্বল দিতে হবে সাধন
সারের অঙ্গল। যে চারা তিনি রোপন ক'রে গেছেন তাতে জরিত বারি সিক্ত কর, বিধানের সার দাও, দাও উপহার
তাপ, সে চারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে আকাশ পানে পুষ্ট পাদপ হয়ে।

উলস মানে আমাদের সর্বাঙ্ক উদ্বেগের প্রকাশ। ঠাকুর স্বেচ্ছা, তাই জ্বল মন তাকে চায় না।
মনকে বড় কড় তুলে রাখবার চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে যাতে ঠাকুরই প্রের এবং ঠাকুরই প্রের হয়ে ওঠে।
ঠাকুরকে বসে আসা মন দিতে চাও তত আসা মন সত্যের থেকে সারের আনতে হবে। তার চরণ পেতে হলে না চর না
চর। অর্থাৎ বৃষাটন কথ করতে হবে। বেহের বৃষাটন, মনের বৃষাটন সব কথ হওয়া চাই। বাইরের রস না শূন্যলে
দ্বিধ রস পাওয়া যায় না। বাইরের রসকে বন্ধ করতে হবে সর। ছুঁমি সরে বাও। ঠাই নাই, ঠাই নাই মোর ছোটে মন তরী,
ইষ্টে চিন্তা রসে তা গিরাছে ভরি। মাথা তো মারের ঘান। সেখানে সহস্রল পদ্ম মারের চরণ বরণ কর। মনের
নড়াচড়া কথ হয়ে বাবে। মাথাকে উল্টে দিলে থামা হয়। মনকে বল তোর উল্টা চলা থামা তখন দেখবি
সবই 'মা' 'মা'।

দিনান্তে উলস শেখ। আনন্দের রেশ নিয়ে পুনরায় সিউডী প্রবেশ। আবার জমে ওঠে ভক্তের মেলা আর ভক্ত
মন গোপালকে তীক্ষ্ণকৃষ্ণি দেখা। ভক্তের বৃকে ঠাকুর চিত্র-অখরা ধানের বন। ধান করলে জ্ঞান হবে তিনি কত
আপন। তোমার কল্পনার ঘূড়ি আকাশে ফুল দিয়েছে? খেল বেড়াচ্ছে? বেড়াক। শূন্য দেখা ঘূড়ি কেন গাড়ি

যেতে নেমে না আসে। তাকে আরও ভুলে যাও বেন বুড়ি ছুঁতে পারে। রামকুললোক কোল পেতে অপেক্ষা করছে তোমারই জন্য তো, তুমি যাবে না সেখানে? তুমি তো রামকুললোকের অধিবাসী। সেখানে থেকে এসেছ এই লগ্নটোতে দু'চার দিনের জন্য। দু'দিন পরে ফিরে যাবে আবার সেই আনন্দ ধামে ঠাকুরের কাছে। লগ্নটোতো বিদেশ, এখানে তুমি তো প্রবাসী। দু'চার দিন আনন্দ ক'রে—আবার ফিরে যাবে সেই আনন্দ ধাম রামকুললোকে। দিনে অন্ততঃ একবারও রামকুললোকের চিন্তা করবে। সর্বদুঃখ ঠাকুর আছেন দিনে অন্ততঃ একবারও সেকথা ভাববে। বাসুদেব সর্বদা। এই যে তুমি আমার আমার বলত, সব কিছুকে আঁকড়ে ধরতে চাইছ তাইতো পরিণামে কষ্ট পাইছ। 'আমার' না বলে 'আমি মার' একথা বলতে দেখো। তখন ভাবনা যাবে ভাব হবে। চণ্ডীতে মা বলছেন "একোবাং লগ্নতার ষিঠীয়া কা মমাপরা"। মা'ইতো সবকিছু হস্তেছেন। তিনি ছাড়া ষিঠীয়া তো কিছু নেই। মন, তুমি তো ভুল করে সব কিছুকে মা হাতে আলাদা করে দেখছ। এক না ভেবে বুই ভাবছ। বুই নিরায় তো দু'দিন আর অস্তে দুখ নিরায় আহাউয় করা। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শেখালেন তু'হু তু'হু বলতে। তু'হু তু'হু বলতে শিখল আর আহা উহু থাকে না। তখন আনন্দ। অর্থাৎ তোমার আনন্দে তাঁর পরায় হাসি ফুটে। আসা হবে হাস্যময়। দানন্দ সবুধ ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়। তিনি তো ফিরে চাইছেন তুমিই তো ফিরে যাক, তাঁর প্রসারিত হাতকে উপেক্ষা করে। তুমি উপেক্ষা করলেও তিনি অপেক্ষা ক'রে আছেন। ভক্তের জন্য ভগবানের চির-চঞ্চলতা। মা'র ছেলের জন্য চিত্তা চিরকাল।

ইহলোকের সূর্যের সূর্য মিলিও না সূর্যলোকের দু'নি শূন্যেতে পারে। মা'র ভালবাসার জন্য ভালোবাসা চাই। তোমার নির্মল হৃদয়ই সেই ভালোবাসা। বাসনাহীন মনই ভালোবাসা। বাসনাহীন মনই শূন্য মন। তিনি শূন্য মনের গোচর। 'তু'কাকে না বর্ণিলে বোধ লাভ হয় না' বলেছেন বুদ্ধদেব। 'কনয় মশান নাহুক তাহাতে শ্যামা'। সব বাসনা ভস্মীভূত হলেই কনয় শূন্য। তু'কা 'বশ' হলে তুমি 'শব'। তখন মায়ের চরণ তোমার বকে। তোমার পুরে তাঁর নুপুর বাজবে। মরা মরা জপ করে রক্তাক্ত বালদীকি হয়ে গেলেন আর তুমি রাম রাম জপে মরা হতে পারবে না? এই শিবপুরীতে তোমাকে শব হতে হবে। অহংকে ঘেরে ফেলে তার বকে তু'হুকে গড়ি করাতে হবে। মন বখন দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিতে শিখবে তখন নম হয়ে যাবে। তখন সে অহংকার শূন্য হয়ে নমস্কার করতে শিখবে। পূজা করতে শিখবে। সেবা করতে শিখবে। প্রণিপাত ও সেবা দ্বারা গুরু, কৃপ্ত হলে জ্ঞানলাভ, ভক্তিলাভ সবই সম্ভব হবে তবে তুমি গোপালকী। সমস্ত পৃথিবীটাই গোপালের। তাই যদি মনে নিই তাহলে তুমি হতে জাত তুমি হতে পুণ্ড্র সব কিছুই মালিক গোপাল। তুমি আমি সবাই গোপালের। সমর্পণ সর্বশ্ব সমর্পণ হয়ে গেল।

গীতামূখ গোপালকুল বলেছেন "বিদ্যভ্যাংমিথং কুলজমেকাৎশেন দ্বিতো লগ্নঃ" তিনি একপাদ দ্বারা সমস্ত জগৎ দাক্ষ ক'রে আছেন। মন, তুমি তো সেই লগ্নেরই এক অংশ, ক্ষুদ্র অংশ, অংশাতি-অংশ। একদিন কলসের কাঁচাগারে তাঁর আবির্ভাব হইবেইল ঈশ্বরের মূর্তি দিতে, আর অশেষ বাসনা-কাঁচাগারে মোহাঈশ্বটকে মূর্তি দিতে আবার কি তাঁর আবির্ভাব হবে না। সত্যানন্দ গোপালের উপাধানে গলাধর গোপাল, গিরিধারী গোপালের শূভাগমন তোমাকে সেই আশ্বাসই দিচ্ছে। তোমার জন্যই তো তাঁর আলমন। তুমি উচ্চকণ্ঠে বল—

নমো নমস্তেহমতু সহস্রকৃষ্ণ

পুণ্ড্র ভূয়াহপি নমো নমস্ত।

নম পুরুষাধর পৃষ্ঠভক্ত

নমোহমতু তে সর্বত এব সর্ব।

—গীতা ১১০৯

আমার আত্মকথা

ঔশরাপুত্রী

অথ দিনগুলি সোনার খাচার না থাকলেও মনের পাতার আছে...বৃক্ষের ব্যাধি আছে। আর ইতিহাস হয়ে মহাকাশের বৃক্ষে চিরদিনই বিকৃত থাকবে—। নীতি শাস্ত্র বলে ভালো মন কোনো কিছুই হারায় না। এটা শুধু তবু কথা নয় আমকের বিজ্ঞানীরা টেলিফোন, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছে—

হ্যাঁ তারপর বা বলছিলাম—

সেদিন হঠাৎ আমি চমকে উঠলাম আমি যে হলটায় থাকি সেই হলটার প্রবেশের দ্বার হয়ে ওঠা বিশ্বভারতীর সঙ্গীত অধ্যাপক প্রভু নারায়ণ চিন চৌধুরী কথামূলক হয়েছেন। তিনি বলছিলেন ঠাকুর কি সুন্দর কি সুন্দর, কি মনোরম জায়গা, কি শান্তির জায়গা। এখানে এলে শরীর মন সব জুড়িয়ে যায়। মনে হয় ঠাকুর সব আপনার দিবা সন্ধ্যার ফল। তাছাড়া কি সুন্দর করে সব সাজানো। উপরে দেওয়ালে বড় বড় পেটিং এর মাধ্যমে হৃদয়বাহার শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের লীলা চিত্রনীচে ধরে ধরে সাজানো কত বাসাবস্তু। ও বাসবা কি সেই তানপুরা এলাক বেহালা ফিটার টিউনগোফোন সেতার পিয়ানো অর্গান গোত্রা কত কি। কত কল্যাণকর জলসায়ের থাকে—নাচ ঘর থাকে, এটা যেন মস্তে'র কেন সুত্রালোকের সভাঘর। ইস কি আশ্চর্য্য এ দেখুন ঠাকুর আমরা বসন্তগুলিতে কেমন করে রাখবে ভেবে কুল কিনারা পাই না। তারের বসন্তগুলি আমরা কত শংকর খাটের তলার শূইয়ে রাখি, ক্ষয় করে তাই এই বৃক্ষ কেউ দাঁড়া নিল—এই বৃক্ষ বাচ্ছারো ভেঙ্গে ফেল। আর এখানে কেমন নিশ্চিন্ত ভাবে রয়েছে। এ নিশ্চয় আপনার পরিসংখ্যান ঠাকুর। শ্রীষ্টাকুর মন্দ হেসে বলেন হ্যাঁ এ ন্যায়ের কথা বলছেন। ন্যায়ের গায়ের আঙঠা লাগির তাতে এক একটি বস্তু তাতে দাড় করিয়ে রাখা খুঁই সুবিধা। এতে ভাববার ভর নেই। তারপর সারদা মা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির দুটি দেখে বলেন যেন জীবন্ত। এখানে সব আশ্চর্য্য সুন্দর ও মন ভরানো ব্যাপার।

আপনারা অনেকদিন ধরেই আমার কথা শুনেছেন আর শোনার বৈধি আছে কিনা জানিনা। এতদিন ধরে আপনারা অনেক কিছু জানলেন এবার শুনুন আর একটি অধ্যায় বা শুধু সূত্র হলেও বাণীর বৃক্ষে এই হল ঘরটার প্রথম। ছোট আকারে কুম্ভ মেসার মত সাধারণ সমাবেশ বা সাধু সম্মেলন।

পুরানে বর্ণিত—সূত্রের মতন করে যে অমৃত কুম্ভ উঠেছিল সেই অমৃতের আঁকড় নিজে অসুর ও দেবতাদের মধ্যে তুলে সন্তোষ বাধে দীর্ঘ বার্ষিক ধরে। এ কলনের মধ্যে কুম্ভ যেখানে যেখানে রাখা হয়েছিল, সেখানে যেখানে কলকে কলকে সেই অমৃত পড়ে। যে যে তিথি রাশিতে নক্ষত্রে অমৃত হল রাখা হয়েছিল, ঠিক সেই সময়েই কুম্ভভোগের মহোৎসব তাই এ শ্রুতকর্ম সাধু সম্রাট গৃহস্থ বানপঞ্চী সকলেই মান করে পূজা সঙ্গ করেন।

এই সাধুর সমাবেশ অবশ্য কুম্ভভোগের জন্য নয়। যে তিথিতে শ্রীরামকৃষ্ণ দেব মস্তে'র আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই তিথি উপলক্ষ্য করে এই সাধু সম্মেলনের আয়োজন।

গহর জলে গৈরিক আভা ছাড়িয়ে দিনসেব অস্ত গেলেন। আর তো সময় নেই। যাতে কিছু হুটী না হয় সকলকে তার জন্য তখন হতে উঠলো।

ঠিক সময়েই গাড়ির হর্ন বেজে উঠলো। সাধুরাও সমবেত ভয়েরা শব্দভাষে হতে উঠলেন। ঘন ঘন শব্দ ধ্বনি হলো। তারপর সম্রাট সহ ধীরে ধীরে এসে উপস্থিত সারদেবীর আশ্রমে গৃহপুত্রী মাতা। বিনি শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মানস কন্যা গৌরী দ্বার মেহধন্যা। গৃহপুত্রী বা আসরে এসে বসলেন।

তারপর এলেন যোগদা সংসদের প্রধান স্বামী আত্মানন্দ গিরিজী। হালিশহর নিমমানন্দ আশ্রমের প্রধান সত্যানন্দ স্বরসতী। দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের (আদ্যাপাঠী) প্রধান সূর্য্যর ডাই। তারপর এলেন বৃন্দাবন বিহারের তনুয়া মন্ড প্রথম পরণে হৃদয়ে পরিচয়। এলেন জেরোরাস্ট্রীয়ান সম্প্রদায়ের প্রথম আত্মা শ্রী ও শ্রীমতি সাক্ষাৎ। এসে উপস্থিত হলেন আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ আনন্দ আশ্রমের কোষাধ্যক্ষ ফেডরিক সোফেন, ভারী ভাব প্রবণ। একের পর এক একে আসতে লাগলেন কোলম্বের সম্যাসী শ্রীঠাকুরের গুরু ডাই রবি মহারাজ, যোগেশ্বরী সারদা মঠ, হিন্দু মিশন, মাহেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সাধুরা। মহানিষ্ঠান মঠের স্বামী ব্রহ্মানন্দ। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সপ্পন্ন চতুর্ভুজ রামানন্দ। স্বামী সিদ্ধানন্দ, শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাধনা অসিতানন্দ মহারাজরা। সকলেই নিজ নিজ মনোভাব অনুযায়ী ভাষণ দিলেন। এইভাবে সাধুর ব্রাহ্মণ সর্বাঙ্গ সাধুর পরস্পর ক্রমে একে একে আনন্দে দলমলো হয়ে উঠতাম। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গ অপনাদের কাছে বেলে দিলাম। জািনি আপনারা কে কিভাবে নেবেন।

আমার কথা ঘুরেলে নটে গাছটি হুঁজুলা—

—:—:—

শ্রীশ্রীসারদা পুঁথি

(৪)

স্নেহসুরধুনী

অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ

(ড. কে. ডি. রায়)

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

জর জর রামকৃষ্ণ

লীলার প্রকটহেতু

জর জর বিশ্ববাস্তব ব্রহ্মসত্যতায়ী।

জর জর শ্যামাসুতা সারদা-জননী।

সত্যানের পাপ-তাপ বহু কাদা ধূলি।

হৃদ্বিরা মেহের কণে নাও কোলে তুলি।

গুরু সত্যানন্দ।

মর্তে আগমন।

জর জর সত্যানন্দ, প্রেমানন্দময়।

তোমার চরণে যেন মোর মতি রয়।

প্রেমের মর্ত্তি তুমি, তুমি মোর সার।

তোমার চরণে রাখে অনন্ত সোনার।

তুমি যারে কৃপা কর কে নাশিবে তারে।

তোমার কৃপাই সার বিশ্বনাথের।

সারের অন্তর

মানুষ দুর্বল কু মানিভেন মাতা।

অন্ত পাল দির তারা আদ্যে পুষ্টে ধীবা।

মানুষের মন পুষ্টে ঘটাং দিকার।

পুণ্ডরীক সঙ্কার বহু বিভিন্ন প্রকার।

সংস্কারের এত শক্তি এত তার জোর।

অচেতন করে তবু কাটে নাচো ঘোর।

মায়ার সপোরে থাকি অসংখ্য জন।

মারারই সত্য ভাবে প্রকৃত বসন।

সন্তোষবশে জীব বাতাসাত করে ।
কল্লুর বল্লব সম ঘুরে ঘুরে মরে ॥
পুঁরাবালে ছিল এক রাজার কুমার ।
সেখিত সূক্ষ্মর তনু গলে মনহার ॥
একদিন প্রাসাদেরে বাণ্ধবের দল ।
কুমার সকাশে আসে খেলবার ছল ॥
কেহ বলে 'রাজা' 'রাজা' খেলা হ'বে আজ ।
কেহ বলে 'বৃদ্ধকলা' লয়ে বৃদ্ধ সাজ ॥
এ সকল শুনিল বলে রাজার নন্দন ।
এসব খেলার মোর ভরে নাফো মন ॥
তার চেয়ে শুনি আমি ধোপা পাটা হয়ে ।
শিশুতে কাচহ বস্ত্র হুসু হুসু করে ॥
বিপরীত কর্ম হেরি পাইল সন্ধান ।
আছিল সে পুঁর্ব জন্মে ধোপার সন্ধান ॥
সন্তোষেরে শক্তি কত বোঝাবার আশে ।
শ্রীপ্রভু বলেন গঙ্গা কেশব সকাশে ॥
শ্রীপ্রভুর পাদপদ্ম কেশব-কমলে ।
দীক্ষণ শহরে আসে লয়ে দলবল ॥
আনন্দের হাট বসে থেথা প্রভু রাজে ।
কাহারো নারীক হুশ রাতি দশ বাজে ॥
কেশব বলেন প্রভু 'গাংগা হোথা আজ' ।
উত্তরে কেশব ক'ন 'গাংগে আছে কাজ' ॥
কহেন শ্রীপ্রভু তবে হ'রে হাস্য রত ।
তোমার অবস্থা সেই মেছুনীর মত ॥
বাজারে বেঁটীয়া মাছ দৈবের ফেরতে ।
অর্জাণি হইল এক মালীর বাড়িতে ॥
মালির আলর ঘেন নন্দন কানন ।
সুবাসিত নানা পুঁপে বিকি বরণ ॥
মেছুনীর কথ ক'রি, আহারের পরে ।
শুইবারে দিল এক সুসজ্জিত ঘরে ॥
ঘরখানি পুঁপে পুঁপ গন্ধে ভরপুরে ।
মেছুনীর নাহি ঘুম, রজনী দুপুরে ॥
মেছুনী লম্বায় শব্দ করে ছটফট ।
মালিনী শব্দায়, কিবা হইল সংকট ॥

মেছুনী কাঁদল অথর্ অতি ক্রিষ্ট ভাবে ।
ফুলের গন্ধেতে মোর নিদ্রা নাহি আসে ॥
আঁখি চুপড়িট ঘোর নাও হেথা আনি ।
অঁখের গন্ধেতে নিদ্রা আসিলে যে জানি ॥
সেংহ সন্তোষ কিবা কত শক্তি হয়ে ।
পুঁপ গন্ধে নাহি নিদ্রা অঁখ গন্ধ তরে ॥
জনৈক সন্তান তব ছিল মাকুড়ত ।
মাতের সেবার লাগি সদা অনুরত ॥
পুঁর্বের সন্তোষ হেতু অঁখি হোল ঘোর ।
অন্যারের আচরণে হইল বিভোর ॥
সকলেই করে ঘণা করে দুঃ দুঃ ।
বাধা ভরা মন আরও হইল আতুর ॥
প্রভুর বর্ণিষ্টে ভক্ত কন মাতৃপাল ।
আসিতে দিওনা তারে তোমার সকাশে ॥
সন্তানের কষ্ট শুনিল মাতের পরাণ ।
দুঃখে ঘেন ক্ষেতে বার হর খান খান ॥
করুণা কন তবে মেহকরা মত্রে ।
আশ্রিত সন্তান মোর বাঁধা রেহ তেরে ॥
আমার সন্তান যদি গারে মাঝে খলি
হলারে কাড়িয়া আমি দেব কোলে তুলি ॥
শোনো মন, কত বড় আশ্বাসের বাণী ।
এ যে মোর রেহ বড়া সাধনা জননী ॥
পাপী, তাপী, সবাতরে মেহ সুহৃদনী ।
মেহবাণে সিঁড় করে সমগ্র ধরণী ॥
শ্রীপ্রভুর লীলা মাঝে আছরে কাহিনী !
আশ্রিতের তরে বেধা রেহ মন্দাকিনী ॥
বৃষ্টির পরতে প্রভু ভূতিখাল হ'তে ।
আলয়ে ফেরার তরে নামিলেন পথ ॥
পথতে সেখেন এক মাগুরের খাড়ী ।
প্রভুর চরণ প্রান্তে করে ঘোরাঘুরি ॥
আশ্রিতের তরে কৃপা কলম পুঁপুরে ।
জগেরে পুঁপ দিয়া ফেলেন পুঁপুরে ॥
রামকৃষ্ণ সরণা মা জনক জননী ।
আশ্রিতের তরে সদা রেহ সুহৃদনী ॥

: ছোটমামার গহনা উদ্ধার :

নরের আকারে যারা হয় নরাদম ।
 নীচ বৃদ্ধি হইল মন্য না মানেন ধরম ॥
 জননীরে নের কণ্ঠ মনেতে আঘাত ।
 তাগেরো কল্যাণ তরে মার অশ্রুপাত ॥
 মারের কনিষ্ঠ প্রাতঃ জন্মের চরণ ।
 মাজেটে গ্রামেতে তাঁর বিবাহ বধন ॥
 সুরমালা নাখাই জাঃ, কন্যা রাধারানী ।
 যোগমায়া নিজে বিনি মারের পরানী ॥
 ছোটমামা ছোটমামী রাখুদিদি নামে ।
 অভিহিত হ'ন তাঁরা ভক্ত গোষ্ঠীধামে ॥
 বিধির স্থান দেখে সৈব পরবশে ।
 ছোটমামা মারা যান নবীন বরসে ।
 ছোটমামী অক্লান্ত, মাথুর জননী ।
 শোকে তাপে দিশাহারা হন উমাদিনী ॥
 অভয়ের শেষ ইচ্ছা মারের সকাশে ।
 তাসের আশ্রয় হেতু মা'র পদপাশে ॥
 পাগলিনী মামী আরে দিদি রাধারানী ।
 আশ্রয় পাইল, স্বাঃ জগন্জননী ॥
 একবার ছোটমামী ভাবিলেন মনে ।
 কহুনিমি বাই নাই পিতার সমনে ॥
 কন্যা ও তাঁহার বত জল-ভার ছিল ।
 সঙ্কলি একসাথে কাপড় বাঁধিল ॥
 পিতার আলয়ে পৌঁছি পিতৃদেবে কন ।
 অলঙ্কারগুলি রেখা করিয়া বতন ॥
 বিহ্বাসন পরে মামী কহেন পিতারে ।
 আমার গহনাগুলি দাওগো আমারে ॥
 কাটিল অটেকদিন বেথা পিতৃবাটী ।
 এবার ফিরিতে চাই জগন্নাথবাটী ॥
 কন্যাবাকা শুন পিতা কহেন সজোরে ।
 তোমার গহনা কিছু নাই মোর ঘরে ॥
 কন্যা হয়ে মিছামিছ দাও অপবাদ ।
 কান্দিতে লাগিল মামী গণিমা প্রদম ॥
 কে'দে কে'দে ফিরে আসে মারের চরণে ।
 কাঁদে আর মাথা ঠোকে গহনা কান্দনে ॥

সিংহবাহিনীর মাড়ে গিরে ছোট মামী ।
 কেবল ঠোকে মাথা নাই ধামাধামি ॥
 আমার গহনা দাও বলি শূন্য কাঁদে ।
 কাঁদে আর মাথা ঠোকে গভীর বিষাদে ॥
 মামীরে জুলিয়া মাতা আনে স্বর করি ।
 সম্মুখে হৃদয়ে চোখ রাখে বৃকে ধরি ॥
 মামীর কান্নায় মা'র বৃক ফেটে যায় ।
 মামীর বাবারে ডাই ভাবিয়া আনার ॥
 তার পাশে কলজোড়ে বহেন জননী ।
 'আপনার কন্যা হয় বিধবা রজনী ॥
 কন্যার গহনাগুলি দিন দিয়া ক'রে ।
 রহিব সবাই বঁধা ক্লান্তবদা ভোরে ॥
 ইহাতেও ব্রাহ্মণের মন নাহি গলে ।
 'গহনা নাহিক কিছু' বার বার বলে ॥
 কি বড় গরিষ্ঠ কার্য, কি বড় প্রদম ।
 পিতা হ'লে কন্যাধন করে আকল ॥
 নিরুপায় হয়ে মাতা কলিকাতা ধামে ।
 জানায়েন সব কিছু পরের মাথামে ॥
 অঁচরেই আশ্রয় কলিকাতা হতে ।
 লালিতমোহন ভক্ত শ্রী-ম এঃ সাধে ॥
 ভিক'সনে কড়াব, লালিতমোহন ।
 মাতৃনামে অভিষিক্ত মাতৃপদে মন ॥
 মাতৃতরে খাড়িব্যাড় তাঁর সব কিছু ।
 বীরত্ব হনুমান মায় পিছু পিছু ॥
 জননী সম্মুখে কন জন্মের মাঝার ।
 'লক টাকার প্রাণ ধরে লালিত আমার ॥
 কেহ যদি বন্ধু করে মায় অপমান ।
 লালিত পোড়াবে তারে করি খান খান ॥
 মার তরে তার প্রাণ আকুলি কিছুনি ।
 দরকারে সাধে নের পিঙ্গলের গুলি ॥
 মাতৃস্নাত মনপ্রাণ স্নেহভেই বাধা ।
 মাতৃস্নেহ তরে শূন্য মারের অবাধা ॥
 মারের এমত ভক্ত দেখি নাক আর ।
 তাঁর পরে নমি আমি লক কোন্‌দার ॥ (ক্রমশঃ)

ন জাহু কামঃ কামানং উপতোপেব সামাতি । হবিষা কৃষ্ণবল্লভে ভুয় এবাতিবর্জিত ॥ (২)

মণিকল্পনারায়ণ শাস্ত্রী

(ব্যাকরণ তীর্থ, বেদ-স্মৃতি পুরাণদর্শনতত্ত্ব জ্যোতিষতত্ত্ব)

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

সেহেতু মন্থা ও জলচর প্রাণী সকল প্রভৃতি জলরাশির মধ্যে কিরণ করিয়াও উহাদের অন্তর তৃষ্ণাহীন হয় না । তেমন প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য তথা ভোগ বিলাস প্রাচুর্য্যতার মধ্যে জীবেরা থাকিয়াও আমরা পরিপূর্ণতার স্থান পাই না, পরন্তু আমরা এই পৃথিবীর সম্বন্ধেই মানুষ্যই স্বয়ং বাস্তবিকভাবে কষ্টবিক্ষিত হইয়া আত্ম বিজ্ঞানসার সম্মুখীন হই তখন দেখিতে পাই একটি ব্যক্তিও জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট নহি । প্রত্যেকেই মনে করি জীবনটা যেভাবে চলা উচিত ছিল তাহা হয় নাই । প্রত্যেকেই কোন না কোন দিক হইতে জীবনকে অসম্পূর্ণ মনে করি । তখনই যোগ হয় জীবনের মধ্যে কোথাও একটা অভাব রহিয়াছে । এই অভাব জনিত একটা অর্জুপ্ত বা আত্মসমীক্ষার মাধ্যমে ক্রমশঃ দান্য বাঁধিয়া উঠে । তখন কেহ বলে এই দশামান সমসারটা একটা থোকাবাঁধী । কেহ বলে তোমাদের এইসব ভোগেশ্বর্য্য বিলাস-প্রাচুর্য্য মূল্যহীন । কেহ বলে জীবনটাই একটা বাজে । কেহ বলে এই সংসার, জীবন, সৃষ্টি প্রকৃতি সমস্তটাই একটা বাজে ইহাদের কোনটারই কোন মূল্যবর্ত্তা নাই । সুতরাং ব্যক্তি হইবে যে প্রত্যেক মানুষ্যের মধ্যে প্রকল্পভাবে একটা মারফ-কাটি বা মূল্যায়ন যোগ রহিয়াছে । এই তৃপ্ত-অর্জুপ্ত মূল্যায়ন যোগ আপন আপন ক্রমে হইতে কামার দ্বারা অনুভূত হয় ? আহার ও পরমাচার পরম্পর বিজ্ঞানসার হইতে । আহার আত্মা অর্থাৎ পরমায়া ক্রমশঃ জাগ্রিত হইয়া আত্মাকে পূর্ণতার ইঙ্গিত করিতে থাকে । তখন পরমায়া ক্রমশঃ আকর্ষণ করিতে থাকে আত্মাভিকতার দিকে । যেমন নিরন্তর জোয়ার ভাটার খেলাখেলিয়া ব্রহ্মসমুদ্র আকর্ষণ করিতে থাকে সমস্ত নদীকে যেমন সমুদ্রেই অসংখ্য বৃষ্টি বৃষ্টি সৃষ্টি হইয়া পুনরায় মিলিয়া যায় অনন্ত জলরাশির প্রমাণি মধ্যে । তেমন আমরাও মহাশক্তি হইতে অসম্পূর্ণমায়া রূপে নিরন্তর বিচ্ছুরিত ও পৃষ্ঠ হইয়া হাসিয়া কানিয়া খেলিয়া আকর্ষণ হই এবং পুনরাবর্তিত হইয়া থাকি । এই ধর্ম্মিয়া ফিরিয়া আসা এবং হাসা, কানি, খেলা, প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টি হয় বিজ্ঞানিক । ইহাকেই বলে মার্য্যবাদ তাই মেল্প মূনি বলিয়াছিলেন, “ব্রহ্মায়া প্রভাবেন সংসার স্থিতি কারিন ।” গ্রীক বলিয়াছেন, “ক্রোমাং ভবতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিক্রমঃ...” ॥ সোহিনোহম্মিন যথা মেহে কোমারং যৌবনং জড়া ।” কিন্তু জড়বাদ ইহা স্বীকার করে না । সে বলে এই স্যামরিক হাসা কানি খেলাই প্রত্যক্ষ সত্য । ইহার পরবর্তী অপ্রত্যক্ষ সত্যের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ধানের প্রয়োজন নাই—অধ্যাত্মগত বলিবে তোমার হাসা কানি খেলা এবং তোমার তুমিই আপোঁ সত্য নয় । সুতরাং উহাদের প্রতি ও তুমিদের প্রতি ‘সত্য’ শব্দটি ব্যবহার করিতে পারনা । ভাবিয়া দেখ, তুমি কে ? তোমার প্রণব যে শূন্যত্বের জাহাকে কে শূন্যইয়েছে ? তোমার চক্ষু সে দোষিত্বের, তোমার ব্রহ্মা কি আকৃতি বিশিষ্ট চক্ষুর আরতন, অথবা চক্ষুরও চক্ষু ব্রহ্মায়েছে । মনে কর যদি এই মূহুর্ত্তে তোমার প্রণব শক্তি কথ হইয়া যায় তাহলে তোমার এই ব্রহ্ম মনে পড়িত জাহাকে কে শূন্যইয়েছে ? তোমার চক্ষু সে দোষিত্বের, তোমার ব্রহ্মা কি আকৃতি বিশিষ্ট চক্ষুর আরতন, অথবা চক্ষুরও চক্ষু ব্রহ্মায়েছে । মনে কর যদি এই মূহুর্ত্তে তোমার প্রণব শক্তি কথ হইয়া যায় তাহলে তোমার এই ব্রহ্ম মনে পড়িত জাহাকে কে শূন্যইয়েছে ? তোমার চক্ষু সে দোষিত্বের, তোমার ব্রহ্মা কি আকৃতি বিশিষ্ট চক্ষুর আরতন, অথবা চক্ষুরও চক্ষু ব্রহ্মায়েছে । মনে কর যদি এই মূহুর্ত্তে তোমার প্রণব শক্তি কথ হইয়া যায় তাহলে তোমার এই ব্রহ্ম মনে পড়িত জাহাকে কে শূন্যইয়েছে ? তোমার চক্ষু সে দোষিত্বের, তোমার ব্রহ্মা কি আকৃতি বিশিষ্ট চক্ষুর আরতন, অথবা চক্ষুরও চক্ষু ব্রহ্মায়েছে ।

ভাঙ্গা পা জোড়া ধাধান হইত। তুমি বশু বিদ্যার উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছ। সে তো অসম্ভবও করিয়াছিল। পরন্তু শূদ্রাচার্য অনেক আঁক শক্তিনন্দ্য হিলেন। সুতরাং তোমার কৃষ্ণ কোষায়? তুমি বহু মাসে সম্ভবিত একধাণা অস্থি প্রস্তুত করিতে পার না। তুমি নিম্প্রাণকে প্রাণ দান করিতে পার না। তোমরা বলিবে, পান, হুন্ সুপারির সংমিশ্রণে মৃৎ গোল হয়। তেমনি কতুর সংমিশ্রণে টুকরা রূপ আহার সৃষ্টি। তোমরা বলিবে “ন শ্বর্গোনাপশ্বর্গো নৈবাশ্ব্য পারলৌকিক।” আবার বল “ভগ্নমীভূতমা দেহস্য পুনরাগমনং কৃতং?” পরকণ্ঠেই বল “দেহেচ্ছোয়া এব মোক্ষ।” তোমার যদি পারলৌকিক বলিয়া কিছু না থাকে তবে মোক্ষের প্রশ্ন অসম্ভব। তাই মানুষের প্রাণি ক্রান্তি ও অতৃপ্তির গ্রামি দেখিয়া ভোগ-লালসার বিভবসে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া ঐশ্ব্য তাপসগণ চম্ভিকা উঠিয়াছিলেন। এবং ঐহিক সৃৎ লিপ্সা পরিভ্রাস করিয়া মৃৎ সুপাশ্ব্য বাপী বনাঙ্কুরালে বৃক মূলে গিরি কংবের গভীরতম সাথনার নিম্নয় হইয়াছেন। আজও হইতেছেন। আর সেই সাথনা লম্ব ফল অধ্যাত্মবাদ! যে আকর্ষণে গোত্রমবুদ রাজকৈশ্ব্য ভাগ করিয়াছিলেন যে আকর্ষণে গোত্রসেব সংসার ভাগ করিয়াছিলেন, যে আকর্ষণে বেবেকানন্দ উপাস্ত শ্বরে সমগ্র বিশ্ববাসীকে দেখাইলেন পরমেশ্বরের পথ। পৃথিবীকে শুনাইলেন শান্তির বাণী। “শৃংখলু বিশ্ব অমৃতদ্য পুরোঃ।” যে অমৃতের পূরণ। তোমাদের জন্য রক্তলোকের পথ, মৃত্তির পথ আবিষ্কার করিয়া আনিয়াছি সত্যের স্বাস্থ্যত সম্ভান। আনিয়াছি সুনিস্মল শান্তির বাণী। তোমরা কাত হও। শান্ত হও ভূপ্ত হও। প্রবৃত্তির তড়ানার নিয়ত তড়িত হইও না। আশ্ব সৃষ্টি কামনার অনলে দগ্ধ হইও না।

আত্মচেতনাবারা আত্মকে সবেত কর। নতুবা জড়বাদ তোমাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন। মর্গাচিকার মত সূক্তের আশার ধ্বংসের পথে ধাইতেছ। ঐ শোন হাইড্রোজেন বোমার শব্দ। ঐ দেখ নাইট্রোজেন বোমার বিভবসে পরিণাম। ধ্বংসের মূখে প্রায় আসিয়া পরিয়াছ। ফিরিয়া দাঁড়াও, সাথনা।

নিরত বিশ্ব বাসনার ষোড় প্রতিভার ফলে সৃষ্টি হয় প্রতিবন্দীতা। সৃষ্টি হয় উত্ততা অশান্তি। উত্তোজিত হয় ধর্ডারপ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মল, মাৎসর্ঘ্য। সমাজের শ্বাস্ত্র্য সৌন্দর্য। মানুষ পাপ কার্যে। লিপ্ত হয়, তাহার পূঃ আসে পরম্পর সম্বাত, বৃক ক্রিহ। মানবাত্মার ক্রমাবনতি ঘটিতে থাকে এবং তাহার শেষ পরিণতি ধ্বংস। সুতরাং ভাবিয়া দেখ। তখন নিজেই নিজের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। “কে শত্রুঃ সত্তি” “নিজেদ্বিমান।” আপনার লোভ মোহাদি ইন্দ্রিয়গুলিই আপন ধ্বংসের কারণ হয়। চাহিয়া দেখ যে ত্যাগশীলকর জন্য বাশু নিজে প্রাণ পশু দান করিয়া ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রেমের মণ্ড উচ্চারণ করিয়া আত্মত্যাগ করিলেন, তাহার সন্তানগণ আজ মানবাস্তের প্রাঙ্গণধারিতার সমুদ্যত। অবতারবাদকে বিতাড়িত করিয়া যে হজরত মহম্মদ, বিশৃংখল আরব জাতিতে একেশ্বর বান্দে, ঐক্যতার বাঁধন একীকৃত করিয়া আল্লার দরবারে আত্মসমর্পণ করিতে শিক্ষা দিলেন। সেই আল্লার সন্তানগণ আজ পরম্পর সম্বন্ধ, বহুধাবিভক্ত। যে বৃক একধীন রাজ একধ্ব্য ভাগ করিয়া, বাহাণের অধিসে মন্ডের দীক্ষা দিলেন, বাহায়া আজও মুখে বলে “বৃকঃ স্পর্ষণে গচ্ছামি” তাহারাই আজ ন্যাভিকতার প্রচারক। তাহারোও আজ প্রভুত্বের নেপাথ্য উন্মত্ত। অজ্ঞ দেখ দীনদারিত্রের ভারত, বহু ধর্মের আবাদস্থল ভারত। জটাবল্কলধারী, কুটির বাসী সাধুসন্তের দেশ ভারত আজও অধ্যাত্ম জ্ঞানে গরীয়ান, বহু দেবতার মন্দির ময়দান, আত্মিক সাধনে শক্তিমান। ভাবিয়া দেখ জৈনগণ্ডী ঐশ্বর্যগণ হাজার হাজার বসের উপপাঁড়িত হইয়াও সবেত। অসুর, তাতার, মোঙ্গল হারা অত্যাচারিত হইয়া সুদূর পারস্য হইতে সিংহভীর আসিয়াও নিজার পাথ নাই। শক, হুন, পাঠান, মোঙ্গল, বৃক্টানের অত্যাচারেও যে অধ্যাত্মবাসে ধ্বংস হয় নাই। সে অধ্যাত্মবাসের প্রকৃত অনুশীলন কর, বিস্রেকণ করিয়া দেখ কত গভীর তাহার স্মৃতি ভিত্তি মূল। ইহার স্মৃতি প্রসারি পিক্ত মানুষের মনো জগতের বহু গভীরে। রক্তে মাংসে, মজ্জার মিস্কা রহিয়াছে। তুমি জড়বাদের কব্লক পাড়া উল্টাইয়া মানব জগতের এই ধান ধারিয়া, এবং সাধু-সন্তদের

জটা কোপীন উপাটন করিবার চেষ্টা করিও না—ভুল করিবে। বরং অনুশীলন কর সৌখ্যেত পাইবে—তোমার জড়বাদের মূল উপাদানগুলিও এই অধ্যাক্ষবাদের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। ইহার সাহিত অঙ্গাসিক্যাবল্লভিত ১। অলৌকিক্য, ২। কৰ্ম'ভব, ৩। অবতার, ৪। মনুষ্য, ৫। মোক্ষ বা পূর্ণ' আনন্দ প্রথমতঃ ধরা বাক্ অলৌকিক্য।

অলৌকিক্য বলিতে আমরা কি বুঝি, ইহা একটি অপ্রত্যক্ষ শক্তি বিশেষ। ইহা প্রকার ভেদে কম বেশী সকল মানুষের মধ্যেই নিহিত আছে। কাৰ্য্য'কারণের মাধ্যমে বাহার মধ্যে ইহার ক্রিয়াকারিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তাহাকে আমরা এভনম্যাল (Abnormal) বলিয়া থাকি। স্বাভা—৭৮ বৎসর পূর্বে' রানিগান একটি মহিলা দেওরাল ঘাড়ের প্রতি তাকাইলে ঘাড়টির পেটুল্যাম বন্ধ হইয়া বাইত। বিজ্ঞানীগণ তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিল মহিলাটির মধ্যে এমন একটি শক্তি আছে বাহার ফলে ঐশ্বর্য হয়। ঐশ্বর্য অতিনিহিত শক্তিকে বাহারা প্রজ্ঞাঘারা এবং যোগসাধনাবারা উন্মুক্ত করিতে ও আরম্ভে রাখিতে পারেন—তাহারাই যোগী সাধক। যীশু আপন মস্তকে ক্রমকে বহন করিয়া তাহাতে বিত হইয়াও রক্ষাশূন্য অবস্থার বলিয়াছিলেন—“হে ইশ্বর ইহারা জানেনা ইহারা কি করিতেছে। ইহারা অজ্ঞান, তুমি ইহাদের ক্ষমা করিও।” নিত্যানন্দপ্রভু অত্যাচারিত হইয়া এবং কলসীর আঘাতে রক্তাপ্রসূ হইয়াও বলিয়াছিলেন—‘যাহা করিছাছ তাল করিরাছ তাহাতে দুঃখ নাই—তবুও একবার হরিবল।

হুসেনকে যখন সীমার অশ্রাব্যত করিতে উপাত হইল, তখন হুসেন বলেন এখানে আঘাত করিতে পারিবে না, কারণ এখানে অ'যায় রেহ চিহ্ন রহিয়াছে! সুতরাং তুমি একটু উঠিয়া দাঁড়াইলে আমি ব্যত হইয়া শূইব তখন পিছন দিক অশ্রাব্যত করিলে তোমার পক্ষে সহজ হইবে! এবং তোমার এইটুকু দ্বারা জনা তোমার যে অশ্রাব্যত' পাপ হইবে, তাহা বাহাতে না হয়, আমি আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। মহাত্মা গান্ধীর পুত্রে জবর পানী ভাঙার দ্বারা নিরাময় না হওয়ার তিনি ইশ্বরের স্মরণ করিয়া নিজেই সে ব্যবস্থা করিলেন। এবং পরকণ্ঠেই জবর নিরাময় হইল।

নোরাজখানীর দাবার হত্যাকাণ্ডের মধ্যে যখন তিনি উপস্থিত হইলেন, তখন সকলেই নিশ্চয় হইয়া গেল। অসংখ্য নরনারী যদি নজসাহীর মত সাধুসকলের আগ্রহে শান্তিলাভ করিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই কিছু অলৌকিক্য রহিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। অলৌকিক্য কি তাহা পুত্র কিম্বদন্তে আলোচিত হইবে।

—১০৫—

রূপ-সাধনায়

ত্রিভুবাথ বুঝোপাধায়

যত রেখা যত রঙ যত উপাদান,
তার সাথে আর আছে কান-মন-প্রাণ।
রূপারণ আশা ল'রে রূপারণ-কালে,
রূপ হ'তে রূপান্তরে খুঁজি রূপারণে।
দুটী চোখে পারে না যে ভূত'রূপী চাই,
তবে যদি রূপকারে সেই পথে পাই।
সুখ'লোক-দুঃখপথে প্রজ্ঞা-আলো আসি,
তিনমন ভ'রে দেহ দিবা রূপরাশি।

ভিন্নরূপে একাকার সেই রূপকার,
নিজ হাতে একে দেন এই রূপ তার।
সমান্বিত অনাহত রঙ ও রেখার,
অমৃতের আনন্দান রূপ-সাধনায়।
রূপসার শূন্যজ্যোতি সৰ্ব'রূপাধার,
সত্যশব্দ-সুন্দর মূর্ত রূপকার।
সাধনার হোমকুণ্ডে জ্যোতিস লিখার,
পূর্ণাহুতি সাধকের; সাধনার রস!

—১০৬—

উদাসী গৌরীনাথ

ঐমহামারাপুরী

ভারতবর্ষ বর্ষের ফেল চিরদিনই। তাই বৈদিক যুগ থেকে সুদূর ক'রে আজ অবধি অনুরণিত হচ্ছে আকাশে ব্যতাসে সেই এক ঈশ্বরের চিন্তা, ইচ্ছা, অনুভূতি। জমি ও জনগণ তারই সৃষ্টি, তাই মানুষকে তার চিন্তা করতেই হবে। আমাদের ভারতে তাই বিভিন্ন সম্প্রদায়, মঠ মিশন, আশ্রম গড়ে উঠেছে দিকে দিকে দেশে দেশে, উপনিষদে বর্ণিত ধর্মনিষ্ঠ হারিয়ে যে বাণী "একং সর্বাশ্রয়া কুত্বা কলিত" "ঈশ্বর এক ও অনন্ত কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহা বিভিন্ন প্রকারে ক'না করিয়া থাকেন।" মত এক পথ পৃথক পৃথক, কিন্তু সকলেই সেই এক ঈশ্বরের উপাসনা করছে। গান্ধীগন্ধর লালার এটা সহজ ভাবেই খ্রীষ্টীকৃত ব্রাহ্মকল্মষ ব'কিয়ে নিরুদ্বেগ। আমাদের ঠাকুর খ্রীষ্টীকৃত সত্যানন্দসেবক ছিলেন জ্ঞানের দায়র এবং ভাগ্যের প্রতীক, তাঁকে কেন্দ্র করেই আমাদের জীবন গড়ে উঠেছে। তাই জড়িতের কিছু কিছু স্বাধীন প্রকাশিত হয় অনুমানের মধ্যে, আজ থেকে প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার ছোট্ট একটা ঘটনা মনে পড়ে। শিবপূজা করা এবং শিবরাত্রির রত উপবাস করা ঘাটি মাগা, প্রহর প্রহর পূজা করা এগুলি বাংলাদেশে শুধা সমগ্র ভারতবর্ষে চিরায়ত প্রথা। বিশেষ করে বাঙ্গালী মাসের মনে এটা সৎকায়্যাত অভ্যাস। উত্তর প্রদেশে বিভিন্ন সাহ-সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং স্বামী শিবকানন্দ প্রতিষ্ঠিত মঠ মিশনে শিবরাত্রির রত উপবাস পূজা পালন হোতো আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতি বছর, স্বামীজীরা 'হর হর যোম যোম জর শিবলক্ষ্য' শব্দে মথুরিত করে তুলতেন সারা রাত্রি। ছোটবেলা থেকেই তাঁদের জীবন, স্বাধীনতা পড়ে শিবরাত্রির রত পালন করার ইচ্ছা হোতো মনে। আমাদের সমস্ত কিছুই তা খ্রীষ্টীকৃত কেন্দ্র করে। সুতরাং তাঁর আদেশ ছাড়া কিছু করার জো নেই। একদিন শিবরাত্রি করা প্রসঙ্গে তখন সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম, শিবরাত্রির রত উপবাস করার কথা সেদিন আমি তাঁকে জানালাম। কিন্তু এবেগে সেখান থেকেই ইচ্ছা নেই, বরং তিন চারদিন ধরে রস হাসির জলে একটু বিপরীত কথাই বললেন। করেকদিন ধরেই একটু রস হাসিই দেখি তাঁর কথা ব্যক্তিগত মনে, কেন একটু বিপরীত চিন্তাবারা। সুতরাং তাঁর অনিচ্ছা বুকে আমি আর কিছু বললাম না তাঁকে। কিন্তু মাকে মাকে মনে হোতো, বাইহোক, কিছুদিনের মধ্যেই শিবরাত্রির দিনটী এলো সামনে, আমি সেদিন কোনো কিছু উল্লেখ না ক'রে সামান্য কিছু ফুল বেগপাতা একটা কমপ্লক্সে তীর্থবারি দ্বা নিয়ে খ্রীষ্টীকৃতের মনের সমস্ত উপস্থিত ছিলাম। একটু প্রসন্ন হাসি সেখান থেকে গ্রীষ্মে। এইটুকুই ইঙ্গিত বা নিশ্চেষ্ট আমার প্রতি তাঁর। মনে হওয়ায় সবে সবেই ও' নমঃ শিবায় নমঃ। সত্যানন্দসেবক নমঃ হলেন তিনবার কমপ্লক্সের জল আর তিনবার ফুল বেগপাতা দিয়ে তাঁকে পূজা করলাম। পূজা নেওয়ার সময় কেমন যেন তাঁকে একটু উদাসীন মনে হোলো। একটু আবেশিত তন্দ্র। দৃষ্টি আঁকহোলা। পূজার পর প্রশ্নাম করলাম। তিনি দ্বা হাতে হাতে বললেন, "কুমারী গোত্রের মধ্যে তিনিই আবির্ভূত হন, নিজেকে জানবে মা ভনতারিণীর অংশ, কই জিব বের কর দেখ।" তিনি যা বললেন তাই করলাম। এরপর তার গ্রীষ্মের একটু জল হাতে নিয়ে আমার মাথার দিলেন। মনে হল পূজা সার্থক হোলো তাঁরই কৃপায়। এইটুকুই হরতো তিনি চেয়েছিলেন আমার কাছে। আমার দ্বাতে দেয়ী দেয়ীছলো। এটা আরও আগে হরতো করতে হতো। বরন জো তখন আমার বেশী নয়, বারশা শক্তি কমই ছিলো। বাইহোক, আমি প্রশ্নাম ক'রে চলে আসছি, তখন আমার বাড়ি করিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "একো ভাবি বিশেষতঃ" আমার প্রশ্নাম ক'রে গাড়ির ইলায়, যদি আর কিছু বলেন, কিন্তু না। এরপর আমি চলে এলাম বাইরে। আর তারপর মন্দিরে ছোট্ট দিলার্মতি শিবপূজার কেদুলি নিতা পূজা হয়, সেটুকুতে পূজা করলাম। কিন্তু রতউপবাস

করা কবা আর মনে হয় নাই। তাঁর একটি বাণীর কথা মনে হোতো মাকে মাঝে, বলিছিলেন পুত্রা নেওয়ার পর "একোভাতি বিশবাতো" ! একেবে এ বাণীটার অর্থই বা কি ? পুত্র্যপন্ন সাময়িকই বা কি ? কিছুকাল চিন্তা করার পর মনে হোলো, ঠিকই তো ! গুরুদেবের মতোই তো সমস্ত কিছু বিরাজমান। স্ত্রী, কিছু, মহেশ্বর ! এবং বিশ্বাসই মূল কথা। তাঁর এই প্রসঙ্গটাই প্রার্থনা করি চিরদিন।

—৪০৫—

বুদ্ধপূর্ণিমা

স্বামী শিবানন্দ

বৈশাখী পূর্ণিমা বুদ্ধপূর্ণিমা। বৈশাখীপূর্ণিমা কথাটি শুনলে মানসপটে ভেসে আসে এক মহান স্মৃতি। কার ? ভগবান বুদ্ধের। কেন ? অপার্থিব করুণা মৈত্রী আর অপর্যবৃত্তার দেবতা যে তিনি। আজকার এই পূর্ণা তিথিতে নিবেদন করি অম্বরের শ্রদ্ধাজল।

স্বামীজির ভাব্য বুদ্ধপূর্ণিবার শ্রেষ্ঠ অবতার। তিনি কাহারও নিন্দা করেন নাই, নিজের জন্য কিছু দাবি করেন নাই। নিজেদের চেতনাই আনন্দময়ক মুক্তিলাভ করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। মৃত্যু শয্যায় তিনি বলিয়াছিলেন, আমি বা অপর কেহই তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না। কাহারও উপর নির্ভর করিও না। নিজের মুক্তি নিজেই সম্পাদন কর।

তিনি ছিলেন এমন একজন মহাপুরুষ, বাহার মনে কখনও একটি মাত্র চিন্তাও উঠে নাই বা বাহার দ্বারা একটি মাত্র কাজও সাধিত হয় নাই, বাহা মানুষের হিতসাধন ব্যতীত অপর কোন উদ্দেশ্যে চালিত। তাঁহার মেধা এবং হৃদয় উভয়ই ছিল বিরাট—তিনি সমুদয় মানবজাতি এবং প্রাণিসৃষ্টিক প্রেম আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং কি উচ্চতম দেবদূত, কি নিম্নতম কীটটির জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন।

জগতের আচার্যগণের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই কার্যে কোনরূপ বাহিরের অভিসন্ধি ছিল না। অন্যান্য মহাপুরুষকাল সকলেই নির্জানকৈ ঈশ্বরবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, আর ইহাও বলিয়া গিয়াছেন, আমাদের বাহ্যের বিশ্বাস কাঁপবে, তাহারো সংশয় ঘাইবে, কিন্তু ভগবান বুদ্ধ শেখানুশাসনের সহিত কি বলিয়াছিলেন ? তিনি বলিয়াছিলেন, কেহই তোমাকে মূঢ় হইতে সাহায্য করিতে পারে না, নিজের সাহায্য নিজে কর, নিজের চেতনা দ্বারা নিজের মুক্তি সাধন কর। নিজের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ আকাশের ন্যায় অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন। আমি গোত্র, সেই অবস্থা লাভ করিয়াছি। তোমরাও যদি উহার জন্য প্রাণপ্রণে চেষ্টা কর, তোমরাও উহা লাভ করিবে। তিনি সর্বাধিক কামনা ও অভিসন্ধি বর্জিত ছিলেন, সুতরাং তিনি মরণগমনের বা ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। তিনি রাজসিংহাসনের আশা ও সর্ববিধ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভাগবতের পথে পথে ভ্রমণ করিয়া তিষ্ঠাব্রতী দ্বারা উন্নত পুরুষ করিতেন এবং সমুদ্রের মতো বিশাল হৃদয় লইয়া নরনারী ও অন্যান্য জীবজন্তুর কল্যাণ সাধাতে হয়, তাহাই প্রচার করিতেন।

জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র মহাপুরুষ, যিনি যজ্ঞ পদুহত্যা নিষেধের উদ্দেশ্যে পশুগণের পরিবর্তে নিজ জীবন বিসর্জনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি একবার জনৈক রাজাকে বলিয়াছিলেন, 'যদি যজ্ঞ ছাদিশিষ্ট হত্যা করিলে আপনায় মরণ' গমনের সহায়তা হয়, তবে নরহত্যা করিলে তাহাতে তো আরও অধিক উপকার হইবে, অতএব যজ্ঞহলে আমার বধ করুন। রাজা এই কথা শুনিলে বিস্মিত হইয়াছিলেন।

তিনি কর্মবোধের আদর্শ, আর তিনি যে উচ্চাবস্থার আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বেশ বুঝা যায়, কর্মধারা অমর্যাদা আধ্যাত্মিকতার চরমশিখরে আরোহণ করিতে পারি।

স্বাধীজি বলছেন, অন্য সব চরিত্রের চেয়ে এই মহাপুরুষের চরিত্রের প্রতি আমার প্রভা অধিক। আহা, সেই সাহসিকতা, সেই নিভীকতা, সেই গভীর প্রেম! মানুষের কল্যাণের জন্যই তাঁর জন্ম। সবাই নিজের জন্য ইশ্বরকে খুঁজছে, কত লোকই সত্যানুসন্ধান করছে; তিনি কিন্তু নিজের জন্য সত্যলভের চেষ্টা করেন নি। তিনি সত্যের সন্ধান করেছেন মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে। কেমন করে মানুষকে সাহায্য করবেন, এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। সারাজীবন তিনি কখনও নিজের ভাবনা ভাবেন নি। এতবড় মহৎ জীবনের ধারণা স্বার্থান্ধ সংস্কৃতিতে মানুষ করতে পারে না।

আশ্চর্য্য তাঁর বুদ্ধি। কোন রকম ভাবাবেগ নাই। সেই বিশাল মস্তিষ্কে কুমল্কারের লেশ ছিল না। প্রাচীন পুথিতে লেখা আছে, পিতৃশত্রুঘণের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গেছে, অথবা বন্দুরা বিশ্বাস করতে বলছে—এই সব কার্য্যেই বিশ্বাস করো না; তুমি নিজেই কিছর করে দেখ, নিজেই সত্যানুসন্ধান কর, নিজেই অনুভব কর। তারপর যদি তুমি তা অন্যের পক্ষে বা বহুর পক্ষে কল্যাণপ্রদ মনে কর, তখন তা মানুষের মধ্যে বিতরণ কর। কোমলমস্তিষ্ক কণীকর্ত্ত দৃষ্টিগত কাপুরুষেরা কখনও সত্যকে জানতে পারে না। আকাশের মত উদার ও মূর্ত্ত হওয়া চাই। চিত্ত হবে নির্মল স্ফুট, তবুই তাতে সত্য প্রতিভাত হবে। যুক্তির সেই অবস্থা—যাকে তিনি নির্বাণ বলতেন, তা লাভ করবার জন্য প্রত্যেককেই আহ্বান করেছিলেন। একদিন সে অবস্থায় সকলেই উপনীত হবে, এবং সেই নির্বাণে উপনীত হওয়াই হচ্ছে মনুষ্য জীবনের চরম সার্থকতা।

তাঁর সমস্ত উপদেশাবলীর মধ্যে মানব-মৈত্রী অন্যতম। মানুষ সকলেই সমান, বিশেষ অধিকার কারও নেই। বুদ্ধ ছিলেন সাম্যের আচার্য্য। প্রত্যেক নর-নারীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনে সমান অধিকার—এইছিল তাঁর শিক্ষা। তাঁর সমস্ত নিকৃষ্টমস্ত ব্যক্তিও উচ্চতম আধ্যাত্মিক রাজ্যের বোণা হতে পেরেছিলেন।

ভগবান বুদ্ধদেবের ধর্ম্মসংস্থাপনে যিনি মূলশক্তি, সেই যশোমরা এবং ধর্ম্ম সম্প্রসারণের যিনি মূল কারণ—সেই সন্ন্যাস জশোকে সস্বত্বে দু'টি একটী কথা উচ্চারণ করে আজকের এই পৃথ্বে তর্জিত তঁাদের প্রতি অমর্য্যের প্রজ্ঞাশক্তি নিবেদন করব। বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম প্রসারণে সব জেতে মহত্তম স্বার্থত্যাগ যিনি বরণ করে ছিলেন, তিনি হলেন জননী যশোমরা গোপা। তিনি তাঁর সর্বস্ব নিধি অর্থাৎ একমাত্র পুত্রকে ছেড়ে দিয়েছিলেন জগৎজনের হিতের নিমিত্ত—“কহু জন সুখার বহু জন হিংসার।” তাহাইই নিশ্চেষ্টে পুত্র রাহুল তাঁর পিতৃদেব বুদ্ধদেবের উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর নিকট হাতে চতুস্তম সত্য ও অমৃত্যু মার্গ শিক্ষা নেন এবং সর্বোত্তম অবস্থা লাভের নিমিত্ত বুদ্ধপরিচর্য্য ভিক্ষুদের সম্বন্ধে অকুণ্ঠ হন। জননী যশোমরার বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ হলো। এমনি ধর্ম্মের মৃত প্রতীক ছিলেন জননী যশোমরা। তাঁর মহিমময় ব্যক্তিগত জীবনের একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন মহাকবি নবীনচন্দ্র তাঁর অমিতাভে—

“হনে হনে কিবা কঠোর সম্মাস সাধিবন মম স্বামী।

কিলাস ভবেন এই বোধিলে সাধিব সম্মাস আমি ॥

তিনি নাশাক্ত তঁহার সম্মাস উদ্ধার করিতে নহে।

আমি ক্ষুদ্র নারী আমার সম্মাস তঁহার চরণ তরে” ॥

বুদ্ধদেব বুদ্ধজ্ঞাত করার পর শ্রীমতী রাজ্যো কপিলাবন্দুতে এসেছেন ঘিরে। নৃপতি শূদ্ধোদন, মণ্ডিকর্ণ ও রাজপরিবারের সকলেই প্রভুত সম্মানের সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন, এলেন না কেবল সম্পূর্ণা যশোমরা। তখন নৃপতি বলেন,—সত্য বল হতো সিদ্ধার্থ করেছেন গৃহত্যাগ। সিদ্ধার্থের স্তম্ভ মৃৎভনের সংবাদ পেয়ে তিনিও শ্রীমতী স্তম্ভ মৃৎভন করলেন, সিদ্ধার্থ সুস্মিৎ প্রব্রা ও অলংকারাদি পরিচর্যাগ করেছেন শুনে তিনিও করলেন ঐ সমস্ত বর্ণন। স্বামীর ন্যায় তিনিও

সামান্য মন্দের পাশে করেছেন আহোর। সিদ্ধার্থের মত তিনিও উত্তম বংশোদ্ভূত আসন করেছেন পরিহার এবং অপরাপর ব্রাহ্মণের তাঁর পাণিপ্রার্থী হলে তিনি বলেছেন,—তিনি সিদ্ধার্থের। প্রচান্দ্রভীতে বুদ্ধদেব তখন জননী যশোধরার সঙ্গে মদুর বাক্যলাপে রত হন। কথোপকথনকালে যশোধরা পূর্ব পূর্ব জন্মের কত পুণ্য কথাই বলেন। আর বুদ্ধদেব জানলেন—কে এ যশোধরা—তাঁর জন্মজন্মান্তরের সমস্ত পুণ্য, সমস্ত শক্তির মৌলিক আধার।

আর আজকের দুর্দিনার সব পার্শ্বিক অভ্যাসের বিরুদ্ধে প্রতি ঘরে ঘরে জননীদের তপস্যার আগুনে জ্বলে পুড়ে যেতে হবে, নিজের স্বরূপ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তবেই তাঁদের পৃথক সমাজের সমস্ত স্বকম অপমান, অভ্যাস, অনাচার, ব্যক্তিচারের বিরুদ্ধে রূপে দাঁড়ান সম্ভব হবে আর তাঁদের সমস্যার সমাধানও সম্ভব হবেন ইহাছাড়া 'নানাংগাং বিদ্যাতে অরন্যম'।

সন্ন্যাস অশোক বৌদ্ধধর্মের সমস্ত পৃথিবীতে প্রচার করেছিলেন। তিনি তাঁর পার্শ্বপ্রায় পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সম্মিহত্রাকে সিংহলে যশ্বপ্রচারের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। এই মহা স্মার্ত্ত্যাম-নিষ্মার্ত্ত্যপরতাই ভগবান-স্বামীজির ভাষায়।

আজিকার এই পৃথিবীতে দূরত্ব হিসেবে জন্মজন্মের পৃথিবীর মানবের কাছে শুনাই ভগবান বুদ্ধের বিধবাপাণী চিরজাগ্রত করবার ও মৈত্রীর বাণী—

“মাতা যথা নিবং পুত্রং আত্মস্মা একপুত্রমনুরূপে
এবমপি সম্বজ্জতেবু মানসংভাবুরে অপরিমাণং
ক্ষেত্রে সম্বলোকস্মিয়োনসং ভাবুরে অপরিমাণং
উত্তরং অথো চ তিরিহুতং অসংবাধং অবেরমসপপত্তং ।
তিট্টেত্তরং নিসিহো বা সন্না নো বা যাবত্-সস কৈতমিহো
এতং সতিং অতিট্টেত্তরং ব্রহ্মমত্তং বিহারেমিহমাহু ॥

অর্থাৎ মা যেমন প্রাণ দিয়েও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, তেমন সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমায় দয়াভাব উপাধন করতে হবে। উত্তর, অর্থোদিকে বা চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমায় দয়াভাব জন্মায়তে হবে। দাঁড়াতে, চলতে, কনতে, শরনের সময়—যতকণ না নিদ্রা আসবে, ততকাল এই মৈত্রীভাবে অর্ধাধিত থাকতে হবে—তাকেই বলে ব্রহ্মবিহার। [প্রাচ্যবাণী গবেষণা গ্রন্থমালা]

শেবে, মহাকবি অম্বোধরের ভাষায়, ভগবান বুদ্ধদেবের চরণে প্রণাম জানাই।—

ভিন্নং পদাখ্যং বিমবৎ বিদাত্তজ্জ

অমো নিরসামভিভূতভানুভু ।

সুখমিদাখং জিত চারুচন্দ্রমা

সংযোজিতহহন ইহ হন্ত নোপমা ॥

অর্থাৎ যিনি পদে সম্পদ লাভ করে বিধাতাকে করেছেন জয়, সযোজের অজ্ঞানোৎকার দূর করে যিনি সুখকে করেছেন পরাজিত, লোকের শোক সন্তাপ নিবারণ করে যিনি মনোহর চন্দ্রমাকে অতিক্রম করেছেন, কল্লুত জগতে যার উপমা নেই, সেই বুদ্ধকে কখনা করি। [প্রাচ্যবাণী গবেষণা গ্রন্থমালা]

পুরাতন ভাবমূখে ঐসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

ভাবমূখে পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হয় ১৮৫০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে। প্রথম বর্ষে ১৮৫০ অংশ কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর বেশ কিছুদিন পত্রিকাটির প্রকাশন বন্ধ ছিল। শ্রদ্ধা হাপানো কামরুজের নৃপপাণ্ডার জন্য নয়, সে সময়ে ১৮৫০-৫৬ বর্ষে বীরভূমে ও দেশের অন্যত্র অশান্তি। রোগব্যাদির প্রকোপ এবং নানাবিধ অশান্তির কারণে স্বাভাবিক কাজকর্ম বাহত হয়। আশ্রমকর্মীদের অনেককে সে সময় গ্রামমূলক কাজে বিশেষভাবে বাধ্য থাকতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় বর্ষ থেকে ভাবমূখে পত্রিকা অদ্যাবধি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। হরত দেবেন্দ্রা গ্রীষ্মমকুল আশ্রমকর্তৃপক্ষ কিস্তি ১০৫৫ অংশ থেকে ২৫ বৎসর গণনা পূর্বক ১০৭৯ অংশ ভাবমূখের রক্তজলজ্ঞা পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঐ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থটি গ্রন্থনার দিক দিয়ে অনবদ্য। পুরোনো দিনের বহু কথা ও তথ্যাবলী এটিতে চমৎকারভাবে সন্নিবেশিত। এক কথায় এটি ভাবমূখে পত্রিকার প্রথম পঁচিশ বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

দ্বিতীয় বর্ষের প্রাচীন সংখ্যাটি একাধিক কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথমত নতুন উদ্যমে নবভাবে নির্মিত প্রকাশনের ন্যূনা এই মাস হইতেই। দ্বিতীয়ত, এই মাসের শেষের দিকে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা লাভ করে। কিছুটা কাকপ্রাণীরকং হলও বলা চলে, ভাবমূখের ও স্বাধীন ভারতের বরজ্ঞা প্রায় সমান মনান।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর, জাতি ও সমাজের উপযুক্ত বিকাশসাধনের জন্য দেশবাসীর কোন পথে অগ্রসর হওয়া উচিত এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা সে সময় অনেকের মনকে আন্দোলিত করেছিল। কর্মসূত্রে সমাজহিতৈষণা ভারতবর্ষে কোনো নতুন কথা নয়। বহুজনের সুখসমৃদ্ধি ও হিতসাধনের নিমিত্ত ধর্মীয় অনুশাসনাদি সেই বৈদিক যুগ হতেই এগুনে সমুদায়িত। তথাপি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর, নব ভারতবর্ষ গঠনের প্রাকালে সে সব কথা নতুন ভাবে স্মরণ করার অবকাশ যেন পুনরায় ঘটেছিল।

সমরোচিত চিন্তার প্রতিফলন স্বরূপ 'স্বাধীন ভারতে ধর্মের স্থান' এই শিরোনামে একটি তালিকা'পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ভাবমূখের দ্বিতীয় বর্ষ শারদীয়া সংখ্যায়। প্রবন্ধকার ছিলেন স্বনামধন্য ডক্টর শ্রীকুমার কল্যাপাধ্যায়। বীরভূমের কৃতী সন্তান ডাঃ বন্যোপাধ্যায়ের গ্রীষ্মমকুল আশ্রমের অনুসরণী ছিলেন এবং আশ্রমের অন্যতম প্রবীণ সম্মানী প্রভাত সেবানন্দ মহারাজের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা সম্পর্কও ছিল। প্রায় ৩৭ বৎসর পূর্বে রচিত তাঁর সেই প্রবন্ধটি আজও যেন যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক।

তিনি লিখেছিলেন, "স্বাধীনতা লাভের পর যে সমস্যা সম্মুখপেকা চিন্তার উদ্রেক করে, তাহা আমাদের ভবিষ্যৎ পুনর্গঠন ও আদর্শ সংস্থায়। পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া আমরা আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রা কিভাবে পরিচালিত করিব এ সম্বন্ধে আমাদের স্থির চিন্তার প্রয়োজন। শাসনতন্ত্র রচনা মোটামুটি বহিরসমূলক ব্যাপার। ইহাতে পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের বিধিব্যবস্থা নির্দিষ্ট করে মাত্র। কিন্তু শাসনতন্ত্রের দ্বারা জাতির আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সত্তাকে পুষ্ট করা যায় না।

"এই সম্বন্ধে সম্মুখপেকা গুরুত্ব প্রাপ্ত হইতেছে স্বাধীন ভারতে ধর্মের কি রূপ হইবে? যে ভারতে একসা অধ্যাত্ম অনুভূতির উৎসর্গে ভগতে শীর্ণস্থান অধিকার করিয়াছিল ও এই ধর্মভাব নিম্ন সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে সার্বকভাবে কার্যকরী করিয়াছিল, আজ স্বাধীনতা লাভের পর সেই ধর্ম সম্বন্ধে তাহার মনোভাব কি হইবে? আজকাল secular state বা ধর্মভাববিবর্জিত রাষ্ট্রব্যবস্থার অবস্থা প্রয়োজনীয়তার কথা রাজনীতি শাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া ধরিয়া

লগ্না হয়। ধর্ম্মবোধের আভিলাষে ভারতবর্ষে যে সম্প্রদায়িক হত্যার ৭৬৩৩৩৩৩ ঘটনা গেল, তাহাতে রাজনীতি হইতে ধর্ম্মের সম্পূর্ণ নিষাদসনের ঘোষণা আপাতদৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যে ধর্ম্ম বিপর্যয় ঘটিয়াছে তাহা ধর্ম্মের স্বমহাশয় সম্প্রদায়গত অধিকার প্রতিষ্ঠার নিদর্শনোচ্চ লক্ষ্যতা মাত্র, প্রকৃত ধর্ম্মিকতার সঙ্গে ইহার কোনো মাত্রা নাই।

“ধর্ম্মের দুইটা দিক আছে—একটি সাম্প্রদায়িক আদর্শ, অপরটি আচার অনুষ্ঠানের ধারাবাহিক নিয়ম। প্রথম দিক দ্বারা বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে বিশেষ কোনো আদর্শগত প্রভেদ নাই; দ্বিতীয় দিকে মননগত সত্যোপলব্ধি তীর্থ হইয়া ভেদ ও বিরোধের সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ধর্ম্মের সহনশীলতার আদর্শ এরূপভাবে অনুশীলিত হইয়াছিল, বাহ্যতে বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে সংঘর্ষের কোনো কারণ উপস্থিত না হয়। এমন যদি এই আদর্শ হইতে বিচ্যুতি ঘটনা থাকে তাহার কারণ প্রথমতঃ ধর্ম্মবোধের দুর্বলতা ও বিকার। দ্বিতীয়তঃ পরমত-অসহিবুদ্ধি ধর্ম্মমতের অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা।

“কাজেই রাজনীতি হইতে ধর্ম্মকে বাদ দেওয়ার যৌক্তিকতা নতুন কর্তারা বিচার করিতে হইবে। ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক আদর্শের যদি রাজনীতিতে কোনো স্থান না থাকে, তবে জীবনের একটি যৌক্তিক প্রেক্ষাপট ব্যক্তিগত জীবনে আবদ্ধ করিয়া ইহার সামাজিক কল্যাণ শাণ্ডি পূর্ণ ক্ষয়ব্রণের পথ অবরুদ্ধ করা হয়। রাষ্ট্রের আদর্শ ও ধর্ম্মগত যদি ধর্ম্মবোধের দ্বারা নিরাসিত না হয় তবে পশ্চিম প্রদেশেই ধর্ম্মের ধর্ম্ম ইহার একমাত্র নিয়মক শক্তি হইয়া উঠে। ইউরোপের বিশদ দুইটা মহাদেশ ধর্ম্মের আদর্শপ্রভাববহীন রাষ্ট্রনীতির ভয়াবহ পরিণতিতে জলজ নিদান।

“এই ধর্ম্মের অভাব আর কিছুতেই পূরণ করিতে পারে না। শিক্ষাসংস্কৃতি, জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি, শান্তি ও বিশ্বকল্যাণের কার্যনা। বহু শতাব্দীর অনুশীলিত নীতিবোধ ও মার্গিত হুচি, কিংবা ইতিহাস ও কৃত্তব্যবোধের প্রলম্ব-প্রবন্ধকে রোধ করিতে পারে না। সেইজন্য ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত সাধনার ক্ষেত্রে হইতে প্রসারিত করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের কেশমুলে প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আবার নতুন কর্তারা চিন্তা করা করকার।... ..”

প্রবোধ উপদেষ্টার জ্ঞানসম্পাদনার লিখিতলেন, “স্বাধীনতার রামকৃষ্ণ এই জগৎবাসের যুগেও অধ্যাত্মিকতার প্রভাব নিজে ও ভবনধর্ম্মের জীবনে প্রমাণিত করিয়াছেন। আজ অনেক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় শান্তি ও অজয়ের বাণী লইয়া এই অকস্মিত সমাজকে আকর্ষণিতে উদ্বুদ্ধ ও অধ্যাত্মসাধনার দীক্ষিত করিতেছেন। এমন রাষ্ট্রশাস্ত্রের পূর্ণ সহযোগিতা পাইলে এই সন্ন্যাসী দ্বারা আরও ব্যাপকভাবে সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করিতে পারে।”

ভক্তির কল্যাণসাধনার ভাষা সমন্বয়কল্পী অঙ্গিত ভারতবাসীর সেই প্রত্যাশা কতোখানি পূরিত হয়েছে অর্থাৎ রাষ্ট্রশাস্ত্রের সহায়তার ধর্ম্মক্ষেত্রে কতোটুকু বিস্তারলাভ করেছে, সে বিচার স্বতন্ত্র। তবে একথা নিশ্চয়ই কল্যাণ, নীতিনিষ্ঠ সমাজ রচনার বা রাষ্ট্রনীতি নিরূপণে প্রকৃত ধর্ম্মবোধের অকুণ্ঠ প্রাধান্য আজও যেমন পরিচালিত হয় না। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মমতের নৈতিক প্রকাশে রাজনৈতিক সত্যোচ্চ, অন্যদিকে ধর্ম্মবিশ্বাসের অপব্যবহারে রাজনৈতিক চাতুরী যেন ভারতবর্ষকে উত্তম উৎপাদিত করেছে—যার ফলে জাতীয় সংঘর্ষে বহুল পরিমাণে বিঘ্নিত।

ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে বহুবিধ ধর্ম্মমত প্রচলিত, আচার অনুষ্ঠানে বিভিন্নতা বিদ্যমান সেখানে ধর্ম্মবোধের স্বলগ্নত ঐক্যের কথা বিশেষভাবে ভুলে ধরা উচিত—স্বয়ং অজ্ঞ নর, প্রাত্যহিক জীবনের ব্যস্তত। এ বিষয়ে রাষ্ট্রশাস্ত্র সহায়ক হলে ভালই হয়। অন্যথায় সেই গাণ্ডি পালনের অনেকখানি এসে পড়ে ক্ষেত্রান্তরী সন্দেহসমূহের উপর।

সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের দেশে সম্প্রদায়িকবিঘ্নিত ও উদার ধর্ম্মক্ষেত্রের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে দিয়েছেন স্বাধীনতার গ্রীষ্মকল্যাণ। এক সর্বজনীন ভিত্তিতে ধর্ম্মকে সংস্থাপিত করে দেবেন তিনি। তাঁর অমৃত্যুর বাণী সেই বাণী বহন করে। পূজাপাদ স্বামী বিবেকানন্দ, ভবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী রামকৃষ্ণসম্মানন, বেশিখানেক বিদ্যাবিত ব্রহ্মচর্য সম্প্রদায়-

জীবন স্বর্গভূতের সাক্ষাৎকার। অন্তঃকরণে শ্রীরামকৃষ্ণভাবপ্রবর্তা শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ বহুভাবে, ভাবমুখে ও সঙ্গীতে ধ্বনিত করেছেন সমস্বরের মন্ত্র, স্বর্গস্বর্গের সঙ্গীত।

ভাবমুখে পত্রিকার তিনি নিরমিতভাবে জীবন্তেন এবং অপরকে দিয়ে লেখাতেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় উজ্জ্বল হয়ে অনেক লেখক লেখিকা এগিয়ে এসেছেন আপন আপন রচনাসম্ভার নিয়ে। বেগুনি এলাদকে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণভাবে সমকুলে তেমনি অনাদিকে স্বর্গজীবন ও সমাজজীবনের মধ্যে সংহতি সাধনে সহায়ক। ভাবমুখের পুরাতন পৃষ্ঠা থেকে অীন্তত সেইসব বিদ্যর ক্রমশঃ আলোচ্য।

—৩০—

অমরলোকে ননীগোপাল চক্রবর্তী

সম্মানিত শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান আমাদের হৃদয়ের গুরুভাই শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী গত ২৪শে এপ্রিল ককট রোগে আক্রান্ত হয়ে সংখ্যা ৬-৪০ মিনিটে বালীগঞ্জস্থিত নিজ বাড়ীতে শ্রীসত্যানন্দলোককে প্রয়াণ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি ছিলেন একান্ত স্বাধীনচেতা ও গুরুগড়প্রাণ। কর্মজগতে তিনি ভারতের একজন আত্মজাতিক ধ্যানিত সম্পন্ন ইন্দ্রিয় বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং 'টেলকো', 'ইউনিজো', আই আই এফ প্রভৃতি বহু প্রখ্যাত সংস্থাত দায়িত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কর্মব্যস্তদশে ও ইউনেসকোর সদস্য হিসাবে পৃথিবীর সম্ভ্রম তিনি প্রমদ করে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্জন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সত্যানন্দ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নানাস্থানে দানদান করেন। শ্রীশ্রীদেবদেবের দিব্যস্মৃতি স্মরণ্যাই তাঁহার চিত্তে জাগরুক থাকত। জীবনের শেষদিকে তাঁকে প্রায়শই জপমন্ত্র হয়ে থাকতে দেখা যেত। তাঁহার পুণ্য নিবাস অত্বে বাংলাদেশের রংপুরের অজ্ঞাত বাসুদেবপুর গ্রামে। তিনি স্ত্রী, দুইপুত্র এবং চারকন্যা রেখে গেছেন। তাঁর অমরাভা শ্রীশ্রীদেবদেব অনন্ত শান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

आश्रय संवाद

श्रीश्रीरामकृष्ण आश्रय, गुरुपुर ।

गत १९ १०ई मार्च १९८८ गुरुपुर (बिहार) श्रीश्रीरामकृष्ण आश्रय भवन श्रीश्रीरामकृष्णदेव १८९ उम आविर्भावोत्सव पालित है। ए उपलक्ष्य भवन श्रीश्रीरामकृष्णदेव, श्रीश्री, श्रीश्रीसदानन्ददेव, स्वामी अठेमानन्द महाराज, श्रीश्रीचतुर्विणीयार विशेष पूजा, होम, आराधक, ८७डीपाठ प्रवृत्ति अन्वित है। अर्गात छत्र, अन्वर्गा प्रसाद ग्रहण करे। १९ई मार्च मध्याह्न प्रायः सहस्राधिक परितृप्तारक्षण सेवा अन्वित है। अनुमाधारण अङ्कित सहयोगिता उत्सवक सफल करे तोले।

श्रीश्रीरामकृष्ण आश्रय—कान्दो : गुरुिषावाद :

गत ०३३ १८९० हईते ७ई फर १८९० १९ १९ई मार्च १९८८ हईते २०१९ मार्च १९८८ पर्वत भवन श्रीरामकृष्णदेव पूजा १८९ उम आविर्भावोत्सव एवं संवत्स्र प्रवृत्तिता श्रीम स्वामी सदानन्ददेव पूजा उत्सव पालित है। ए उपलक्ष्य प्रजाप्रेमी, विशेष पूजा, होम, आराधक, ८७डीपाठ प्रवृत्ति एवं अर्गा प्रवृत्तिगता, कृष्ण बाटा (छत्र या सत्त्व) प्रसाद वितरण, विच्छान्दान, सिडेडी शिल्पीसंस्कार परितृप्तारक्षण आसाकोटक नाटक, शिल्पनडा, पश्चिमेश सरकारे तथा विभाग कर्तक आनन्द अन्वित, पारितोषिक वितरण प्रवृत्ति अन्वित है। विभिन्न आश्रय हते साधन उपलब्ध हन एवं अर्गात छत्र अन्वर्गापरिषद सत्त्व सहयोगिता उत्सव साफल्यमिडत है। आनन्दपरिषद गत सत्त्व उत्सव उत्सवनिते उत्सवनिते सार्थक है।

गदाधरामृतधारा

श्रीशुभापुरी

(२)

उसदिन था सुन्दर सवेरा। गुरुजी से प्रश्न किये आच्छाजी तुम जो नित्य ध्यान करते हो इसका क्या कारण ? पारा ही एक जोटा था उनका, उन्होंने ईशारा किया जोटा के तरफ, अगर ये जोटा नित्य साफ न करूँ तो मजिन अवश्य होगी न ? “जो हाँ, पर सोने का जोटा हो तो ? शिष्य का प्रश्न सुन कर गुरु जी रह गये निरुत्तर।

हाय राम ! गुरुजी को क्या पता उन्हें जो पारस मिला है। उस पारस का परस या कर न जाने कितने लोहे सोने बनेंगे।

एक दिन ठाकुर जो अपने मस्तीमें तात्ति बत्ता कर माँ का नाम गा रहे थे। हँसी उड़ाये पुरीजी। “अरे बच्चा रोटी काहे ठोकेते हो ?” ठाकुर जो बोले—क्या तुम्हें पतानहीं मैं जो माँ का नाम गा रहा हूँ। मुस्कराये पुरीजी।

दिन में पुरीजी मुट्टे जैसे पड़े रहते और रात उनके लिए दिन बन जाता। होम जलाकर ध्यान मग्न रह जाते।

गहरी रात भी...धक धक जल रहा होमाग्नि देखा पुरीजीने एक लम्बे काले रंग वाले पुरुष उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने पुछा “कोन है ? मैं काल भैरव, देवस्थान का रक्षक, हूँ।” तो ठिक है, बैठ जाओ ध्यान लगाओ। तुम भी तो ब्रह्मा का एक प्रकाश हो न ? रक्षक हूँ कर ओभक्त हो गये।

एकबार कम्पनी से जुलुम किये थे। देवस्थान लेने के लिये। बाहद का कारखाना बानायेगें। सरकारने अपना हुकुम जारी करना चाहा। ठाकुरजी भी चिन्तामें पड़ गये। तभी काल भैरवने ठाकुरजी को दर्शन दे कर कहा “इस देवस्थान का मैं रक्षक हूँ, यह स्थान कोई भी न ले सकेगा। चिन्ता की कोई बात नहीं। सचमुच घटना ऐसी ही हुई थी। राणी रासमणि के साथ कम्पनी ने कैसे किया था, पर कैसे जित न सके। ओर भी एकबार देवभूमी के उपर आयी थी विपत्ति। देवभूमी के उपर जलसागर बनाने को इच्छा की थी मधुरबाबु के पुत्र ने। ठाकुरजी इसबार रक्षक को पुकार कर कहें थे को “कौन है देवभूमी के रक्षक ! देवभूमी अब जाने वाली है।” उसबार भी देवभूमी की रक्षा हुई थी, उनकी प्रवेष्टा स्थिति हो चुकी थी। देवताके स्थान देवताके ही रह गये।

—:०:—

दीनी गजल रंजन बीरभूमि

काफिर क्या जाने तुम्हें पाने का मजा
रिद क्या जाने बुतखाने का मजा ।
हर जगह दिला लगा के देख लिया
क्या करे क्या दुनिया, सनमखाने का मजा ।

तूने जिसये छोड़ा तीरे-करम
वही जाने वह तीर खाने का मजा
छोड़ दिया ‘रंजन’ जिक्रे हुस्नो हरक
अबसे मिला उसे तुम्हें पाने का मजा ॥

१) रिद—बछन

२) बुतखाना—शक्ति

३) सनमखाना—शक्ति

४) तीरे-करम—इगार और

५) जिक्रे हुस्नो-हरक- रूपा व आभार कथा

THIS DIVINE LAND

SWAMI SADHANANANDA

(1)

This land of our humanity's cradle unborn
where Gods come as mortals ever anon
And sing the eternal truth divine
"Oh blessed son ! I am thee and you
are mine"

The fire was lit by the holy paen
The guardian minstrels struck the strain
Align with Him Oh deathless ! align
The echoing voice rang aloft "Resign to
Him resign."

(3)

Renunciation came with Shankar pure
Truth incarnate and ever demure
Untainted as a heavenly dove
A fountain-head of knowledge and love,
The world awaited Buddha's vision
A princely heart and piety in person
Mundane pleasure woeful and guile
"To Nirvana thou reconcile"

(4)

Then Sri Chaitanya came on the chariot
of time
And sang devotions gamut sublime
The fallen and trodden uplifted He
Akin to God as man can be,
Dropped passed the sand in time's glass
Till the earth turned into a sinful morass
Ramkrishna incarnate then knocked at
the door
And soothed the wreathing heart In sore
Remaining oft in divine trance
Held Mother Goddess in parlance.

(5)

Orpheus Satyananda came then with lute
To hearten the oppressed, the dumb and
the mute
The Motherhood received a spark from
the fire
They drank the nectar in heart's desire
The Divine child, the eternal spark
A beaming beacon in the sea of dark.

The Truth of Yajna

Sri Sri Baba Thakur

[5]

Being in the absolute sense is Parabrahma—the Absolute par excellence, Paramatma-Supreme Self or Oversoul, Parameswara-Supreme Lord, Paramtattva-Ultimate Reality Supreme Wisdom) or Ultimate Essence. It is omnipotent, omnipresent and omniscient. It is supremely nondual, eternally unmanifest, featureless, impersonal, neutral and only a principle. It is indicated by absolute I which is ever transcendent and beyond and beyond beyond also.

Being in the universal sense is cosmic soul or Lord of the creations which is called Hirannyagarva, Sutratma, Mahapran, Hari, Narayan or Hansadeb. This is Divinity in cosmic form i.e., manifested Divinity who is the trinity of Godhead (Brahma, Visnu and Rudra). This cosmic Divine Being is the soul of all beings or the totality of all individual beings (souls). The individual being or soul is an inseparable part of Cosmic Being or Soul. Cosmic Being is Cosmic I and individual being is individual I. Cosmic I is the source of all individual I. That is cosmic I is the primal divine I who is the highest manifestation of the Absolute I. Primal divine I is the single one I who immediately after revelation feels lonely and awfully monotonous. So in order to break such monotony It (He) resolves to become many and hence manifests Itself into multitude of beings. That means It assumes Itself in myriad forms which are countless, individual beings (spirit souls) i.e., countless individual I. So the Cosmic Divine Being—the primal Divine I is all in all in Its creation. All individual I which are outer expansions or outcome of the primal Divine I arise from, play and dwell in and finally dissolve into the latter. That is to say, each Individual being or I is none but primal Divine I in individual sense, Divine I is infinite but individual I is finite.

Being in the individual sense is the embodied soul or finite self or finite I who is an inseparable part of cosmic Divine Self - the infinite I. The infinite Divine I is the highest manifestation of the Absolute Being or Supreme Self - The Absolute I par excellence. The difference between the Cosmic Divine Being or infinite I and the individual being or finite I is merely qualitative and apparent but not real.

The Absolute Being (Self) or I is supremely transcendent and beyond gunas. The Cosmic Divine Being or I even though dwelling in His mysterious prakriti (nature) of triple gunas (sattva, rajas, tamas) is always above gunas. It is the Lord of prakriti and its gunas. The three gunas are three inseparable units of power. Of them only sattva is illuminating. It is the Intelligent stuff characterising light understanding, unity, harmony and goodness. Rajas is energy stuff characterising passion, activity etc. And tamas is inert stuff characterising delusion, error and ignorance. Rajas and tamas possess no power of understanding. Of the three gunas sattva is the best. And though it is conducive to perfection and liberation It is not totally free from the influence of the other two.

The essential nature of cosmic Divine Being or infinite Divine I is not sattva but supra-sattva, which remains ever free from the influence of triple gunas. Individual being or I is possessed of the nature of impure sattva i.e., sattva dominated by rajas and tamas. Conditioned by such impure sattva individual I (being) is limited and finite. The individual being or I by means of spiritual sadhana when develops pure sattvic nature becomes freed or liberated from the influence of triple gunas, gets united with the infinite divine I and possesses the spiritual divine nature.

Now from the above analysis it is clear that God or the Absolute Being who is Absolute I, reveals in & through fourfold Being or I. Fourfold Being or I is as follows— (1) the Absolute Being or I which is Being in Being or I i.e., consciousness in consciousness ever exists supremely unmanifest and possesses transcendental nature of supreme Sacchidananda Divine ; (2) the infinite cosmic Being or I which is Being in becoming or I in Thou i.e., consciousness in mind manifests itself as attributeful God of infinite and eternal nature ever playing and enjoying its sportful dramatic game of Self-consciousness, bliss and love in unending variations ; 3) supreme Divine Becoming Thou i.e., sakti (power or mind) which is Becoming in Being or Thou in I in i.e., mind in consciousness, manifests itself as the all-pervading divine energy or as cosmic conscious evolutionary movement (mahaprana or sutratma) of auto-dynamic nature ever maintaining the eternal spirit of divine oneness, unity and identity and at the sametime unveiling the spirit of duality, relativity and diversity ; 4) cosmic becoming or Thou i.e., triguna prakriti which is becoming in becoming or Thou in Thou i.e., mind in mind (with I or consciousness itself remaining latent ; unfolds the world order of diversified creations of ever changeable and transitory nature ever upholding all creations of gross and subtle character.

To sum up fourfold Being is fourfold I in the nature of I in I i.e., consciousness in consciousness, I in Thou i.e., consciousness in mind, Thou in I i.e., mind in consciousness and Thou in Thou i.e., mind in mind wherein I or consciousness remains conditioned. Of them the firstfold stands for the Absolute Divine I par excellence, the second fold for the infinite cosmic Divine I or manifested Divine I, the third fold for cosmic Divine Mind and the fourthfold stands for innumerable individual minds.

Differently expressed fourfold Being or I is (1) absolute divine I of ever transcendental nature which is essentially the I of all I, (2) all divine I of central aspect which is the highest manifestation of the absolute divine I and the source of all individual I, (3) spiritual or intellectual I of inner aspect which is the instrument of divine I and the cause of all vital and physical I (4) physical I of outward aspect which is the elemental ground or field of actions for I of both inner fold and central fold. These four fold I have been classified from the view point of creation. During dissolution or transformation of entire becoming of the individual being or the universal being I of the outer physical and vital aspect merges into I of inner spiritual aspect, I of inner spiritual aspect into that of central aspect and I of central aspect finally merges into the absolute divine I of transcendental aspect.

KUNDALINI

[Swami Dibyanandaji, the disciple of Sree Sree Thakur Satyananda, has compiled the sayings of Bhagawan Ramkrishna from Kathamrita on "Kundalini" and that of Swami Vivekananda and Swami Abhedananda from the Volumes of their respective complete works. He has also collected an article on "Science and Mysticism" by Nargis Dalal published in the Statesman on 26th August, 1973. For our readers we are serially publishing the same in instalments. — Editor, Bhab.]

BHAGWAN RAMKRISHNA FROM KATHAMRITA

P. 814, 9-8-1885 :

"Sometimes when I lie down on my side, I feel the spiritual current, pushing me like a monkey and playing with me joyfully. I remain still. That current, like a monkey, suddenly with one jump reach the Sahasrara. That is why you see me jump up with a start."

"Sometimes again, the spiritual current rises like a bird hopping from one branch to another. The place where it rests feels like fire. It may hop from Muladhara to Svadhishtana, from Svadhishtana to Anahat and thus gradually to the Head."

"Sometimes the spiritual current moves up like a snake. Going in a Zigzag way, at last it reaches the Head and I go into Samadhi."

"Sometimes the spiritual current rises through the spine crawling like an ant."

"Sometimes in Samadhi, the soul swims joyfully like a fish in the ocean of Divine Ecstasy."

"A man's spiritual consciousness is not awakened unless his kundalini is aroused."

"The Kundalini dwells in the Muladhara. When it is aroused it passes along the Sushumna Nerve, goes through the centres of Svadhishtana, Manipura, Anahat, Vishuddha, Ajna and at last reaches Sahasrara. This

is called the movement of the Mahavayu, the spiritual current. It culminates in Samadhi."

"The Kundalini is awakened if one feels restless for God."

"Just before my attaining this state of mind, it had been revealed to me how the Kundalini is aroused, how the lotuses of the different centres blossom forth and how all this culminates in Samadhi. This is a very secret experience. I saw a boy twenty-two or twenty-three years old, exactly resembling me, enter the Sushumna Nerve and commune with the lotuses, touching them with his tongue. He began with the centre at the Anus and passed at the centres at the sexual-organ, navel and so on. The different lotuses of those centres four-petalled, six-petalled, and so forth had been drooping. At his touch they stood erect. When it reached the heart—I distinctly remember it—and communed with the lotus there, touching it with his tongue, the twelve-petalled Lotus, which was hanging head down, stood erect and opened its petals. Then he came to the sixteen-petalled Lotus in the throat and the two-petalled Lotus in the forehead. And last of all, the thousand-petalled Lotus in the head blossomed. Since then I am in this State."

KUNDALINI

P. 576, 11-к-1884 :

"Can one attain knowledge of God by merely repeating the word 'GOD'? There are two indications of such knowledge.

First longing, that is to say, Love for God, Second the awakening of the Kundalini.

As long as the Kundalini remains asleep, you have not attained knowledge of God."

"When the Kundalini is awakened, one attains Bhava, Bhakti, Prema and so on. This is the path of Devotion."

P. 471, 7-ix-1884 :

"The Baule will ask you 'Do you know about the wind? The 'Wind' means the great current that one feels in the subtle Nerves, Ida, Pingale and Sushumna, when the Kundalini is awakened. They will ask you further 'In which station are you dwelling'? According to them, there are six Stations corresponding to six psychic centres of Yoga. If they say that a man stays in the 'fifth station' it means that his mind has climbed to the fifth centre known as the Vishudha Chakra. At that time he sees the Formless."

Master thus sang :

"Within the petals of this flower there lies concealed a Subtle Space, Transcending which one sees at length the Universe in space dissolve."

P. 180. 10-6-1883 :

*Awake, Mother! Awake! How long thou
hast been asleep.

**In the Lotus of the Muladhara !
Fulfill Thy Secret function, Mother !
Rise to the thousand-petalled lotus
within the head.**

Where Mighty Siva has His dwelling ;
Swiftly pierce the Six Lotuses
And take away grief, O Essence of
Consciousness."

Bhagwan Ramkrishna "The song speaks of the Kundalini's passing through the six centres. God is both within and without. From within He creates the various states of Mind. After passing through the six centres, the jiva goes beyond the realm of Maya and becomes united with the Supreme Soul. One cannot see God unless Maya steps aside from the door."

P. 201 :

**"Thy Name I have heard, O consort of Siva,
is the destroyer of our fear,**

And so on Thee I cast my burden : Save
me I Save me, O kind Mother I

Out of Thy Womb this world is born, and
Thou it is that dost pervade it,

**Art Thou Kali , Art Though Radha ? who can
rightly say ?**

Mother in every living creature Thou dost
have Thy Dwelling place.

**As Kundalini Thou Dost live in the
Lotus of the Muladhara**

Above it lies the Svadhishthana where the four-petalled Lotus blooms ;

There also Thou dost make Thy home,
O mystic power of Kundalini ;

**In the four petals of that flower and in
Vairasana's six petals**

At the Nevel Is Manipura the blue Ten
Petalled Lotus flower :

Through the path-way of Sushumna, Thou
dost ascend and enter there.

O Lady of the Lotuses, in Lotus blossoms
Thou dost swell |

Beyond them lies the lake of Nectar, in
the region of the heart,

Where the twelve-petalled Lotus flower
enchants the eye with scarlet flame,

When Thou dost open it, O Mother touching
it with Thy Lotus Feet,

The age-long darkness of the heart
instantly scatters at Thy sight.

BHABMUKHEY

Above in the throat is the sixteen-petalled
Lotus flower of smoky hue ;
Within the petals of this flower there lies
concealed a subtle space,
Transcending which one sees at length
the Universe in Space Dissolve.
And higher yet, between the eye-brows,
Blossoms the Lotus of petals two ;
Where the mind of man remains a prisoner
and past controlling ;
From this flower the mind desires to watch
the sportive play of Life.
Highest of all, within the head, the Soul
enthraling Centre is,
Where shines the thousand-petalled Lotus,
Mahadeva's dwelling place.
Having ascended to His throne, O Spouse
of Siva sit beside Him !
Thou art the Primal Power, O Mother !
She whose senses are controlled ;
The Yogis meditate on Thee as Uma,
great Himalays daughter,
Thou who art the Power of Siva put to
death my ceaseless cravings ,
Grant that I never fall again into the
ocean of this world.
Mother Thou art the Primal Power, Thou
the five Cosmic principles ;
Who can ever hope to know Thee, who art
beyond all principles,
Only for Thy Bhaktas' sake dost Thou
assume Thy various forms ;
But when Thy devotees' five senses merge
in the five elements,
Mother it is Thyself alone that he
beholds as formless Truth."

Referring to the lines, "above in the throat is the sixteen-petalled Lotus flower of smoky hue, where lies concealed a subtle space, transcending which one sees at length the Universe in Space Dissolve." Bhagwan Ramkrishna said (to M) "Listen,

This is known as the vision of Satchidananda the formless Brahman, The Kundalini rising above the Vishudha Chakra enables one to see everything as Akasha."

"One attains the absolute by going beyond the Universe and its created beings conjured up by Maya. By passing beyond the NADA one goes into Samadhi. By repeating 'OM' one goes beyond the NADA and attains Samadhi."

P. 456-7, 3-8-1884 :

"After great effort and spiritual practices the Kundalini is awakened. According to the Yogis there are three Nerves. 'Ida', 'Pingala' and 'Sushumna' in the spinal column. Along the Sushumna are six Lotuses, (Chakras) or centres the lowest being known as 'Muladhara'. Then come successively Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishudha and Ajna. There are the six centres. The Kundalini when awakened, passes through the lower centres and comes to Anahata which is at the heart. It stays there. At that time the mind of the aspirant is withdrawn from the three lower Centres. He feels the awakening of Divine consciousness and sees Light. In mute wonder he sees that radiance and cries out : What is this ? What is this ?"

"After passing through the six centres, the Kundalini reaches the thousand-petalled Lotus known as the Sahasrara, and the aspirant goes into Samadhi."

"According to Vedas these centres are called 'Bhumi', 'Planes'. There are seven such planes. The centre at the heart corresponds to the fourth plane of the Vedas. According to the Tantra there is in this Centre a Lotus called 'Anahat' with twelve petals."

"The Centre known as Vishudha is the fifth plane. This centre is at the throat and

has a Lotus with sixteen petals. When the Kundalini reaches this plane, the aspirant longs to talk and hear only about God. Conversation on worldly subjects causes him great pain. He leaves a place where people talk of these matters."

"Then comes the sixth plane, known as 'Ajna'. This centre is located between the

eye brows in the forehead and has a Lotus with two petals. When Kundalini reaches it, the aspirant sees the form of God. But still there remains a slight barrier between the devotee and God. It is like a light inside a lantern. You may think you have touched the light but in reality you have not, because of the barrier of glass."

—*—

The Goal of Our Life

Dr. H. P. Chakraborti

(Visva Bharati University)

[2]

The highest goal of our life is to go beyond this samsara, i.e., to go beyond the Cycles of births and deaths so as to reach Brahman or Atman, our True essence. The Gita (ch. xv) speaks of this phenomenal universe as the expression of one eternal energy known as Prakriti or Maya, the unmanifested Being (avyakta). This energy dwells in the body of the Infinite spirit called Brahman, Atman etc., which is practically the nameless and which is the root of this samsara. This mundane world is described as a fig tree in the Gita (xv. 1—'Urdhva-mulam-adhah-sakham-esvattham prahu-r-avyayam') with its root upward, its branches below and whose leaves are the metres, but which is eternal. By our good thoughts and deeds we can rise higher from this human plane and ultimately be one with the Supreme. That is why Abhedananda assures us that "the human plane is, after all, the best plane and better than the plane of heavens or angels and arch-angels etc., because these are the planes where we can reap the results of what we do in the human plane." (vol. ix, p. 768). The Upanisad also teaches us that even the gods shall have to take their birth in the human world for their final emancipation. Can anybody go beyond this phenomenal world? Yes, we can. The Gita assures us that we can cut this tree of samsara with the sword of right knowledge and rise above it. The goal of the Absolute Self is to be searched after, having cut asunder the tree of the phenomenal world with the strong sword of dispassion (asangasastrena drdhena cchitva tateh padam tat parimargitavyam—Gita, xv. 3-4), where one goes never to return (yasmin gata na nivartante bhuyah). From the Delphian oracle socrates heard: "Best of all knowledge is know-thyself." The upanishads declare—"Atmanam viddhi," i.e., know thyself."

BHABMUKHEY

Now what is Brahman or Atman? Baderayana tries to delines Brahman as "janmadyasya yatah" as that which is the source of all, the preerver and the end of all. ("Yato imani bhutani jayante yena jatani jivanti yat prayantyabhisamvisanti tad-Brahma"). The Upanisad speaks of it as indescribable : yato vacho nivartante' prapya manasa saha). The Gita x, 20 gives us an idea of the Absolute, the all-pervading spirit : "I am the Spirit seated in the heart of all beings". Thus the essence of everything is the Infinite Being. Sat (existence), Chit (consciousness) and ananda (joy) are of Brahman or God. God dwells in all things. This phenomenal world is His manifestation, only one-fourth of Him. The rest is beyond our intellect. God, according to Vedanta, is both personal, impersonal and beyond both. He is in all things, the soul of our souls.

Now about Brahman, the Universal self-conscious entity. To know this we must know what is present in our egos. It known, it makes us free from fear of death. Brahman is manifested in and through all of us may this whole universe. Death can destroy only our body or the senses which are subject to change but not the Atman or self-conscious entity in each of us, which is immortal and above all changes. The Gita (II, 20) discloses the real character of the atman : "Na jayate mriyate va kadachit, nayam bhutva bhavita va na bhuyah / ajo nityah sasvato yam purano na hanyate hanyamane sarire."

—:0:—

(To be continued)

One must call him with firm faith. Suppose, you are calling Gadadhar or Mohan—you have faith that he is in the adjoining room or somewhere else and he will come as soon as he hears you. Merely saying "Hare Kisto, Hare Kisto" will not do. Unshaken faith must be there that He is listening.

*

*

May He through His grace draw us toward Him. Our prayer is "O Thakur, may you rouse our thirst, supply us with all the required materials, do everything within Your power"—this is the prayer.

—Sree Sree Thakur Satyananda

**'SAFEX' LAMINATED SAFETY GLASS
TOUGHENED GLASS
"TWINBIRD" MIRRORS ETC.**

Manufactured by

Hindusthan Safety Glass Works Private Ltd.

**2, ST. GEORGE GATE ROAD, HASTINGS,
CALCUTTA-22.**

"DEVGLASS"

PHONE : 45-0125 (3 Lines)

ঐশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের পুস্তকাবলীর কয়েকটি

যুগে যুগে যার আসা—(ঐশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবজীবনের ও সাধনমার্গের এক অপূর্ণ জীবনালেখ্য)	ট। ১২'০০
গুণাচার্য— (ঐমং স্বামী অভেদানন্দের জীবনবেদ অবলম্বনে জীবনী গ্রন্থ)	ট। ৬'০০
বেদচন্দা— (ঐশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের অন্তর্বাণী সঙ্কলন—৫ খণ্ড একত্রে)	ট। ৭'০০
কথামৃত-কথা— (ঐশ্রীরামকৃষ্ণ কথাসুতের কিছু বাণীর আধুনিক যুগসম্মত ব্যাখ্যা)	ট। ৮'০০
জপ-স্থান— (জপ ও ধ্যানমার্গে অধ্যাত্মসাধনার সহজ নির্দেশ)	ট। ৬'০০
Complete Works— (In Eighth Volumes)	Rs. 150'00

ঐরামকৃষ্ণ সেবারতন, ২, শি. কে. সাহা লেন,
কলিকাতা-৭০০০৫৬ ফোন ১২-৭১৩০

With Best Compliments Of :

Gram : COKEOVEN, CALCUTTA

Telephone : 24-4492, 24-5980

INDIA POTTERIES LTD.

13 JUN 1954

Manufacturers of :

Electrical Insulators upto 33 kv range as per I. S. Specification

And

Quality Tableware, 'India' Water Filter, Filter
Candles, Figures, Dolls, Toys, Industrial
Ceramics Etc. Etc.



Factory :

8, Nilgunj Road, Belgharla,
Calcutta-700056
Phone : 58-1198

Office :

91, Dharmatala Street,
Calcutta-700013

গ্রন্থদপট পরিচিতি :—বরানগর গ্রীষ্মরামকৃষ্ণ সেবাস্থতনে—সংযোজিত গ্রীষ্ম স্বামী সত্যানন্দদেবের সমাধি মন্দির।

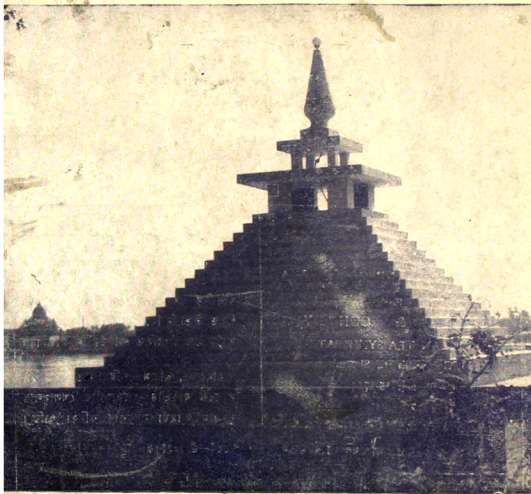
পত্রিকা সচিব—স্বামী পরমানন্দ । সম্পাদক—স্বামী অরুণানন্দ ও স্বামী নীলানন্দ ।

গ্রীষ্মরামকৃষ্ণ সেবাস্থতনে, ২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান প্রেস,
মহামিলন ষ্ট, কলিকাতা-৩৬ হইতে মুদ্রিত (ফোন : ৫২-৬১৭৯) । মাসিক ও প্রকাশক—স্বামী পরমানন্দ ।

প্রতি সংখ্যা : এক টাকা পঁচিশ পয়সা মাত্র ।

বার্ষিক মূল্য : চৌদ্দ টাকা মাত্র ।

ভাষা



কান্তিক • তেরশ' একানব্বই • অষ্টাত্ৰিংশ বর্ষ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। সিউড়ী

ভারতের মোটর পার্টস্‌ ব্যবসায়
একটি ঐতিহ্যপূর্ণ বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
হাওড়া মোটর কোম্পানী
- লিমিটেড -

রেজিষ্টার্ড অফিস-১৬৫, শরৎ বোস রোড

কলিকাতা - ২৬

প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র-১৬, রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জী রোড

কলিকাতা - ১

অফিস শাখা-দিল্লী & কটক & বানরাদ & পাটনা & শিলিগুড়ি & গোহাটী



DRINK

ORPHAN'S TEA

For

HEALTH & ECONOMY

ORPHAN TEA SYNDICATE

133, Cornwallis St., Shyambazar

Phone: 55-2704

ফোন : ৩৪-৭২৪৬

এন্, কে, স্পোর্টস্‌

৬৭৫, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-১

ঘাবতীয় খেলাধুলার সরঞ্জাম এবং কাপ
শীলড ইত্যাদি বিক্রয়। বিভিন্ন জীন্ডামোদী
কর্ডক উচ্চ প্রশংসিত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান।

✽

ঐরামকৃষ্ণ আহুজা পরিচালিত বিভাবীট
সংস্থের ঘাবতীয় প্রতিষ্ঠানের খেলাধুলার
সরঞ্জাম আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

“মাগধের হাতে মাঘের রতন আছে”-জীর্জীঠাকুর

D. RATAN & Co.
Photographers **PHOTO**
72-1, CORNWALLIS ST., COL. 6
PHONE: 34 - 3711



ডি. রতন & কোং
ফটোগ্রাফার্স
PHOTO
ফোন ৩৪ - ৩৭১১
২২-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলি. ৬

কাণ্ডিক
সপ্তম সংখ্যা



অষ্টাভিংশ বর্ষ
ভৈরব একাদশমী

বিজয়া	২৪৫	শ্রীশ্রীঠাকুর
শ্রীশ্রীসারদামায়ে অপ্রকাশিত পত্র	২৪৬	
বিশ্বাসে মিলায় বন্দু	২৪৭	স্বামী সত্যানন্দদেব
ব্যাকুলতা দ্বারা বিশ্ব লাভ হয়	২৪৭	
কীর্তন	২৪৮	স্বামী সাধনানন্দ
গান	২৪৮	শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশ্রীসামক্ক মঙ্গলকাব্য	২৪৯	শ্রীঅর্চনাপুরী
শ্রীশ্রীভক্তাবতারী গীতি আলোচনা	২৫০	স্বামী বোধানন্দ
গান	২৫৪	শ্রীশ্রীশ্রীপুত্রী
অবত ও চর্চাম গুরু	২৫৫	স্বামী শিবানন্দ
গুরু	২৬০	গৌরী বৈপাল
শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ ও দেবপ্রিয়	২৬১	শ্রীসান্যাপুরী
কৃপা-কাহিনী	২৬৪	স্বামী নীলকণ্ঠসানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের নবপ্রকাশিত কয়েকটি পুস্তক

সাধুর চলার পথে—	সাধকের জীবনের পথ নির্দেশ	মূল্য—৬'০০
উপনিষদ চয়ন—	উপনিষদের কয়েকটি শ্লোকের অর্থময় ব্যাখ্যা	মূল্য—৪'০০
ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও অবতারবাদ—	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবতারত্ব সম্পর্কে নবীন দৃষ্টিতে আলোচনা	মূল্য—৩'০০
৪। আশীর্বাণী—	স্বামী সত্যানন্দদেবের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত আশীর্বাচনের সংকলন	মূল্য—৪'০০

। প্রাপ্তিস্থান ।

শ্রীশ্রীসামক্ক আশ্রম, ২, প্রাণ কৃষ্ণ সাহা লেন
কলিকাতা-৭০০০৩৬, ফোন : ৫২-৭১৩৩

শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, সকল রকম শীতের পোষাক, বেনারসী, সিদ্দ, তাঁতবস্ত্র,
মিলবস্ত্র, সর্বপ্রকার তৈয়ারী পোষাক, হোলিয়ারী ও আধুনিক ডিঙ্গাইনের
ডেকরণ, টেরিলিন, টুফিল ও ওয়াস এণ্ড ওয়ার শাড়ী বিক্রোতা ।

রামকানাই শামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

বড়বাজার, কলিকাতা-৭ ফোন : ৩৩-২৩০৩

Electrical Motor, Double Ended Grinder, Polishing
& Buffing. Flexible Shaft Grinder Etc.

MANUFACTURED BY :

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2, PRIYANATH MIDDYA ROAD. (Belgharia)

CALCUTTA-700056. Phone : 58-1575

মডার্ণ ডেকরেটিস

সুডবিবাহ ও যে কোন উৎসবের

প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫৬, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫-২৫৪৯, ৫৫-৬৫৬৫

Gram : DISWASHING

PHONE : { Office : 24-1236
Works : 55-1738

PELICAN ENGINEERS

Fabricators of Stainless Steel Chemical Plants,
Pharmaceutical & Fruit Preservation Equipments.

4, HARTFORD LANE, CALCUTTA-700016.

Works : 161, Upper Chitpur Road.

Calcutta-700005

কার্তিক : 'ভৈরব' একানব্বই]

ভাবযুগে

[অষ্টাঙ্গিণ বর্ষ : সপ্তম সংখ্যা]

কে যেন বলে	২৬৮	স্বামী বিজ্ঞানন্দ
ইন্ডার জয় ও নলোর সম্পর্ক.....চিন্তাধারা (১২)	২৬৯	অনুবাব—গ্রীষ্মপতি মৃৎপাথ্যার
মার্কি ডেসেই	২৭১	গ্রীষ্মপাথ্যের চরিত্র
আশ্রম সংবাদ	২৭২	
তখন তুমি	২৭৬	গ্রীষ্মপাথ্যের মৃত্যু চরিত্র
Srimad Devi Bhagavatha Mahatyam	55	By courtesy of Sri T. B. Manon
The Truth of Yajna (10)	56	Sri Sri Baba Thakur

‘ভাবযুগের নিয়মাবলী’

‘ভাবযুগে’ মাসিক পত্রিকা—সিউডী অস্ট্রিয়ামকক আশ্রমের মুখপত্র।

বর্ষান্তে ফেব্রুয়ারি মাসে। ফেব্রুয়ারি মাসে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু কমপক্ষে ৬ মাসের গ্রাহক হইলে সুবিধাজনক হয়। বার্ষিক চাঁদা বছরের প্রথমেই অগ্রিম দিতে হইবে।

বার্ষিক মূল্য সভাক টা: ১৪'০০। বাৎসরিক টা: ৭'০০।

রচনা : ধর্ম, নীতি, বিজ্ঞান, প্রেম, শ্রম, শ্রদ্ধা, সৎকর্তব্য ও শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠান প্রয়োজন। ছয়মাস পরে অমনোনিতি প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। কোন রচনা প্রকাশ করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। সমালোচনার প্রয়োজন হইলে দুই কপি করিয়া পত্রিক প্রেরণ করা আবশ্যিক।

বিজ্ঞাপন : বিজ্ঞাপনের বিবরণসমূহ পূর্বমাসের মধ্যে পাঠাইলে উহা পরবর্তী মাসে প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞাপনের হার প্রত্যয়ে জানিতে পারিবেন।

নিম্ন লিখিত গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের প্রতি নিবেদন এই যে, পত্রিকা উপযুক্ত সময়ে না পাইলে সর্বপ্রথম স্থানীয় ডাকঘরে সন্ধান লইবেন এবং পরে অফিসে জানাইবেন। পত্রাদি লিখবার সময় গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করিবেন।

কোন গ্রাহক-গ্রাহিকা ঠিকানা পরিবর্তন করিলে উহা পূর্ববর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে কার্যালয়ের জানান আবশ্যিক।

বার্ষিক চাঁদা বৈশাখ মাসের মধ্যে মণিঅর্ডার বোঝে, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা মণিঅর্ডার ফর্মের সর্বনিম্ন কূপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া “স্বামী পরমানন্দ, ভাবযুগে পত্রিকা সচিব, ২, পি. কে. সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬” (ফোন : ৫২-৭১০০) এই ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

✱ আশ্রয় পূর্ব পঞ্জী : অগ্রহায়ণ, ১৩৯১

৩রা	অগ্রহায়ণ,	১৯শে	নভেম্বর	সোমবার	— একাদশীর উপবাস ও রাতে হোম ।
৫ই		২২শে		বৃহস্পতিবার	— রাতে অমাবস্যার হোম ।
১০ই		২৭শে		বৃহস্পতিবার	— দ্ব্যযাত্রপূর্ব শ্রীশ্রীস্বামকৃক আশ্রমে শ্রীশ্রীসারদা কাত্যারনীর পূজারাম্যন্ত ।
১৮ই	চৈত্র	৫ই	ডিসেম্বর	মঙ্গলবার	— একাদশীর উপবাস ও রাতে হোম ।
২২শে		৯ই	"	শনিবার	— রাতে পূর্ণিমার হোম ।
২৭শে		১৪ই		শনিবার	— সিউড়ী ও বরানগর শ্রীশ্রীস্বামকৃক আশ্রমে শ্রীশ্রীস্বামভাত শ্রীশ্রীসারদা মাতার ১০২-তম শত আদির্ভাব তিথি পূজা ।

✱ বিগত সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে ।

জ্ঞাতব্য বিষয়—‘ভাবমুখের’ চাঁদা সমরমত পাঠাইয়া ঐঠাকুরের কর্তৃত্বজ্ঞে সাহায্য করুন ।

ঐঃঃমুকুন্দপদ ভট্টসঃ

৮বামাপদ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত

নারিকেলডাঙ্গা রোলার ফ্লাওয়ার মিলস্

১৭/৪, কোবল ঠান্ডে রোড, কলিকাতা-১

স্থাপিত ইং ১৮৮৬ সাল

৯৮ বৎসরের

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ফোন : { ৩৫-৪১২৪
৩৫-৪১২৫

। স্বত্বাধিকারী ।

রথীন্দ্রনাথ ঘোষ এ্যাণ্ড ব্রাদার্স



Phone : 57-4562

TRINAYANI ELECTRIC Co.

Electrical Engineers & Govt. Licensed contractors

145, LAKE TOWN, Block—'A'
CALCUTTA-700089

With Best Compliments from :



RELIABLE ENGINEERS & TRADERS

25, Harachandra Mullick Street
Calcutta-700005

N. G. Chakrabarti Alloy Steels (P.) Ltd.

Manufacturers of :

**Direct Arc Electric Melting Furnaces for Melting
all Grade Steels,
Alloy Steels & Alloy Iron etc.**

MINI MODEL

SR-1—150 Kgs. Batch
SR-2—250 Kgs.
SR-3—500 Kgs.

MAXI MODEL

SR-4—1000 Kgs. Batch
SR-5—3000 Kgs.
SR-6—5000 Kgs.

**also supply
Special Steel and Iron Casting being manufacture
under technical guidance
and undertake
Projects and Turn-key jobs
Quality : : Guaranteed**

Registered Office :

**3-D, NANDY STREET,
CALCUTTA-700 029**

Phone - 42-5197 : Gram : ENGEECEE



ভাষা



শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেব প্রতিষ্ঠিত

অষ্টাবিংশ বর্ষ	ভৈরব* একাদশ্যই	কাভিক	সপ্তম সংখ্যা
----------------	----------------	-------	--------------

বিজয়া

ঐশ্বর্যাকুর

কেলে আমার নয়ন জলে
 ওমা তুই হাসনে চলে ।
 বাখার ঝাটা শতদল
 দিয়ে রাঙালি তোর পদতল
 ঐ চলো চলো কালো রূপে
 তুলালি কি তুলবি বলে ।
 আমারে পর পর
 মেলের কি সর মা তর
 মায়ের কোল যে বড় মিঠে
 তুলালে সে কি তোলে ।
 হন যে করে কেমন
 ঘরে তাই বর না গো মন
 জমেছে অনেক বাধা
 তুতাবো কল মা কোথা
 মায়ের কোল না হ'লে ।

শ্রী সারদামাতার অপ্রকাশিত পত্র

শ্রী শ্রীহরি :-

১৪ই শ্রাবণ
কোয়ালপাড়া
ঐশ্বর্যগদবা আশ্রম

কণ্যাববরেণু :

বাবাজীবন ! তোমার প্রেরিত ৫ টাকার
মানবজীবন খানি পাইয়াছি। তোমরা আমার আশীর্বাদ
জানিবে। মরো কর হইয়াছি। এখন দুর্ভাগ্য আছি।
তোমাদের কৃপণ মরো। মরো গিয়াছে।

আশীর্বাদমূল্য

“তোমার মা”

(ইং ২৬৭১১২১৭ তারিখে দিনাজপুর জেলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক
ঐযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘোষ মহাশয়কে লিখিত)

বিশ্বাসে মিলার বস্তু

হামী সত্যানন্দদেব

বিশ্বাস মনের একটি অবস্থা। এমন একটি ভাইব্রেশন (vibration) বা মনকে উত্তেজিত করে উত্তেজিত করে নিয়ে যায়। যেমন কাল স্বর্ষ্য উঠবে এটি যদি আমরা বিশ্বাস না করি তাহলে কালকের দিনটা আসবে কিনা তাই তো স্থিরতা নাই। কোন কাজই তাহলে হয় না, চুপচাপ বসে থাকতে হয়। প্রত্যেকটি জিনিষের বিশ্বাস আয়াদিককে উত্তেজিত করে নিয়ে যায়। বিশ্বাস ও জ্ঞান এক, এবং বিশ্বাস ও ঠাকুর এক। খ্রীষ্টাকুর বলেছেন, “বিশ্বাসে মিলার বস্তু”। সর্বোপরি আদিত বিশ্বাস, সত্যও তাই। তবে বা কিছু, সব, জিন ও আনন্দ তাই বিশ্বাস রাখতে হয়। প্রভা যানে তিনি আছেন এই বিশ্বাস—উপনিষদে আছে প্রভাসের মনতে (ছান্দ ৭।১১)। তাঁতে বিশ্বাস আসে নাহলে কিছুই দাঁড়ায় না। বৈকুণ্ঠ্যে “বিশ্বাসে মিলার কৃষ্ণ তাকে বহুদেব”। আর পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান ঘটে Belief বলতে চিন্তার উপর (cognitive side—চিন্তার দিকে) জোর দেওয়া হয় আর faith বলতে চিন্তার উপর (conative side, ইচ্ছার দিকে) জোর থাকে (J. Ward),

সাদৃশ্যে প্রভা কেন হয়? তাঁরা তো ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, তাঁকে নিয়েই পড়ে আছেন। সাধনের মন, প্রাণ, অন্তরাত্মা অবিরত তাঁরই চিন্তার দ্বারা, কাজেই তাঁদের কাছে সেগুলি তাঁদের সবার কল্পেই সাধারণ লোকের ঈশ্বরে প্রভা জন্মে। সাধুতা হচ্ছে বিশ্বাসের পূর্ণ প্রত্যক্ষ। তাঁদের তিনি ছাড়া তো আর কিছুই নেই। যেমন একটি বিদ্যুৎ আশ্রমের কাছে সেগুলি আপন আপন জ্বলে যায়।

“বাকুলতা দ্বারা ঈশ্বর লাভ হয়”

হামী সত্যানন্দদেব

কেউ যদি তৃষ্ণারূপে হয়ে এক গ্রাস জল চায় তবে সে তা পাবেই। যেখানেই হউক পাবেই, এমন কি গর মরুভূমিতেও। কিন্তু যদি এই গরার ধারে বসে আনি যদি মনে মনে জল চাই—তবে গরার ধারে বসে আনি তা পাব না। আচ্ছা, একটা material want—যদি এভাবে পূরণ হয় তবে কেউ যদি ভগবানকে চায় ব্যাকুল ভাবে, সৌকর্য্যে চায় না? যদি আমাদের এত কাছে এত আপনার তাকে যদি সত্যি সত্যি ব্যাকুলভাবে চাই তবে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু তাঁকে কে চাচ্ছে? তাঁর জন্য কে ব্যাকুল হচ্ছে?

আচ্ছা এই ব্যাকুলতা হয় না কেন? কারণ তিনি এই Instinct দেন নি? একে সাধন করে পেতে হয়। লীলার জন্যে এই চাহিদা তিনি আমাদের দেন নি। ব্যাকুলতা কিভাবে হয়? যেহেতু (নিজেকে) এই ব্যাকুলতার সৃষ্টি করতে হয়। ধর্ম Practical ছিলেন তাই দিব্যকে জলের নীচে ধরিয়েছেন। আমিও প্রথম প্রথম কলতাম—জলের নীচে নির্দিষ্ট সংখ্যা গুণ না হওয়া পর্যন্ত জুয়ে থাকতাম। Practical philosophy ও practical religion এক নয়। Philosophy মানে বার মতো illogical কিছু নেই, যেমন পরাভার ও পরাজ্ঞান এক। এ হল philosophical truth কিন্তু তা practical religion নয়। যেমন ট্রেলগ্রাম্‌হামী তিনি পরাজ্ঞানী নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁকে ও' হেই হেই করে নাচতে দেখিনি। আবার মীরাবাই ট্রেলগ্রাম্‌হামীর মত স্থান হলে পড়ে থাকেন নি। আবার মহাপ্রভু নেচে কে'দে একাকার। শ্যামী গুহানন্দ মহারাজকে একবার নাচতে বলা হল। একটু নাচলেন—তারপর সমাধি। এই হল practical philosophy থেকে practical religion-এর তফাৎ।

কীর্তন

দ্বামী সাধনানন্দ

ওরে কে ওই বাউল নেচে চলে যায়
ঐ দাঁখনপুত্রীর আশিনার ।
সে যে নামে মাতোয়ারা, চোখে কল ধারা
ও সে প্রেমে ধরবারে লুটে উভরায় ॥
সে যে কে'সে কে'সে ফেরে, বলে কোথা তোরা ওরে
শত কখন ছি'ড়ে আর নিজ ঘরে ।
“ওরা তোরা পর কেউ নয় আপন
ভুলিল কেন হার এ সার কথার” ॥
“এম্বা দিন ফেল চলে, দেখা সে মা বলে”
আঁখি ঝল খঁরে বার সে যে গলে ।
সে যে মূখে মা মা বলে বার নিজে ভুলে
ওসে পলকট-হায়ে হরহায় ॥
প্রেমের পুঙ্করী এসেছে ধরায়
সে যে প্রেম কেটে যেতে দিলে বার

ওসে নেমেছে দেবতা মাটীর ধূলার
না জানি কোন সে করুণার
তোরা চিনিবি কবে রে সেই সে কেহুলে
গাড়ি হাশির মনের দেউলে
ওরে আর চলে তোরা আপনায়ে ভুলে
সব সুখে দুখ নিজ পায়ে দলে
তোরা পথ শ্বেবে, আছে সে যে বসে
ওরে আর তোরা তার পদমায় ॥
তাকে তাই ঐ মৃন্ময়ী মাতা লিঙ্গময়ী হর গরিমার
ও বার পুণ্য পরশে শাক্তির ধারা
উল্লস ঘন্মে বহে বার
ও সে সত্যানন্দ নব কল ধরি
আসিলাছে আঁজি সদায় ।
ও সে গ্রাম ও কৃষ্ণ দুই তনু মিশি
ধরিয়াছে আজ নর কায় ॥

—০০—

• ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫২

গান

উলোমে গ্রন্থাথ বন্দোপাধ্যায়

গুরু, গুরীমান মহতো মহীমান
তুমিই আমার প্রাণ হে ঠাকুর
তুমিই আমার প্রাণ ।
আমার হত আশা বা কিছ' ভ্রমসা
তোমারই কৃপার দান হে ঠাকুর
তোমারই কৃপার দান ॥...
কর হোক প্রভু তব নাম জর
কর মোরে নাথ কর তুমিকর

হাসিব কাঁদব থাকিব নির্ভর
গাহি তব অন্নদান হে ঠাকুর
গাহি তব অন্নদান ॥...
ভরে ভরে থাকি কখন কি সে করি
কামনা বাসনার কিছু বা অহলে ধরি
অভর দাও সো কৃপাময় ধরি
প্রাণ যে করে আনন্দান হে ঠাকুর
প্রাণ যে করে আনন্দান ॥

—০০—

ঐশ্বর্যবাক্য বহুলকাব্য

ঐশ্বর্যবাহু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় খণ্ড

দশম পরিচ্ছেদ

দিন বলে চলে কল্ল কলির কানে

বিদায় কহু আসি

সখ্যা মাঝে ছেঁই গুনে গুনে

শাপলায়ও আঁখি মূদে আসে ঘুমে

দিবস শাকের জোয়ারেতে শব্দ সন্ন রেখেছে তাসি ।

পারের ঘাটের কখনও বা আলো

কখনও বা মেঘ ছায়া

পাতলীর বৃকে ঘনায় কি ঝেঁষ মায়া

সে বৃকে শব্দই অসেবা মেঘনা

গরুর গুঁড়ির ওঠে আনমনা

ছন্দের ভাঙ এখনও যেন গো

পারনি নিটোল করা ।

দাঁখ্যাপুরের ডাঙা ফুলঝুরি ছুঁয়ে

এমনি কতই উরস পড়ে নুয়ে ।

রিশুর শীকরে ভিজে কন্যাস

পল্লবের কাননে উদাস

অকুট লীলার কত রামকন্দ

লুটের গলন ভুঁয়ে ।

যেত কুমের মালা চন্দনে সাজি

সেদিন প্রভাতধানি

পূজারিণী বেধে গলন দুয়ারে

দাঁড়ালো আসিয়া আখো হৃদয়সরে

শ্রীশ্রুতর মনে কার ক্ষুদ্র শব্দ ক'রে গেল কানাকানি ।

দুটি নয়নের দীপল পাতার

ভেসে ওঠে কোন ছবি

দুশ ছায়ে অঁকা মন্দির সৌন্দর্য

কে আসিছে ঐ ডাঙা ডাঙা পথে

কোন সে পাঁখি কার সম্বন্ধে

উদাস নয়নে ঐক্যময়ি কণ্ঠে ডোয়ের কতুণ গ্রবি ।

আদিত্যটোলার সূর্যের প্রান্ত বাহি

রেখেছে সেদিন একটি তরুণ রাহি

নিরুদ্বেশের পথ সম্মানী

সংকট নত দৃঢ় মুখখানি

আলুবালা বাস উদাস উদাস সবল কিছু নাহি ।

পঞ্চহারা আলো হয় যদি কোনদিন

আকাশের অভিনায়

কে যেন তাহার অভিনায় দিশা

সে দেশে যে চির অচিন্তায় মিশা

উষাও চলার ছন্দেই কি গো জেগে ওঠে পথ তারি ।

পাঁখির মনে একটি প্রশ্ন—

গুণো আর কতদূর

সুন্দরী তীরে সেই সে দাঁখ্যাপুর ।

কোন্না ডোয়ের দিশারী আলোতে

বাটার সূর্য অঁচি এ পথে

বাউল ক্ষুরে বাহিরে এনেছে

অনামী বীণার সুর ।

খেঁচে চলে কোলা গলনেতে রোদ বাড়ি

তুকার ভাঙ কলিহস্তের সারে ।

শূন্যে পাঁখি আরো সে পাঁখি

দাঁখ্যাপুরের পথ কোর্নাসকে

কেহ শোনে কেহ শোনে না সে কথা

অনহেলি বার তারে ।

তুইলত পঞ্চাশ

হেয়ে মেলে পথ বিশেষ তবুও হায়
 স্নানি বিহীন একা
 গম্বীর তাঁরে ঘাস ফুলদলি
 চেরে চেরে দেখে কচি মুখ তুলি
 কোকো বা পাড়ভাঙা জলা ধারে
 মাছরাঙা নাড়ে পাখা ।

সহসা জনেক কহিল তরুণে
 ওগো একা পথচারী
 কোথায় চলেছ তিকানা নাও তো তারি ।
 কহিল তরুণ দাঁখনন্দর
 জানো কি গো সেই পথের স্বর
 বলে নাও তবে কোন মতে যে গো
 সে পথ চিন্হিত নারি ।

কহে পথচারী শ্রম হ'ল তব মিছে
 দক্ষিণেশ্বর ? সে তো ফেলে এল পিছনে
 এই বাঁল ভারে হাসি কুতূহলী
 দেখাইলো পথ তুলি অঙ্গুলি
 অদূরেতে হুঁকি শিশারী ইশারা
 পথ দেখেই শিহরিছে ।

সেই দিশা ধরি চাঁপল তরুণ রাহী
 দাঁখনন্দর পানে
 দিবস তখন দ্বিতীর প্রহর
 আতপু বাট দীপ্ত প্রথর
 সুন্দর গলনে শেষ বিভাবসু সপ্তরশ্মি টানে ।
 ভবতারিণীর সেউল ভোরণে পড়েছিল হবে রাহী
 অদিশ দিশার হারানো সে পথ বাহি
 শুক সারঙে সুর সলোপ
 বাজে নবকণ্ঠে মধুর আলাপ
 সুন্দরলী বৃকে উছালি উঠিয়ে
 আনন্দে অবগাহি ।

পাঁথের পেছ প্রাচীতে পড়ে ভাসি
 তবু আঁখিপাতে কি যে আশা ওঠে রাত

ভাবমুখে

[ষষ্ঠাংশ বর্ষ : সপ্তম সংখ্যা]

শ্মশন বিগলিত ললাটের তলে
 তারি ছায়া বেন নীরবেই সেলে
 জুড়িতে অর জুটে এল বারু খুঁজিয়া শীকর মূর্তি ।
 ঘর্মকি বারেক দাঁড়ালো তরুণ রূপ
 দুর্দশাল প্রাক্ষণে
 হেরিয়া জনেক সেউল মেহক
 গভীর আকৃতি মুটে ওঠে চোখে
 কহিল বধু এনেছি যে আমি
 প্রীতকুর দরশনে ।

পার্বকি তঁহারে হেন অসম্মরে ?
 বহুশ্রম লাভি হার
 এনেছি যে এই পরমতীর্থ ছায়
 দেউল সেবক কহিল এখন
 কেমনে মিঞ্জিব তাঁর দরশন
 তিন তো পেছন কলিকাতা কোন ভক্তের আভিমান ।

নাহি কো দেবতা ? শূন্য সেউল তবে ।
 এত প্রমে এসে ফিরিয়া যেতে কি হবে !
 পাঁথকের ম্মরে আকুল হতান্দা
 শূন্যলো, নাহি কি দরশন আশা
 কহিল সেবক, ফিরিবেন তিন
 রাত্টি নিশীথ হবে ।

নিবিড় নিরাশে শ্রান্ত জুগুণ পথী
 দূ করে ললাট চাঁপি
 বসে পড়ে হায় দীর্ঘ সোপানে
 সারাটি শ্রম হতানন্দ ভাগে
 সে বারুদ নাহি মিশ্র গ্রীকর জুড়াইতে নায়ে নাকি ।

বটক তলে মন্দির হুনি কোকিলের কলালাপ
 মনে হয় বেন বেকনার সংখ্যাপ
 স্নাত্ত শৈবাঁ হারাক্ষেই দিশা
 মরমেতে বেন মরুমারা মিশা
 একক্ষণে বেন আতপু শিরে লাগিছে আতপ তাপ ।

সহসা পাঁচালো আর এক তরুণ পল্লী
ভবতারিণীর দেউলে আনারে নীতি
দৌঁধা পানে ধুঁধু চাহি কপতরে
বাঁধা পড়ে যেন ক্রমের ডোরে
ভুলে গেল যেন দূর পথ বাওরা অসের শ্রম কর্তি ।
নবাগত রাহী শূঁখালো মধুর ভাবে

প্ৰদীপ পথিকটিরে
কোথা হতে ভাই তব আগমন
কার ল্যাম হেথা কস আনমন
কি নাম তোমার কি বা পরিচর ?
কহিল তরুণ বীরে ।

নিবাস আমার আধিরাতোলায়
গ্রীকালিপ্রসাদ নাম
কড় আশা ল'রে এসেছি পূঁখা ধাম ।
শুনোছি হেথার বোণারি প্রেষ্ঠ
গ্রীকাময়ক স্বে বীরেষ্ঠ
মিলান মানবে পরম যোগের
শাখত সম্ভান ।

বাননা আমার যোগের সিঁড়ি তাই
জঁর কাছে ছুটে এসেছি হেথার ভাই
কিন্তু আমার এখনি ললাট
রুদ্ধ যে সোখি ফেউল কপাট
হয়তো কিসল বেতে হবে ফিরে
দেখা যে হেথা নাই !

নবাগত রাহী কহে সান্ধা সুরে
যে পুথর সম্ভানী
সে পুথ এখনি অনেক যে বাবা
প্যারে প্যারে আছে বালো আর অঁধা
সে পুথ করিক ডেউ পড়া ভাই
চলে না তো কহু জানি ।

ভেবোনা বণ্ড এইটুকু জেনে
এসেছো বাহার কাছে
তোমার বা চাওরা তারি হাতে সবই আছে ।

গ্রীকালিপ্রসাদ কিনরে
রই তব কস সেই আশা ল'রে
জানিনা তোমার কিবা পরিচর
দিলে আশা মন মাঝে ।

তরুণ পথিক কহে মোর পরিচর
জানিবার মত এমন কিছই নয়
শশী মোর নাম প্রভুর সেরক
এই পরিচরই সার্থক হোক
ভিখারীর মত এসেছি এ ঘারে
নাহি কিছু সজ্ঞ ।

কুণ্ড সাংক ছিলেন জনক মোর
তাহারি সূক্ষ্ম লতি
পেরেছি লীখনে এমন দিশারী
ভব সাগরের চির কাঁজারী
দিগেছি যে ভালি তাহারি চরণে
জানি মরণ সাঁব ।

বলিতে বলিতে স্মৃতির পাতাটি
আলগোছে বার খুঁলে
শশীকৃষ্ণের মনে পড়ে যায়
কবে আসা পথ ভুলে
সে কথা তারিবা চোখে আসে জল
গাড় ভক্তিত্তে করে টেমল
মনে পড়ে সেই প্রথম মরণ এই সূত্রধনী ফুলে ।

সে যে গো প্রভুর মরণী সেবক
প্রথম মরণে মরি
তাই তো গ্রীকু উলসিত তারে হেরি ।
জেনা অফনার শূঁত সজমে
দৌঁধা পানে ধুঁধু চাহি মনে মনে
কি যে ভেবেছিল কেহ নাহি জানে
উঠেছিল হিরা তরি ।

এই শশী মনে হ'ত গ্রীকু
কুণ্ড কথা কর্তাকি
সে কবার মনে যোকে নাই কেহ

বোকাইন শলীর কেন এত স্নেহ
ভক্ত ও ভগবানের ভাব যে দৃষ্টি থাকে দৃষ্টি লীন ।

চিহ্নিত জনে যে কথা বহেন

সে কথা তো কারো নয়
কহিতেন প্রভু, ত্যাগী ভক্তের

পক্ষ যে ভিন্ন হয়

তার উপদেশ নিগূঢ় ভক্ত

গৃহী জনে তার বোকে না অর্থ

অভয় বহিরসের দৃষ্টি থাকে কোনো রস ।

তাই তো শলীর কহিতেন প্রভু বীরে

এসো একা একা এসো নাকো এত ভিড়ে

ধর্মের পক্ষ নিকৃত নিজন

উপদেশ তার গভীর গহন

পরমার্থে সে তবু শব্দ বলা যায় মরমীরে ।

আরো শোন এক অসহ নিদাঘ ফোলা

বাহিয়া তপ্ত পক্ষ

এসেছিল শলী রিত চরণে

গামছার বাঁধা পরম বতনে

প্রীতকূর লাগি মিঠানি করত পুরাইতে মনোরথ ।

এক ছোট্ট জলও গর্জনি করত

এরনি বহন চাকি

এসেছিল শলী, সারাটি হিরায় নব অনুরাগে মাখ

হেঁর সেক্ষেপ সে অনুরাগ

প্রীতকূর মনে জেগেছে তৃপ্ত

তবু ভক্তের ভ্রম হেঁর তাঁর সম্মল হয়েছে আঁখি ।

শ্বেদ স্নিগ্ধ সেবক অর পর

বুলায়ে বহন মিশ্র শব্দ কর

কহিয়াছিলেন এই বৃন্দারে

কেন এলি কল এত ভ্রম ভরে

শব্দানো ও শব্দ হেঁরিরে বেগনে

ভরে গুঠে অস্তর ।

শব্দ হাসি শলী করোঁছিল প্রভু

এ ভ্রম তুমি আঁখি

নিদাঘের স্বর তপ্ত কোলা

মিঠানি করত নির্বোধ ভোমার

জুড়াইব তব আত্ম নহন

হবে নাকো কোন কর্তা ।

তারপর সেই তুমার খণ্ড সিরোঁছিল প্রভু হাতে

উল্কাগুলি শলী জেগে গুঠে আঁখি পাতে

হেঁর সে মিঠোল নিবেদন বানি

ফুটিল প্রভুর কোঁচুক বাণী

শুনোঁছি বাহারো কুপল তামরে

পলে নাকো জল হাতে ।

তারও মিঠানি করত গর্জনি জল

তবু তুই দাড়া একি বিপরীত ফল

হোসেঁছিল শলী মিঠে কোঁচুক

মিঠানি করত তুলি প্রভু মূখে

মিঠারে ছিলেন সেবার বাসনা

করি কত গীলা হল ।

সেই শলী আজ কালীপ্রসাদের সনে

প্রভু প্রসঙ্গে হ'ল তন্দর

হয় নাকো মনে নব পরিচয়

কেটে গেল কল কাটিল গ্রহ

অনন্দ আলোপনে ।

কালীপ্রসাদ নির্মল মূখে

শুনোঁছে প্রভুর কথা

হেঁরছে শলীর ভকতি তন্দরতা

গভীর ইচ্ছা আরো শব্দভীর

ডাকে যেন তারে আরো শুনোঁকি

মনে হয় হেঁখা পব পায়ে তার

জীৱনের আবুলতা ।

হবে সার্থক সারা জনসের

অকুলেতে কুল খোঁজা

দীর্ঘ চোরে বিরতির মাঝে

বে শব্দ সে বাকি এখানেই আছে

এই বক্তব্যে মিলবে শান্তি

নামালে বক্তের বোকা ।

ত্রিশ্রীভবতারিণী নৈতিআলেখ্য

বামী বোধানন্দ

‘কালোবুপ তো অনেক আছে। কিন্তু এ যে বড়ো আশ্চর্য্য কালো!’ এই কালোবুপে যে লাজ পেয়েছে লজ চাঁসের আলো। বুগে বুগে কাল কালো কালোমেয়ের আলো করা বুপ-সাগরের অত্যাশ্চর্য্য ভুব দিয়ে কত অবতার, কত সন্তান, কত ভাবসাঁধিকা প্রেমরঞ্জন পেরিয়েছেন।

—গীত—

কালো বলা হয় কি বলা
ঠিকরে পড়া বুপের আলোর
বিস্তৃত্বন করালি আলো।
রামপ্রসাদের কেঁদার ছলে
গান বেঁধে যে গেঁছিস চলে
আবার রামকৃষ্ণ চোপের ছলে
করালি কত দলহলো।
বায়ার বুকে তুই তো কালো

গোরার বুকে হালি আলো
সন্তানের অশ্রুমে
কতই বুপে বাসিস্ ভালো।
বুগে বুগে এসেছিস যে
বুকে আমার তুলে নিতে
চোখের জলে গেঁছিস্ ত্রিত
এমন চোখ ভরা বুপ কোথায় হলো।

—সত্যানন্দ

দক্ষিণেশ্বরী ভবতারিণী ভবভরহাবিণী আছেন দাঁড়িয়ে—চিনমনে করুণা-নির্ভর—আলোছায়ার মন্দির করছে ধ্বংস—চক্ৰবর্তন বিহীন ঘেন কথার আকুল—আকুল কালো চোখে বেন রয়েছেন পথচরে। সহসা এসে দাঁড়ান ভাব গরুর গীতাকুর—মা’র মুখ চাওয়া ছেলে এসেই একান্ত আকৃষ্টিত জানান অজ্ঞের প্রার্থনা—আর মাও দেন সম্মতি—সঙ্গে সঙ্গে চলেন ডেমনি বেপখু পদে—ফিরে যান গলাতীরের চাঁদনিইত, যেখানে দাঁড়িয়ে জটাগুলি এক দীর্ঘরিত পুরুষ—প্রণামান্তে জানান মা’র অনুমতি। ইনিই পরমহংস গীতক তোতাপুত্রী। শ্রীরামকৃষ্ণের অবৈত শিক্ষা হ’ল তাঁর সম্যাসংগ্ৰহ ঐ তোতাপুত্রীজীর সান্নিধ্যে। পরিত্রাঙ্ক পুত্রীজীর তিনদিন দক্ষিণেশ্বরে থাকার ছিল ইচ্ছা, কিন্তু দীর্ঘ এগার মাস হ’য়ে গেল—আশ্চর্য্য শিবা শ্রীরামকৃষ্ণের দিবা আকর্ষণে। এদিকে তোতাপুত্রীজীর যোগনিষ্ঠ দৃঢ় শরীর বাংলার জল বাওয়ার হয়ে পড়ে কাতর—সেই অতিদার রোগের হ’ল সৃষ্টি—সমাধির সন্তুষ্টি মনকে আর বার না রাখা—বার বার নেমে আসে মায়ার রাজ্যে, সেই গিজের, পলকভের ফাঁদে—অনেকদিনের চেষ্টাতেও বন্ধন হয়ে পড়েন অক্ষম, তখন পুরুষ-সিদ্ধ দেহকে চান গলাগত’ কিসক’ন দিতে। জগতে যে মায়ার খেলা কিছু থাকতে পারে, ‘সাবাস মা দক্ষিণা কালী, কুব্জলক্ষ্মী লাগিয়ে দিল’ ব’লে মহামায়ার খেলা থাকতে পারে, এ বিশ্বের তোতাপুত্রীজী ছিলেন প্রায় অনাভিন্ন। ভবতারিণীর কথা, শক্তির কথা শুনে পুত্রীজী হতেন রহস্য অধী—ব্রহ্মজ্ঞানের গম্ভীর, ঠাকুরের মুখে নাম করা শুনে বলতেন—আরে কাছে রোটি টোকতে হো? ভক্তি পথ—ভগবানকে আপন হ’তে আপনার করে নেওয়ার পথ যে সম্ভব, এ বিশ্বের তাঁর জ্ঞানসোনা ছিল একান্ত অল্প—তিনি শূন্য জ্ঞানভেদ শাভ ভাবে স্ব স্বরূপে থাকা—কিন্তু ইন্দ্রও যে মায়ার রাজ্যে মায়াবীশ—এ বিজ্ঞান আশ্রয় তাঁর জন্মানা। কিন্তু সে পরিচয়ের দিন যে এসে গেল—ব্রহ্ম এসে পড়েছেন মহামায়ার বাসভাস্ককে—গীতকিণবধরে।

রাতি তখন নিশা, নিশা—সেই অন্ধকার নির্বণে নিজেই বিলুপ্ত করতে তাই গলাগত’ চলেছেন জ্ঞাত

প্ৰহ্ম জ্যোতপ্ৰসূতি। সহসা তার অন্তর মণ্ডিত করে জাগে এক আত্মা নিরঞ্জন—এক মায়ী! অশাখ গঙ্গা আচ্ছন্ন কর্ছনি! তুহে দাবার মত জলও নাই গঙ্গার বুকে?—প্রায় পরপারে এসে পড়েন, তবু জান্ পৰ্ব্বত হয়ে গেছে জলত্যাগী..... সহসা সেই অৰূপ হয়ে ওঠে রূপায়িত। জাগেন মহামাতৃকা...সৃষ্টি স্থিতি সংহারকারিণী ভবতারিণী! এঁকি অপৰূপ রূপ মরি!

তোতাপ্ৰসূতির পূর্ণাভিব্যেক হল কালী-রম্বম্বেশ। রহস্যময়ীর অথরে ঘেহকরুণা ঠিকরে পড়ে। চিন্ময়ী ভবতারিণীর দর্শন পেয়ে, শ্যামসমী মায়ের কোলে উঠে ছেলে জ্যোতপ্ৰসূতির নরনে 'নামে অকুরান শান্তি, অসীম আনন্দ'; অ্যসেন নবজীবনের বাণী নিয়ে। কণ্ঠে তার জলদস্যুর নাম। গভীর অম্বা ভবানী ধ্বনিতো গঙ্গাগর্ভ' মূচ্ছর হয়ে ওঠে।—

—গীত—

মাইয়া কহো মাইয়া কহো
মাইয়া কহো প্রাণরে
আশ্বেশ্বরা মে জলনা নৌহি
মিলনা পুরা শানরে।
মাইয়া কহো
কালী কালী ঘটোঘন
চাহেনা আসান্ রে।
মাইয়া কহো.....
চলতি দেখো গঙ্গাধারা
জানে না ধকান্ রে

মাইয়া কহো.....
বিশ্বাস ঠুর ভরি গেনা
চলনা রে ইন্দ্রশান রে
মাইয়া কহী'
চলনানৈহী দূর কহী'
হোনা প্ৰবেশানরে।

মাইয়া কহো.....

মাইয়া কহো

—সজানন্দ

(ভদ্রনাথ)

—১০৫—

গান

ঐশ্বর্যপূরী

সে কথা বাইনি কুলে
এ তন্দু আমার ছুব দিগ্ৰোহলে
কুক সাগর কুলে
সে পদ শব্দ জাগি
ছিল মন অনুরাগী
নরনে নীরব ভাষা
পরান উঠিত দুঙ্গে—
উজল সাগর হাওয়া
সমুখে করিত খেলা

কিন্দে কুড়ারে বেত
কত না পাটল বেলা
মালায় ছিন্ন ফুল
করিত সিঁথির মূলে
আকাশের চাঁপ জলে
আসিত গো কুতুমলে
মহু নিয়ে মধু চোয়
কেঁদাত বে হলে হলে।

অবধূত ও চব্বিশ গুরু

হামী শিবানন্দ

যশে কুমার সুরেশ্বর স্বর্গীয়সকলনে কারণে সম্মানিত

শ্বেতাচার্য কৃপাচরণ গঙ্গানন্দসহিত বোম্বাইয়ে বোম্বাইয়ে

স্বাভাৱিক সত্য হইয়াছে বোম্বাইয়ে বোম্বাইয়ে

ভাৱ্যনিঃ সুরেশ্বর নবনন্দসহিত দেবকীনন্দন প্রমুখ—গতগীতা

যিনি দেবপ্রদান, সকল জীবের স্বর্গীয়সকলনে কারণে সম্মানিত, ইচ্ছানন্দ, সত্ত্বজনমোগ্যসহিত, বোম্বাইয়ের ধ্যানমগ্ন ; স্বর্গ দৃষ্টান্তসহিত, সত্ত্বজনের আশ্রয়, শিব প্রভৃতি সত্ত্বজন কর্তৃক দেবিত, জ্ঞানস্বরূপ, ভক্ত-প্রিয়, পরমেশ্বর, নবনন্দ সত্ত্ব, সেই প্রসিদ্ধ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম ।

মহাত্ম্যের মধ্যে যেমন 'গীতা', সেখানে যেমন শ্রীভগবান প্রিয় সবা অমর্যুত উপদেশ করিয়া সমস্ত বিশ্বকে পরমানন্দ লাভের বোম্বাইয়ে, সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে 'উদ্ব-গীতা', সেখানে শ্রীভগবান পরমভক্ত উদ্বাহক উপদেশ করিয়া বিশ্ববাসীকে পরমভক্তের অনুসন্ধানের পথনির্দেশ করিয়াছেন । শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায় হ'তে নবম অধ্যায় পর্যন্ত উদ্বাহক দ্বারা প্রিয়সহিত শ্রীভগবান উপদেশ মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে অবশেষে উপাখ্যান আরম্ভ করিয়াছেন । অবধূত জ্ঞান চম্পক গুরু, নিকট হইতে যে সমস্ত শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাই এখানে বিবৃত করা হইতেছে । এখানে উল্লিখিত অবধূত অন্য কেহ নহেন, সত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞানী মহাত্ম্যে । বর্ষ অষ্টম পুত্র । কেশবের পঞ্চম মন্ডলের বর্ষ অষ্টম । কুটীচক, বহুদক, হংস, পরমহংস, তুরীয়াতীত ও অবধূত—এই ছয় প্রকার সমাধার মধ্যে সর্বোচ্চ অবস্থার স্থিত অবধূত । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কথামতে অবধূত ও চম্পক গুরুর উল্লেখ করিয়াছেন । চম্পক গুরু কহারা ও কি শিক্ষা দিয়াছেন ইহা জানার জন্য এই লেখা । রাজর্ষি-শ্রেষ্ঠ স্বর্গ অবধূত মহাত্ম্যের অলোকন করিয়া বিজ্ঞানী করিয়াছিলেন—হে ব্রহ্মণ ! আপনি অকর্তৃব্যক্তি লাভ করিয়া প্রজ্ঞাবান হইয়া বাগবতের নাম সংগ্ৰহে বিচরণ করিতেছেন । আপনি সমর্থ, বিদ্বান, সকল কার্যে নিপুণ, স্বর্গের সুস্থগণের, মিত্রস্বামী সত্ত্ব হইয়াও সাধারণ মানবের ন্যায় আচরণ না করিয়া ক্ষুদ্র উন্নত পিতার তুলা অবস্থান করিতেছেন ।

ভৃগুশাস্ত্র মনুস্মৃতি কাম-সোভরণ দ্বাব্যায় দ্বারা নিরত দন্দীভূত হইতেছেন । আর আপনি মহাসম্মানে অবস্থিত হস্তীর সদৃশ কামাদি আশ্রয় হইতে মুক্ত হইয়া বিদ্বৎসত্ত্ব সত্ত্ব ভোগ করিতেছেন না । বিশ্বভোগ স্বর্গ বিলম্বিত, বিদ্বৎ চিত্ত আপনার ক্রমোন্নতির আনন্দের স্থিতির কারণ কি ?

অবধূত কহিলেন,—হে রাজর্ষি ! যে চম্পকজন গুরু, নিকট শিক্ষালাভ করিয়া আধ্যাত্মিক, আধ্যাত্মিক ও আধ্যাত্মিক ভোগের হইতে বিমুক্ত হইয়া আশ্রয় পৃথিবীতে পরমানন্দে বিচরণ করিতেছেন, সেই গুরুগণের বিদ্বৎ শুনুন । এ প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার যে শিক্ষাদেয়, অনেক হইতে পারেন, কিন্তু শিক্ষাদেয়ই একজনই হন । এখানে প্রত্যেকের প্রতি গুরুগণ বর্ণনা করিয়া তাহা হইতে বাহ্য শিক্ষা পাওয়া সত্ত্ব তাহাই আলোচিত হইবে ।

স্বর্গ—আপনি পৃথিবীর নিকট কি শিক্ষা করিয়াছেন ?

মহাত্ম্য—পৃথিবী ভূতাত্ত্বিক । মানব পৃথিবীর উপর মনুষ্য ভোগ, ক্ষেত্র করণ, বিচারন দ্বন আদি কত প্রকার অত্যাচার প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, তাহা পৃথিবী সম্মানিত । অবশ্যে তাহা সত্ত্ব করিতেছেন ও সত্ত্বকে কমা

করিয়াছেন। তখন ধীরে প্রস্তুত হইয়া প্রস্তুত প্রাণীকে কৃত্রিম অত্যাচারাদি দৈবকণ উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া ধর্মপন্থ হইতে বিচলিত হন না। আমি এই ক্ষমাদ্বয় পৃথিবীর নিকট হইতে শিখায়াছি।

স্ব—আপনি বারু হইতে কি শিখিয়াছেন ?

দত্তাশ্রয়—প্রাণবান্ধব ও বাহ্যবান্ধব ভেদে বান্ধব দুই প্রকার। প্রাণবান্ধব অন্য আহারের প্রয়োজন ; ইন্দ্রিয়ের ভূমিকার আহার করা যোগ্যগণের উচিত নহে। ঐশ্বর্যের মত ভোজন করিতে হয়। সে ভোজন সত্যিকার প্রবাহী করা উচিত। ভোজন ভোগ করা কৰ্তব্য নহে, তাহাতে চিত্ত ব্যাকুল হইতে পারে। মায় দেহরক্ষার জন্য আহার করা কৰ্তব্য। ইহা প্রাণবান্ধব নিকট শিখণীয়। প্রাণবান্ধব মায় দেহরক্ষার উপযোগী বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

বাহ্যবান্ধব নিকট বিষয়ের সেবা করিয়া তাহাতে অনাসক্ত থাকিতে হয়—ইহাই শিক্ষা করিয়াছি। জল অনল সংঘর্ষে দুইটি বস্তু বান্ধব প্রবাহমান হইয়াও কাহারও সহিত সংশ্লিষ্ট হয় না। এইরূপ যোগ্যগণ সর্বত্র প্রমত্ত করিয়াও কাহারও সহিত মিলিত হইবেন না এবং বান্ধব ন্যায় দেহবান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবেন। অর্থাৎ অহংকার হইতে আত্মাকে পৃথকভাবে দর্শন করিতে হইবে।

স্ব—আপনি আকাশের নিকট কি শিখিয়াছেন ?

দত্তাশ্রয়—স্বর্গব্যাপক ও নিম্নসত্তা আকাশগত, আমার শিক্ষা দিয়াছেন। আকাশ দেখিয়া আমি পরমাশ্রয় ধারণা করিতে শিখিয়াছি। আকাশ যেমন সকলের অস্তরে বাহিরে বস্তুমান থাকিয়াও সঙ্গতহিত,—এইরূপ পরমাশ্রয়ও সকলের বাহ্য অত্যাচার নিরত বিদ্যমান। তাহার দ্বারা ইহা জগৎ সমাচ্ছন্ন হইলেও তিনি সঙ্গতহিত। ঘটাধীন মতাধীন জ্ঞাতাশ্রয় মেঘাকাস এইরূপ আকাশের উপাধিযোগে নানা নাম হইলেও আকাশ যেমন পরিচ্ছন্ন হয় না, তদ্রূপ সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাশ্রয় স্বর্গত পরিচ্ছন্ন থাকিয়াও কাহারও সহিত লিপ্ত নহেন। সমস্ত ব্যাপ্যগণ সত্তা বস্তুমান—এ শিক্ষা আমি আকাশের নিকট পাইয়াছি। আরও আকাশ যেমন বান্ধব চালাত মেঘের দ্বারা সংশ্লিষ্ট হন না, তদ্রূপ কালবন্ত গুণ, কাৰ্য্য, তেজ, জল ও পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের দ্বারা পরমাশ্রয় সংশ্লিষ্ট হন না—এ শিক্ষাও আকাশ গত হইতে করিয়াছি।

স্ব—আপনি জলের নিকট কি শিখিয়াছেন ?

দত্তাশ্রয়—তীর্থ জল যেইরূপ স্বভাবতঃ স্নেহ ও মনুষ্য-মিত্র, স্নেহের ভূমিকার, যতই তাপিত হউক না কেন জলে অবগাহনে, জলপানে তাহার সে তাপ শাস্তি হয়, মনুষ্যলাপী সাধুগণেরও জলের মত পথিকের হইয়া দর্শন পল্লব কীর্তনের দ্বারা জগৎ পবিত্র করা বিধে। জলের মত তাপ শাস্তি করা অংশ বস্তুবা—ইহা জলের কাছে শিক্ষা করিয়াছি।

স্ব—আপনি অগ্নির নিকট কি শিখিয়াছেন ?

দত্তাশ্রয়—অগ্নিগত আমার অকোভাভা, যথালোকে স্নেহ, অকোভার কৌশল, অকম্পন শিখাইয়াছেন। স্বচ্ছ ভোজনে স্বচ্ছ ভক্ষণ অগ্নি যেমন জলপিত্ত হন না, সেইরূপ অকোভার পরিগ্রহ-পরিচর্যা মন প্রত্যক্ষক যিনি বান্ধব, তাহা গ্রহণ করিয়া পাপী হন না। অগ্নি যেমন কামের মধ্যে থাকেন, মথন করিলে প্রকাশিত হন, সেইরূপ শ্রীভগবান জগৎ প্রসবকালে আসেন। প্রথম কীর্তনাদি ভক্তের দ্বারা তিনি প্রীত হইয়া দর্শন দেন। কিন্তু ভগবান আপনার দ্বারা দ্বারা সৃষ্ট দেব ভক্তের বিগ্রহ শূন্য আমি সকল প্রাণীতে স্বচ্ছসরূপে বিগ্রহ করেন। অগ্নিগত, ইহা আমার শিখাইয়াছেন। আরও—যেমন অগ্নির শিখা সমুদ্রে উপস্থিত বিনাশ হয়, অগ্নির নহে, সেইরূপ প্রবল বান্ধবকোভা কালবন্তে যেহেতুই ক্ষম মরণ হয়—আত্মার নহে, ইহাও শিখিয়াছি।

স্ব—আপনি চন্দ্রের নিকট কি শিখিয়াছেন ?

দত্তাশ্রয়—শুভ্রা প্রতিপল হইতে এক একটা কলাবৃদ্ধি হইয়া পূর্ণিমা হর—পূনরার কলা প্রতিপল হইতে ১৫ দিনের পূনরটা কলার কল হইলে চন্দ্রক সেবা যায় না—কিন্তু তাহার অনান্যই মহাকলার কল বা বৃদ্ধি কোন কালে হয় না, সম্ভবা একভাবে থাকেন। তদুপ আত্মা অমা কলার ন্যায় হ্রাস বৃদ্ধি, গ্রন্থ মগ্ন আদি শূন্য। উপাস্তি কিশাশ দেহেরই হইয়া থাকে। চন্দ্র আমার তাহার কলার কলবৃদ্ধি দেখাইয়া দেহের কলবৃদ্ধির কথা শিখাইয়াছেন।

বদ—আপনি সূর্যের কাছে কি শিক্ষা করিয়াছেন ?

দত্তাশ্রয়—সূর্য পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ পূর্বক যথাকালে তাহা বর্ষণ করেন ! রসগ্রহণে বা তাগে তাহার কোনরূপ আসক্তি নাই, তদুপ যোগিলগণও বিষয়দকল গ্রহণ ও যথাকালে প্রাপ্ত আসিলে দান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে আসক্ত হন না।

বহুজলপূর্ণ পাশ্রে যেমন একমাগ সূর্য বহুপূর্ণে স্থলবর্তি মানবগণের নিকম দৃষ্ট হন, তদুপ একমাগ আত্মা উপাধিকৃত অর্থাৎ সেব মনুষ্য পদ পক্ষী কীট পতঙ্গ, বৃকলতা প্রকৃতি বহু উপাধিযোগে বহুপূর্ণে প্রতিভাত হন। সূর্যের মত আত্মাও একমাগ। সূর্য গৃহ আমার পরমাত্মা একমাগ—ইহা শিক্ষা দিয়াছেন।

বদ—কপোতের নিকট কি শিক্ষা লাভ করিয়াছেন ?

দত্তাশ্রয়—সন্ধানগণের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিলে প্রাণিগণের বিবেক লেগমাত্র থাকে না ; সন্ধান-স্নেহে ভীষ অনারাসে আত্মবিসর্জন করে—এ শিক্ষা আমার কপোতগৃহ দিয়াছেন।

বদ—অঙ্গার গৃহের নিকট কি শিক্ষা করিয়াছেন ?

দত্তাশ্রয়—অঙ্গার আহারের জন্য কোন চেষ্টা করে না—একস্থানে পড়িয়া থাকে। সৈকলে তাহার সম্মুখে বাহা উপাধিত হয়, তৎস্বারা জীবন রক্ষা করে। যত্নের কষ্ট বা অঙ্গার বৃদ্ধি অবশ্যন করা, অংশ বা প্রচুর, স্নান, কিংবা বিরস আহার্য বাহা উপাধিত হইবে, তাহা স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম। আহার যদি না উপাধিত হয়, প্রারম্ভই আহারের প্রতিক্রমকের কারণ ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়া উদ্যম বিরহিত অনাহারী হইয়া বহুদিন শায়িত থাকিলে, সামর্থ্য থাকিলেও কোন চেষ্টা না করিয়া বীতানন্দ হইয়া পরমাত্মা চিন্তায় মানব জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিলে। অঙ্গার গৃহের কাছে আহারের জন্য নিশ্চেষ্টতা শিক্ষা করিয়াছি।

বদ—সমুদ্রের কাছে কি শিক্ষা করিয়াছেন ?

দত্তাশ্রয়—প্রশান্ত সলিল-সাগরের ন্যায় মূনি বাহিরে প্রশান্ত ও অস্তুর গম্ভীর হইবেন। বর্ষাকালে নদীসমূহের জল সাগরে আসিয়া মিলিত হইলে সাগর যেমন স্ফীত অথবা গ্রাস্তিকালে জলাভাবে শূন্য হর না, তদুপ মূনি প্রারম্ভকালে সম্মিলিতোক্ত স্ফীত অথবা তাহার অভাবে শূন্য হইবেন না—ইহা সমুদ্র গৃহের শিক্ষা দিয়াছেন।

বদ—আপনি পশুর কাছে কি শিক্ষা করিয়াছেন ?

দত্তাশ্রয়—অশ্ব প্রজাতিত হইলে পশু তাহাতে পতিত হইয়া জীবন বিসর্জন দেয়। কন্যা-মূলের আকর্ষণে অজ্ঞাতোপদ্রব মানবকুল আত্মবিসর্জন করে। 'রক্ষণীতে হিরণ্য-আভরণবসনাদি পদার্থসমূহে উপভোগ বৃদ্ধির দ্বারা আসক্তাচিত, লুপ্ত বিবেক, মত বাস্ত পশুর ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে। মূনির রূপ হইতে সজ্ঞত দূরে থাকি কষ্ট বা—আমার পশুগৃহ ইহা শিক্ষা দিয়াছেন।

বদ—মৎস্যের কাছে কি শিক্ষা করিয়াছেন ?

দত্তাশ্রয়—মৎস্যর যেমন নানাবিধ পূর্ণ হইতে মৎস্যপান করিয়া জীবন রক্ষা করে, মূনি গৃহগণক পান না করিয়া মাত্র দেহরক্ষার জন্য সপ্ত গৃহ হইতে ভক্ষ্য সমগ্র করিবেন, যথাত গৃহস্থের প্রভাবভিত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া একজনের নিকট ভোজন করিবেন না। তাহা হইলে সোমকল বদ্ধ হইবেন। নানা স্থান হইতে ভিক্ষা এবং পূর্ণ হইতে সার গ্রহণের

ন্যায় ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতে সার সংগ্রহ ও হাতে বা উত্তরে বস্তুকৃত্রের তাহাই সংগ্রহ করা কর্তব্য—ইহাই শ্রমগুরু আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন।

বদ্—গল্পগুরু আপনাকে কি শিক্ষা দিয়াছেন ?

দত্তাশ্রম—বিবেকী পুত্র কখন নারীতে ভোগ্য বৃত্তিতে আসক্ত হইবেন না। নারীকে আপনার মৃত্যুদ্রাব্যই দেখিবেন, তাহাতে আসক্ত হইলে যেমন কলহান হাতী হস্তিনীতে আসক্ত অন্য হস্তিনীতে বিনাশ করে, তদ্রূপংলশালী অন্য পুত্র নারীতে আসক্ত সেই পুত্রকে বিনাশ করিয়া থাকে। মাসেমণী বৃত্তী তো পুত্রের কথা কাক্ষের ন্তী মতি পুত্রের ধারাও মূনির স্পর্শ করা কোনরূপে উচিত নহে—গল্পগুরু ইহাই আমার শিক্ষা দিয়াছেন।

বদ্—মৎস্যর গুরু আপনাকে কি শিক্ষা দিয়াছেন ?

দত্তাশ্রম—অর্থপাশ্চান্ন ধারা সংকাবেঁর অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। যে কাষ্ঠ তাহা না করিয়া সস্ত্র করে, তাহার অর্থ তাহাকে বিনষ্টকরত অপূরে ভোগ করিয়া থাকে। মৎস্যরূপ কতকষ্টে সুগুপ্তস্থানে মৎস্য নির্মাণ ও মৎস্য সস্ত্র করিয়া থকা করে, আর অপর কাষ্ঠ আসিয়া মৎস্যরের প্রাণ বিনাশপুষ্কিত বদ্—আহরণ করিয়া থাকে। কদাচ সস্ত্র করা উচিত নহে—মৎস্যর গুরু ইহা শিক্ষা দিয়াছেন।

বদ্—আপনার হরিণগুরু কি শিক্ষা দিয়াছেন ?

দত্তাশ্রম—ব্যাঘ্রের বশীর সুরে আকৃষ্ট হইয়া যেমন নলে নলে হরিণগণ আসে ও তাহার জালে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ হারায়, তেমনি গ্রাম্য নৃত্য-গীতবাদ্যাদির আকর্ষণে মৃগীসত্ত্ব কব্যাশ্রম রমনীকণের কীড়াপুতুল হইয়াছিলেন। এইজন্য বনজ হরিণগণের গ্রাম্য গীতাদি শ্রবণ করা কর্তব্য নহে। ইহাই শিক্ষা।

বদ্—অগ্নেয় র নিকট কি শিক্ষা দিয়াছেন ?

দত্তাশ্রম—মানব কলুষীতে আমিষ গাঁজিয়া মনসা বহিষ্যত জনা জলে নিষ্কপ করে। মনসা আর্দ্রকের লোভে কলুষী গাঁজিয়া প্রাণ হারায়, তদ্রূপ অগ্নের লোভে মানব জীবন কলুষিত হয়। দশটী ইন্দ্রিয়ের মধ্যে রসনাই অতি ভীষণ। রসনার রূপেপিত্ত, বায়ুপিত্ত, স্পৃশ্যপিত্ত তিনটি ইন্দ্রিয় আছে! অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয় জর করিয়া মানব যাবৎ রসনাকে জর করিতে না পারে, তাবৎ জিহবেঁর হইতে পারে না। আত্মকলাপকামী মানবের দম্বপ্রথমে রসনাকে জর করা কর্তব্য। রসায়ণি যে মৃত্যুর কারণ, তাহা আমি মৎস্যর নিকট শিক্ষা।

বদ্—কুরুর পক্ষীর কাছে আপনি কি শিক্ষা দিয়াছেন ?

দত্তাশ্রম—কোন দিন সৌখ্যল্যম্ একটা দুঃখ কুরুর পক্ষী একখণ্ড মাংস লইয়া উড়িয়া বাইতেছে। আমিষাবী কলহান অন্য কুরুর পক্ষী তাহাকে মারিয়া আমিষ কাড়িয়া লইবার জন্য তাহাকে আক্রমণ করিল। দুঃখ কুরুর প্রাণরক্ষার জন্য যেমন আমিষ খণ্ড পরিভোগ করিল, অর্থাৎ কলহান কুরুর তাহাকে ভোগ করিয়া চলিয়া গেল। বিধে আসক্তিই মৃত্যুর কারণ—কুরুর গুরুর নিকট শিক্ষা।

বদ্—বালকগুরুর নিকট কি শিক্ষা দিয়াছেন ?

দত্তাশ্রম—বালকের কুরুর ইন্দ্রিয়ের প্রভাব না থাকায় সত্ত্বাদিগুণের বিকাশ বা উজ্জ্বল কোন কোন হইতে পারে না : বালক সত্ত্ব নিষ্কলঙ্কভাবে জানে-অবস্থান করে। নিশ্চেষ্টে বালক ও ইন্দ্রিয় কোভল্যে ভগবৎভক্ত ও জ্ঞানী এই দুইজন পরমানন্দে নিমগ্ন থাকেন, ইহারা কখন চিন্তাশ্রিত হন না। আমার নিশ্চেষ্টতা শিক্ষার গুরু বালক।

বদ্—কুমারী গুরুর কাছে আপনি কি শিক্ষা লাভ করিয়াছেন ?

দত্তাশ্রম—কোনদ্বানে একটা কুমারী আপনার বিবাহের সম্বন্ধ করিত গৃহে আগত বরপক্ষীগণকে সৌখ্য্য জ্ঞেয়্যে তাহার পিতা কাব্যাজ্ঞের গমন করায় সে স্ত্রী তাহাদের আতিথ্য সংকর মানসে ততুল না থাকায় স্ত্রী উচ্ছল

ধনা ভানিতে থাকে। মৃৎকলের আঘাতকালে কুমারীর কঙ্কণ কম্ কম্ শব্দে ব্যতিত হইতে থাকিলে, কুমারী একে একে সমস্ত কঙ্কণ খুলিয়া ফেলিয়া মাত দুইগাছি করিয়া রাখে। তাহাতেও শব্দ হইতেনে মৌখিক এক এক গাছি মাত রাখিল; তখন আর শব্দ হইল না। বহুলোকের একত বাসে কণ্ঠ হইয়া থাকে। দুইজন একত অবস্থান করিলেও পরস্পর আলাপ হয়, তৎকালে কুমারীর কঙ্কণের ন্যায় একাকীঃ বিচরণ করা কঠব্য ইহাই শিক্ষা।

বদ—শর-নির্মাতার কাছে কি শিক্ষাছেন?

দত্তাশ্রম—কোন এক কারাগার এক কর্মকার বাণ নির্মাণ করিতেছিল। এমন সময় এক রাজা লোকজন সহ বাসা ধর্মনি করিতে করিতে সেখানে হইতে চলিয়া গেলেন। শরকারী কর্মকার চক্ষু চাহিয়াও দেখিল না। রাজা তোমার সম্মুখে দিয়া বাসা ধর্মনি করিতে করিতে চলিয়া গেলেন, তুমি তাহাকে কোনরূপ সম্মান করিলে না কেন। কর্মকার বলিল, “রাজা যে গিয়াছেন আমি তো জানিতে পারি নাই।” শরার্থমাতা আমার চিত্তের একান্ততা শিক্ষার গুরু;

বদ—সপগুরুর কাছে কি শিক্ষাছেন?

দত্তাশ্রম—কণস্থারী শরীরের জন্য গৃহনির্মাণ করা বিমল। পরগৃহে সুখে বাসকারী সপগুরু আমার ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। সপ যেমন মানবগণ কর্তৃক শাসিত হইয়া একাকী বিচরণ করে, নিরত এতদ্ব্যন্থে থাকে না, আচার বা গতিতে দ্বারা সর্বব্যব নিবারণ কেহ বঞ্চিত পাবে না, তদ্রূপ ধর্মনি অসহায় মিত্রতাব্যাপী শত্রুসম্পন্ন কি শত্রুহীন কোনরূপ পরিচর না দিয়া একাকী পরিগ্রহণ করিবেন—সপগুরু ইহা শিক্ষা দিয়াছেন।

বদ—মাকড়সা গুরুর কাছে আপনি কি শিক্ষা করিয়াছেন?

দত্তাশ্রম—মাকড়সা যেমন স্কন্ধের হইতে উদগত সূত্র নুর্বাণের দ্বারা বিস্তারপূর্বক তাহাতে কঁড়া করিবার পর পুনর্বার সেই সূত্রে গ্রাস করে, ঐরূপ মহেশ্বর আপনা হইতে বিশ্ব প্রসারিত করিয়া তাহাতে বিহার করেন আবার তাহাতেই সমস্ত লব্ধ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের বিশ্ব-বিস্তারের শিক্ষাদাতা আমার মাকড়সা-গুরু।

বদ—কাঁচপোকা গুরুর আপনাকে কি শিক্ষা দিয়াছেন?

দত্তাশ্রম—কোনদিন মৌখিক্য একটা কাঁচপোকা এক তেলাপোকাতে যিরা লইয়া নিজের বিকরে রাখিল। কেরকানি পুর দেখেগেল তেলাপোকা ভরে কাঁচ পোকাতে ভাঙিতে ভাঙিতে কাঁচপোকা হইয়া গিয়াছে। স্নেহ, ঘেব বা ভরে যে ব্যক্তি যে বস্তুতে অনন্যভাবে মনোহাসিত করে, সে সেই ভাবপ্রাপ্ত হয়—কাঁচপোকাগুরু, ইহাই আমার শিক্ষা দিয়াছেন।

বদ—বেশ্যা পিল্লায় কাছে কি শিক্ষাছেন?

দত্তাশ্রম—পিল্লা কাচসরাগণের জন্য কেন্দ্রীয়া করিয়া ধারে আসিয়া বাসিল এবং আশা করিতে লাগিল কোন ধনবান প্রেমিক আসিবে। সেই আশার একবার গৃহে প্রবেশ করে আবার বাহিরে আসিয়া গারিদিগে বোঁধিতে থাকে, কিন্তু কেহই আসিল না। তখন বিষম হইয়া পিল্লা বলিতে লাগিল। নিষেধই পুরুষের আশাপাশ ভেদন করিবার উত্তম অস্ত্র। জ্ঞানহীন মানব যেমন ক্ষমতা ত্যাগ করিতে পারে না, তদ্রূপ নিষেধ উপস্থিত না হইলে ভবকন্ডন মোচন হয় না। আরো বলিতে লাগিল যে আমি অত্যন্ত জ্ঞানহীন ও মনোভাগ্যা, আমি নিকটে নিতা রতপ্রণ, মিত্রপ্রণ, রূপ-প্রত্যক ঈশ্বরকে ভাগ্য করিয়া নিম্নিত কামপ্রদায়ক দুঃখ-ভর-ব্যক্তি-শোকা-মোহপ্রল, অতিবৃদ্ধ বৃদ্ধিত কাঙ্ক্ষের কামনা করিয়াছি। অতঃপর মানবের প্রিয়তম, নাথ ও আত্মা প্রীতিগদ্যনকে আমার আত্মাকে দৃশ্যস্বরূপে দিয়া কিনিয়া লইব। এইভাবে পুরুষকৃত পাশের জন্য অনুশোচনা করত ভগবৎকরণ শরণাপন্ন হইল। আশাই পরম লক্ষ্য, নৈরাশ্যই পরম সূত্র। ইহাই শিক্ষা করিয়াছি।

উপরিউক্ত চম্পকগুরু, ষাড়া অসংখ্য গুরু রূপে বর্তমান রহিয়াছে ভগবানের সৃষ্ট জগতের প্রতিভা পদার্থ।

প্রত্যেক পন্থার্থই গুরুরূপে কোন না কোন ভাবে জগতের কল্যাণ সাধন করিয়া চলিয়াছে। যেমন পশ্চাত্ত পৃথিবী খনন, প্রস্তর, মণিরূপ দানাদির দ্বারা সকলের উপকার করে, সাধারণকে গৃহস্থ স্থান দান করিয়া থাকে। বৃক্ষ দেহধারণ করিয়া মূল, পুষ্পাদি দ্বারা মানবের সেবা করে। উহার বৃক্ষ এবং কাণ্ডের দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। উহা দ্বারা দান করে শাস্তি দেয়।

প্রকৃতি মানুষের মস্তবুদ্ধি দানকারী। গীতার বলেছেন উহা পরা অপরাধে পরিণত করছেন। দক্ষিণেথের ঠাকুর বলেছেন—তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। স্বামী সত্যানন্দজী বলেছেন—প্রকৃতি অস্ত্র-সংগ্রাহক। অর্থাৎ বৃক্ষসংগ্রাহক। যেহেতু আমাদের প্রকাশচৈতন্যের অন্তর্গত তার চৈতন্য অপ্রকাশ চৈতন্য আরও গভীর আরও ব্যাপক আরও দৃষ্টিসম্পন্ন। একথা স্বামী গিবেকানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দও বলে গিয়েছেন। আমরা নিজেরা যদি এই অপ্রকাশচৈতন্যকে সাত্বিকদ্বারা প্রজ্ঞাময় রূপে দেখতে পারি তবে প্রকৃতিজাত বৃক্ষাদি সমস্ত পদার্থের চৈতন্যের সঙ্গে আমরা যোগদেও পেতে পারি। তখনই আমরা ধীরে ধীরে জাগতিক পদার্থসমূহ কে কিভাবে মানবকল্যাণ সাধন করিয়া চলিয়াছে।

জগতে আমাদের সাক্ষি-প্রত্যয় হাসন গ্রহণ করিতে হইবে। শূন্যমাত্র সাক্ষি-প্রত্যয়। হইয়া জাগতিক কার্যাবলী নিরীক্ষণ করিয়া বাইতে হইবে আর ভগবৎ কার্যাবলীর রহস্য অনুসন্ধানের জন্য নিজের ভিতরের গভীরে ভ্রম দিতে হইবে। সবই নিজের ভিতরে রহিয়াছে। কোথাও বাইতে হইবে না। ‘বা চারি তা’ হসে পারি খোঁজ নিচ্ছ অস্ত্রপুর্বে’।

এই অস্ত্রমুখীনতার দ্বারা বহু আমরা আমাদের অন্তরের গভীরে ভ্রম দিতে পারিবা তত আমাদের ভিতরটা ক্রমে মূর্ত হয়ে পরিণত হয়। উঠবে। তখনই আমরা আরও মূর্ত দেখার মত করে জীবজগতের রহস্য, ভগবৎ রহস্য স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব।

—৪০—

গুরুদ্ব

সৌরী বর্ষপাল

অন্ত বস্তুর দোস্তা বাসার ডিম পেড়েছে কে ?

বোলস ফেটে একা গুরুদ্ব চক্ষু মেলেছে।

গুরুদ্ব হাঁক, ও ইকরী।

কড় এনে সে খেলা করি।

বল পড়ে অন্ট বটে

গুরুদ্ব শোকে গন্ধ পুটে ;

একটু স্থা ঘাসে ঘাসে

আপন ঘন গুরুদ্ব হাসে।

উড়তে উড়তে গুরুদ্ব বার

মাগদ্যাদিনী জিত দেবার।

গুরুদ্ব বাবে বোম প্রথমে সঙ্গে বাবি নে ?

যা আছে তোর ভাতা ছেঁড়া পুটলি বেঁধে নে।

বাঁয়ে ডানা ডাইনে ডানা মথিখানে নর—

গুরুদ্ব রে, তোর পাখ-কাপড়ের কাঁপে চলায়।

—৪১—

শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ ও দেশপ্রেম

। দ্বিতীয় পর্ধ্যায় ।

[পূর্ব প্রকাশিতের পর ।

শ্রীনাথনাথুরী

শ্রীঠাকুরের স্বদেশ প্রেম, দুর্গভক্তের প্রতি সমবেদনা, দীন-দুঃখীর দুঃখ দূর করার কথা শ্রুৎ লেখনী যথেষ্ট প্রকাশিত হয়নি—তার লেখনী তার উপদেশ শ্রুৎ অঙ্গের জন্য নয়—নিজের জীবনের চলার ছন্দে সঙ্গ দেবেই সে সবার অপূর্ণতা মিটাই। দেশের প্রতিটি দুঃখিত দীন দুঃখীর প্রতি অনুকম্পা—তাদের বেদনা লাঘবের চেষ্টা সে ব্যক্তি মানবের ক্ষেত্রেও দেখেছি—সম্রাট মানবের জন্যও দেখেছি। 'দীন নারায়ণ' ভাষায় শ্রীঠাকুরের। কহতেন, 'দীন নারায়ণ' অসুস্থ হলে ওষুধ অভাবে, চিকিৎসা অভাবে বড় রকম পায় কান্নেই আমাদের ঠাকুরের নামের প্রতিটি আশ্রমে তাদের জন্য যেন কিনা পলসায় হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেওয়া হয়। বৌদ্ধ ধর্ম কি সাথে সঙ্গপ্রদারী হয়েছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ভগবান বুদ্ধের বাণী যেমন গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, দেশ হতে দেশান্তরে পৌঁছে দিয়েছেন, তেমনি তাঁদের সঙ্গে নানা ভেদজ ওষুধ পাও থাকত, রোগাক্রান্ত মানবদের তাঁরা ওষুধ দিতেন। ভগবান বুদ্ধের নামে তারা ভালোও হয়ে যেত। মানব অভাবে পরলে যেমন অসহায় বোধ করে তেমনি সব থেকে বেশী অসহায় বোধ করে অসুস্থ হয়ে পড়ত। তোমরা শ্রীঠাকুরের নাম করে ওষুধ দেবে, রোগীকেও ঠাকুরের নাম করাবে।'

শ্রীঠাকুরের উপদেশ অনুসারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি আশ্রমে দীন নারায়ণ ভক্ত নারায়ণ এঁদের ওষুধ বিতরণ ব্যবস্থায় অন্নদানের ব্যবস্থা ও বছরে দুর্ভিক্ষবার্ষ বন্য দানের ব্যবস্থা সুদীর্ঘ বছর ধরে চলে আসছে আর আজও শ্রীঠাকুরের আশীর্বাদে সে সব বলয় আছে। এ ছাড়া শ্রীঠাকুর নিজে উপস্থিত থেকে আশ্রম শুল্কের ছোট ছোট ছেলে ছেলেদের দীন নাঃস্বপ্নের ভালো ভালো ভিটামিন গড়ো দুধ, ভালো বিস্কুট, চীনে বাসায় পি-ব্যাট, অসুস্থদের জন্য সাদা বালি' জিহ্বা ইত্যাদি কত যে বিতরণ করিয়েছেন

সে কথা বলে শেষ করা যায় না। বলতেন, 'দেশের ছেলে-মেয়েদের দরকার পড়ে না হলে দেশের উন্নতি হবে কেমন করে।' এবং জোগাড় করতে অর্থব্যয় শ্রীঠাকুর নিজেও করতেন, শ্রীঠাকুরের স্বজনবর্গ বিশেষ করে শ্রীঠাকুরের ভগ্নীপতি শ্রীদামচন্দ্র বাল্যাপাখ্যার আবার শ্রীঠাকুরের ভক্ত সন্তানসমূহ বেশ কিছু অর্থ দিতেন। আর প্রেসিডেন্ট মহারাজ (স্বামী বিবেকানন্দ) নানা ওষুধের কোম্পানী থেকে রেডক্রস সোসাইটী থেকে সম্ভ্রম করে আনতেন প্রচুর দুধ, ভিটামিন, বিস্কুট জামা কাপড় ইত্যাদি। সুহাসনা স্বামী সুরেশ্বরানন্দ সে সব বিতরণের হিসাব রাখা বিতরণ করা এসব করতেন।

শ্রীঠাকুরের এসব কল্যাণকর কাজের কথা লোক মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত—আলমবাজার জটীমলের ডাক্তার হিরলাল গুহ ঠাকুরভা এলব শ্রুনে বলেছিলেন, 'এমন সাধুকে আমি দেখতে যাই যিনি বালকবালিকা ও শিশুদের স্বাস্থ্যমোচক জন্য এতখানি চেষ্টা করেন।' তাঁনি প্রথম এই উদ্দেশ্যে আশ্রমে আসেন ও চিরদিনের মত শ্রীঠাকুরের একান্ত দরদী ভক্ত হয়ে যান—তিনি প্রচুর ওষুধ ইত্যাদি আশ্রমে এনে দিতেন। কহতেন 'ঠাকুর আমার গুরুদেব হতে গেছে—আপনি আমার ইন্ট বলে আমি আপনার ধ্যানই ইন্ট হুঁটি' জ্ঞানে করি।'

সেবার তেঁরালো উপদেশের আশ্রমেও স্বচ্ছন্দাশা বড় তাড়াবে বন্য পক্ষী হাজার মানব গবাদি পশু ভীষণভাবে কষ্টগ্রস্ত হলে তখন শ্রীঠাকুরের দরদী ছাত্র দুর্গভক্তের জন্য ব্যাখ্যার উল্লেখ। সাহায্য ডাঙার খোঁজের জন্য নিজ সন্তান সন্তানকে নগরের প্রতিটি ঘরে পাঠালেন ভিক্ষার নিজেও দিলেন অর্থ—ভক্ত ও ভাগ্যী সন্তানসমূহ শ্রীঠাকুরের আশীর্বাদে মাথার নিচে—এই উপলক্ষে শ্রীঠাকুরের রচিত—

অথ মে অম মে অম মে গো অম মে
ভুখারী শিব পুকারী ফিরে
দুয়ারে মা তোর কে'মে কে'মে সেখে সেখে

ইত্যাদি—

এই সঙ্গীত গেরে নগরের প্রতিটি ঘারে তিকা করে
চলেন—সঙ্গীতের মধ্যভেদী সুর ও ভাষা সহরবাসীর মনে
এমন নাড়া দিলে যে প্রতিদিন আশীর্ভাবের অর্থ, জামা,
কাপড়, চাল ভাল, ভরীতরকারী সংলগ্ন হতে লাগল।
এইভাবে সিউড়ী দুস্রাজপুর, বোলপুর, আমোদপুর,
সাইথিয়া ইত্যাদি বহুস্থানে শ্রীঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী
সন্তানকা' তিকা করলেন। শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ প্রসন্নতার
ভরে উঠল। সেই সংগৃহীত বস্তু দুর্গতলের জন্য
পাতিত্রেও দেখা হ'ল। শ্রীঠাকুরের দেশপ্রভের এমন বড় যে
নির্দর্শন আমরা দেখে ধনা হরেছি সে কথা বলে শেষ করা
যায় না।

এরপর মৈদীনীপুরের ভরাবহ কন্যার কতিতস্থ বৈশবাসীর
কথা শুনে শ্রীঠাকুরের করুণাবিকারিত হৃদয়ে তুলল বাধার
ভর। সাধু ও গৃহী ভরনের বললেন, 'দুর্গতলের জন্য
আমাদের কিছ' করা উচিত। এবার আমার মনে হয় অন্য
পন্থার অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। আশ্রম ও ভক্তগোষ্ঠীর
ছোট ছোট ছোলেহুসদের অভিনয় তো ব'ব জনপ্রিয় হয়ে
উঠেছে, কাজেই এদের দ্বারা ধীননাথ যোমোরাল হলে
'চারিটী লো' করালে বেশ ভালো হয়। শ্রীঠাকুরের সিদ্ধ
বাণী কাজে পরিণত করতে সাধু ও ভক্তরা তৎপর হয়ে
উঠলেন সম্বন্ধে। অভিনয় ব'ব সাফল্যমণ্ডিত হবার
জনা আমরাও দোহা ঝুড়া দিতে লাগলুম। 'গেট' সেল'
'দু' সেল' সবার মাধ্যমে ঠাকাও সংগৃহীত হল বেশ।
আর শ্রীঠাকুরের উপস্থিতিতে আমরা অভিনয় করলুম অপ'ব'
সাফল্যের সঙ্গে। শ্রীঠাকুর সেই সমস্ত অর্থ মৈদীনীপুরে
সাহায্য ভাণ্ডারে পাঠিয়ে দিলেন।

দৈশবাসীর উন্নতির জন্য গ্রামে গ্রামে বহু অলৈকানিক
বিদ্যালয় গড়ে তোলার ব্যবস্থা করলেন। মাতৃজাতির
কল্যাণের জন্য মাতৃসকলও স্থাপন করলেন। বিদ্যালয়-
দৃষ্টিতে শব্দ কীরে পড়া হাড়াও ব'ব' ও নৈতিকতা

শিকার ব্যবস্থাও করলেন। সংশিকা—ঠাকুর শ্রীসামক্ক,
মা সাল্লা ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাংবারা ছড়িয়ে
দিয়ে দেশের মকলের জন্য আশ্রমের নিজস্ব পঠিকাও প্রকাশ
করলেন 'ভাবমুখ' নাম দিয়ে। যে পঠিকা আজও সংগৃহের
প্রকাশিত হচ্ছে। সিউড়ীতে সঙ্গীত শিকার কোন মূল্য বা
কলেজ ছিল না। দেশের ছেলেমেয়েদের উন্নতির জন্য
'শ্রীসামক্ক সুরভারতী' নাম দিয়ে সঙ্গীত ভবন করলেন
প্রতিষ্ঠা। সেখানে বহুসঙ্গীত, কণ্ঠ সঙ্গীত নৃত্যাদিকা
সব রকম শিকারই ব্যবস্থা করলেন। শাস্ত্রীর সঙ্গীতের
সঙ্গে স্বেচ্ছায় সঙ্গীত রবীণ সঙ্গীত অনুল প্রসাদের সঙ্গীত
বিশেষ করে শ্রীসামক্ক সঙ্গীত শিকার ওপর বিশেষ জোর
দিলেন। বললেন 'এ' ব'ব ঠাকুর শ্যামিজীর ব'ব—ঠাকুর
শ্যামিজী শ্রীমা এ'দের নন্দেধে রচিত সঙ্গীতের বহুল প্রচার
হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।'

উনিশশো ছিটলিশ খৃষ্টাব্দে নোওয়াখালিতে কমুনাল
রাষ্ট্রে বধন হিন্দু'র অ'রিত্র মাতার কতিতস্থ ও নিখ্যাতিত
হল তখন তাদের সাহায্য করণে গান্ধীজীর আবেদন পত্র
জবালীন প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠানে পৌঁছোছিল, আমাদের
আশ্রমেও সাহায্য দান করণে গান্ধীজীর আবেদন পত্র এসে
পৌঁছালো। শ্রীঠাকুর বললেন, 'আমাদের অতিক্রম প্রতিষ্ঠান
আর বেশদিন গড়েও ওঠেনি—অর্থ বলও নাই—বাই হোক
গভাবের মত এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দিয়ে একটি
অভিনয় মাধ্যমে 'চারিটী শোর' ব্যবস্থা কর আর এভাবে
ঐ ছোটদের সঙ্গে নিয়ে সহরের সবস্ত বাড়ী বাড়ী গিয়ে টিকিট
দেলের ব্যবস্থা কর। শ্রীঠাকুরের কথা কাজে পরিণত করতে
দেরী হল না। মানিকজাঠা (স্বামী নির্বেদানন্দ) ও
আনন্দকাকার (বিখ্যাত আইনজীবী আনন্দ গোপাল মিত্র)
সঙ্গে আমরা ছোটরা করেকজন সিউড়ী সহরের প্রায় প্রতিটি
বাড়ী গিয়ে 'দু' সেল' করলুম। অভিনয়ের দিন গেট সেলও
হল প্রচুর। পিতৃসম্ভার (শ্রীসামক্ক শ্রীশোপাধার) প্রচুর
ঠাকা দিলেন। শ্রীঠাকুরের কৃপায় ও উপস্থিতিতে সিউড়ী
পাবলিক স্কুলে আমরা অভিনয় করলুম অভিনয় সাফল্যের
সঙ্গে! চতুর্দিকে আমাদের অভিনয়ের কৃতিত্বের কথা ছড়িয়ে
পড়ল আর শ্রীঠাকুরের করুণা শ্রীসামক্কের কথাও প্রকাশিত

হল। আভিনয় শেষে খড়্গ কর্তা বাহু দিয়ে সেই টাকা দুর্গ'এসের সেবার গান্ধিবল্লীর কাছে পাঠানো হল।

কড় কড় বিশেষ ঘটনার যেমন সার্থক শ্রীঠাকুরের মনো-প্রাণিত মনো-প্রেমের প্রকাশ নিত্যদিনের খুব ছোট ছোট ঘটনার সার্থক অবস্থানিত বীন দুর্গ'এর প্রতি তাঁর কত দয়া কত সহানুভূতি কত তাঁর অনুকম্পার প্রকাশ। একবার একটা গরীব লোক পদ্মফুল বিক্রী করতে এসেছে, আমরা সবাই মিলে শ্রীঠাকুরকে পূজা করব, মালা সেঁখে পরাবো এজন্য শ্রীঠাকুরের সেজতাই দরদর করে লাগলেন দাম কমাতে চাইলেন আর সেই লোকটি কাতর অনুরোধ করতে লাগল 'বেশী কমাতে না বাবু'—সেজকা বলেন 'এতো ভূমি কিনে জানোন—পুকুর খোঁজ তুলে এনেছ তব কেন বেশী দাম নেবে, কমাতে না ?' লোকটি বলে 'বাবু এই ঘোরে অনেকটা পথ হেটে আইছি—দুটো পরসার পেয়েই তো।' শ্রীঠাকুর তখন ওপর ধান ময় ছিলেন—সে সমস্ত তখনও সারাদিনে আঠারো ঘণ্টা একাকী ধানরত থাকতেন—কথাগুলি ধানরত শ্রীঠাকুরের কানে পৌঁছলো, আসন ছেড়ে উঠে এসে কললেন, 'আহা পটু, বীন দুর্গ' মানু'এর সঙ্গে কেন অত দরদর করছ পদ্ম কেনেওনি লাগারওনি সত্যি কিন্তু সাপ-খাপ, পোকা-মাকড় ভরা বিল বা গাঁষ থেকে জীবনের দারা এক রকম ভাগ্য করেই পদ্ম সপ্তদ করে এনেছে ওর সঙ্গে দর করে ভূমি কটা পরশা বাঁচাবে। কড় কড় মহাজনের সঙ্গে কড় কড় বাসোয়াদের সঙ্গে দর দর করে না হয় করলে—নাও ওর সব পদ্ম কিনে নিয়ে ওর দাম মিটিয়ে দাও।' শ্রীঠাকুরের কথার সেজকা সেই লোকটির সব পদ্ম কিনে নিলেন। শ্রীঠাকুরের সেই করুণাধন বহুতরুর দিকে তাঁর লোকটির চোখে আনন্দ কেন্দ্রাৎ গাঢ়ত্রে পড়ল। গড় হয়ে প্রণাম করে বলতে লাগল 'মহাশয় বাবা। মহাশয় বাবা।'

একবার শ্রীঠাকুর বাহুনি সিঁড়ী—বহুমান স্টেশন থেকে একটি দর দর করে ছোট ছোট উঠল—কড় কড় কালো চোখে তার বাল্যের দামাল দারা—ছোটটি বাহা বিক্রী করতে উঠেছিল 'শ্রীঠাকুরের খুব দয়া হল ছোটটিকে কাছে জেঁক গোপালের ভোগের ও সাবু ছেলেদের জন্য বেশ কিছু বাল্য ভাঙা কিনলেন—ওরকম দু'হাত ভরে প্রসাদ দেওয়া

করালেন—ছোটটি প্রসাদ পেয়ে দিলে শ্রীঠাকুর বহুতরুর 'থেরে নে।' ছোটটি বলল, 'বাড়ীতে আমার বিধবা মা আছে, ছোট ভাই বোন আছে, ওদের সবাইকে দিয়ে দাও। তার কথার শ্রীঠাকুর খুব খুশী হলেন বহুতরুর, গুটি ভূমি খেতে নাও, বাড়ীর জন্য আমার দোহা। ছোটটি গারে যে ফুল পাট'টি ছিল সেটির একটি হাত আছে, একটি হাত একবারে ছেঁড়া কলছে। শ্রীঠাকুর তাকে একটি জামা কিনতে টাকা ও বাড়ীর জন্য আমার প্রসাদ দিলেন।

সাপু প্রভৃতির একটি বিধবা মা মাঝে মাঝে শ্রীঠাকুরের কাছে আসতেন প্রসাদ বা কিছু সাহায্যের জন্য। একদিন 'শ্রীঠাকুর তাকে আশ্রম মারেরের কাছে প্রসাদ রেখে খেতে বহুতরুর—মারের তাকে সামান্য কিছু গুটি তরকারী ও মিষ্ট দিলে যা টি চলে গেলে সেগুলি নিয়ে। পুত্রের ভোগ নিতে বসে শ্রীঠাকুর বহন শুনলেন মাটি অন্ন প্রসাদ পায়নি, এনি একটু কিছু নিয়ে গেছে শ্রীঠাকুর তখন নিজে অল্প নিয়ে গেলেন। সমস্ত আশ্রমে বিকলতা নেমে এলো। মারেরাও হইলেন অল্প। এই জন্য নিমাই (সেবক) বুঝে বুঝে মাটিকে বার করে জেনে এলো যে অন্য অন্ন পেয়েছে। নিমাই তাকে পরদিনই আশ্রমে অন্ন প্রসাদ পেতে নিমন্ত্রণ করে এলো। এই কথা শুন্যে রাতে শ্রীঠাকুর ভোগ নিলেন। এমনই ছিল শ্রীঠাকুরের মনের প্রতিটি দীনান্তের প্রতি অনুকম্পা।

শ্রীঠাকুর মাঝে মাঝে বীরভূমের কোন ফাঁকা মাঠে, কখনও কন প্রায়ে, কখনও রেল লাইনের ধারে কখনও ধানক্ষেতের পাশে লাঙ্গলী দাঁড়ির ধারে গোপালকে ভজন শোনানো সঙ্গীত রচনা করা, ভোগ দেওয়া প্রসাদ বিতরণ এসব আনন্দ করতেন। তখন সার্থক আমরা সবাই বহন শ্রীঠাকুরের সঙ্গে আনন্দে মনু'লেন—শ্রীঠাকুরের গুণিত্তে কিন্তু তখন কোন দীন পঞ্চাঙ্গী বা দীন নারায়ণ বাদ বার নি। দু'র পুথ চলেছে লাঠির জায় ছোট পুঁটলি বেঁধে কোন দীন পাঁখি তাকে ডেকে শ্রীঠাকুর প্রসাদ দিরেছেন। সেই সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গ পঞ্চাঙ্গী কেউ ভরে সহকাড় দর্শন করছে। সেই আনন্দ ভোগের শ্রীঠাকুর কাছ থেকে প্রসাদ দিরেছেন—শ্রীঠাকুর যে সবাই!

(জন্ম)

রূপা-কাহিনী

স্বামী নটিকেন্তনানন্দ

শ্রীশ্রীসায়না মা বলছেন, “শরণাগত হয়ে থাকতে হয়। যে শরণাগত হয়ে থাকে, শ্রীশ্রীঠাকুর তার সব ভার নেন।” আর ঠাকুর শ্রীসামক বলছেন, “কপরে বত তপস্যা আছে, সব আমি করে দেলাম, তাবের কিছু করতে হবে না। তোরা কেবল আমার ডাকবে, আমার চিন্তা করবি। পত্রে যেমন পিতার ঐশ্বর্য পায়, অন্যরাসে পায় সেইরকম যে আমার ডাকবে, আমার চিন্তা করবে, সে আমার ঐশ্বর্য পাবে—আমার অমৃত ঐশ্বর্য। জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, শান্তি, সুখ, প্রেম ও সমাধি।” প্রেম ও সমাধি অনেক উঁচু থাকে কথা। জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য বৃহৎ ভাঙো জিনিষ সংগ্রহ নেই। তবে তা পাবার জন্য—তুমি একটা ব্যাকুলতা হৃদয়ে বোধ করি না। কিন্তু যেটা আমরা সবলেই চাই, সে সুখ, সুখ ও শান্তি। সুখ ও শান্তি চায় না, এমন লোক পৃথিবীতে নেই ব’লেও চলে—সন্তান পিতার পক্ষের বাবা মা যেমন ব্যাকুল হ’ল। তার চাইতেও অনেক বেশী ব্যাকুল শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা আমাদের কল্যাণের জন্য, আমাদের কলঙ্কের জন্য। আমাদের দুঃখ দুঃর কবরার জন্য, আমাদের সুখ ও শান্তি দেবার জন্য। “প্রণব গলিতং চিত্তং জীবন্তীয়া সহিবুৎ” শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবে শ্রীমৎ স্বামী অচেনানন্দ মহারাজ বলেছেন। জীবনের দুঃখ আর সহ্য করতে না পেরে ভাগ্যবাসীর কালিত হয়ে “কৈবর্ত ছেড়ে নেমে এলেন আমাদের এই মাটিতে, মহারাজবাটীতে এখানে যে শূন্য কবরার কথা নম্র। সত্যি কথা—যাভব সত্যি সত্যি জানবার জন্যই কতকগুলি সত্য ঘটনা নীচে লিপিবদ্ধ করাছি। পড়লে লোকের মনে বিশ্বাস ও ভক্তি আসতে পারে। বহিঃ সুখ থেকে বঞ্চিত, বহিঃ শান্তি পাননি না, তাই যদি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে শরণাগত হ’ল। শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভাবেন এবং তাঁর চিন্তা করেন এবং তার ফলে জীবন সুখ ও শান্তি পান, তাহলেই এ লেখা সার্থক।

১৯৬০৭ সালের ঘটনা—আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর সন্ধ্যায় দিবে ঠাকুরপুত্রের বসিরে দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহ প্রতীতি করিলে। প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হ’ল। বৃহৎ গায়ে এলাকা—হাটহাটীর অকুণ্ট কবরার জন্য কিছুটা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হ’ল। বছরে শ্রীশ্রীসায়না মা, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমৎ স্বামী অচেনানন্দ মহারাজ ও স্ত্রীশ্রীমৎমা উপলক্ষে প্রতি উল্লেবে নতুন জামা কাপড় বেওয়া প্রকৃতি হচ্ছে। চারিদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমৎ নামের একটা সাদা পড়ে গেছে। চরক-সহিতার মধ্যে মহাবি চরক-তার কৃতবিদ্যা শিবাকে উপদেশ দিচ্ছেন, “তুমি কৃত্যো হরেন, এখন কোথাও বসে অসীত শাস্তের সার্থক প্রয়োজ্য চিকিৎসা করতে বসবে। তুমি যেখানেই থাক না কেন, তোমাকে ঘিরে তিন ধরনের লোক থাকবে। একমূল হবে মিত পক্ষ, তারা তোমার উন্নতিতে হুঁসী হবে, আনন্দিত হবে, তোমার কোনও কষ্ট দেখলে তারা বাধা পাবে। আর একমূল থাকবে বিচ্ছিন্ন পক্ষ—তারা তোমার উন্নতিতে ইবাধি জ্বলে পড়ে মরবে, তোমার কোনও কষ্ট হলে তারা উন্নতিত হবে। আর একমূল থাকবে উদাসীন পক্ষ—তারা তোমার সম্বন্ধ কোনই আগ্রহ দেখাবে না। তোমার ভাগ্যে হ’ক বা মন্য হ’ক—তারা থাকবে উদাসীন। তবে তোমাকে এমনভাবে সতর্ক হ’য়ে চলতে হবে যে মিতপক্ষ অবিবেচিত মিত করেন। উদাসীনরা আর উদাসীন থাকতে পারবেন না—মিত করেন। বিচ্ছিন্নরা তোমার কষ্ট করার প্রাপন চেষ্টা করে ও কষ্ট না করতে পেরে, হতাশা হয়ে উদাসীন হয়ে যাবে।” এখন আমরা নিজের মনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা কল, বান, হোম, পূজা প্রকৃতি নিয়ে যাব। যে মিত তাকে কি করে অধিকতর মিত করা যাবে। কে উদাসীন তাকে কি করে মিত করা যাবে। বিচ্ছিন্নের চোখাভাষা বার বার প্রশ্ন করে কি করে তাদের উদাসীন করা যাবে—এ ব্যাপারে উদাসীন। অকত সলোকেই নিম্ন অনুসারী হুঁকতে পারছি যে আমাদের চারপাশের লোকসমূহ অথবা ধীরে ধীরে এই তিন ধরনের মনোভাব জেলে উঠবে। সুতরাং বার হ’ল শ্রীশ্রীঠাকুরের। এমন কিছু করতে হবে, যাতে মিত অধিকতর মিত হয়। উদাসীন মিত হয়ে যাব এবং বিচ্ছিন্নরা উদাসীন হয়ে যাব। সুতরাং জেলা সূত্র হয়ে গেল। তখন প্রাপ্ত বয়স্ক-পিতার মৌন থাকতাম এবং যাতে বয়স্কদের শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে চলে যেতাম।

শুক্লার আশ্রমে প্রসাব শেষে সম্ভার ঠাকুরপুত্রের ঘিমে আসতাম। এক বৃহস্পতিবার ঐরকম ঘিমে। শুক্লার সম্ভার টোলফোন এল—“শীত চলে আসেন। কাল রাতে আশ্রমে আগুন লেগে সব পুড়ে গেছে।” হুটে এলাম ঠাকুরপুত্রের। তখন আশ্রমে ছিল খড়ের ঘর, বৈশ্যের ঘটি। সব পুড়ে ছাই। আগুনে পোড়ার রকম দেখে সকলে সন্দেহ করল—কেউ বা কারো মদ্যেতা ক’রে কেগারাসিন তেলে লেপুড়া ভিজিয়ে গুলি করে আগুন লাগিয়ে খড়ের চালে ছুঁড়ে দিয়েছে, তাতেই এই অগ্নি কাণ্ড। বোকা সেল অনেকদিন থেকেই চক্রা চলাছিল কিন্তু প্রতি রাতেই এসে দেখে সাধু ধান ভপ বা হোম করে রেখেছে—তাই বেছে নিয়েছে এক বৃহস্পতিবারের রাতি। এই রাতে সাধু আশ্রমে থাকে না। সুতরাং আগুন লাগাবার পক্ষে এক বৃহস্পতিবারের রাতিই সবাপেকা প্রকট। এও এক কৃপা। যদি অন্য কোনও রাতে আশ্রমে আগুন গিত চোখের সামনে ঘটি ঘটি করে আশ্রম জ্বল পুড়ে ছাই হয়ে থাকে দেখলে যোগ্যের তা সহ্য করা কঠিন হ’ত। তাই তিনি কৃপা ক’রে এমন রাতে আগুন লাগালেন, যখন নিজে গুরুদেবের পারের কাছে শান্তিস্থে নিরতি। যখন বন্ধর পেয়ে দেখতে এলাম—তখন তো ভট্টা না ঘটেই গেছে। আর কোনও চাক্ষুষ নেই। কিন্তু এক রাতের এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার বেকলাম, চারিপাশের ব্যাকরণ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। মিত্রেরা হার হার করছেন। স্বামীস্বামীর এক খিটল কণ্ঠ হ’ল, তা ভেবে। তাঁরা অধিকন্তু নিয়ম হারে গেছেন। উদাসীনরাও রাতি জেগে যিনের নগ্ন পুত্রের থেকে বাল্যে বাল্যে জল স্বামীস্বামীর এনে আগুন নেভাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা আর উদাসীন নন। যনের ভাব সত্যিই তো—তো যাতে পাচি থাকতেন না। নিজের মনে লোক সেবার কাজ ক’রে চলছিলেন। তাঁর আবার শত্রু কে? কারা এই সব নান্দটা করল?” উদাসীনরা মিত্র হারে গেলেন। আর বীজফেরা নিশ্চয়ই উদাসীন হারে ভাবিছিল, “যেটা ভেঙে কোমড় ভেঙ্গে দিচ্ছি। বাহ্যিকের আর হ’ মনের ভিতর কোমড় সোকা করে বাড়িতে হবে না।” তাঁরা উদাসীন হারে সোচ্ছলেন নিশ্চয়ই। সে সময় জীবনযন্ত্রের গাম এত চড়া ছিল না। খেঁচ খেঁচ নিয়ে জানলাম, নতুন করে গাঁপ কিনে খড়ের চাল দিয়ে ঘর তুলতে ৫০০ টাকা খরচ হবে। কোষার টাকা পাই? কি ক’রে আবার বরগালি জুগব ভাবিছি। ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর কৃপা করে একটি মণি-অর্ডার পাঠালেন ৫২৫ / ৫০০ টাকার। সম্পূর্ণ নতুন করে আবার আশ্রম তৈরী হারে গেল। অল্প মিত্রেরা অধিকন্তর মিত্র হলেন, উদাসীন মিত্র হলেন। বীজফেরা উদাসীন হারে গেলেন।

অবিস্বাসীরা বঞ্চিত পারেন। এতো-একটা হঠাৎ যোগ্যবোধের ঘটনা। বাড়ীও পুড়ে, সহসা টাকাও এসে গেল। এর মধ্যে আবার ঠাকুরের টানাটানি কেন? তাহলে শুনুন আরও করে কণ্ঠ ঘটনা।

এটি হলো সন্ধ্যা নিখিল সেন মহাশয়। বিনি ছিলেন আবার ঠাকুরের পরমভক্ত। শ্রীশ্রীঠাকুরের গানই গাইতেন আকাশ বাসীতে। তাঁর ঘরোয়া অলঙ্কার কাহিনী আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। তিনি ছাত্রাবাসে থেকে কলেজে পড়াশুনা করেন। কালিকার সেন শত্রিকায় জন্ম ও বড়লোকের বাড়ী—প্রতি মাসে প্রায় ১০০ টাকার মতন তাঁর কাছে বাড়ী থেকে পাঠান—প্রতি বছরে জন্য। খুবই দিল্লিরিলা লোক ছিলেন নিখিলবাবু। সেই টাকার বেশ কিছু অংশই তিনি ব্যয় করতেন কল্যাণবাসের সেবার। তাদের নিয়ে একসঙ্গে হোস্টেলে থাকত—তখন তো আর মিনেমা ছিল না। খিটটোর দেখা—এ সব খরচ হ’ত। একবার হয়েছে কি—একটি ভালো নাটকের অভিনয় হচ্ছে। নিখিলবাবু হাতে পল্লাস চৌকি। বাড়ী থেকে টাকা আদায় আসেনি। ওঁর ঐ খিটটোর সেবার ঘর ইচ্ছা। কল্যাণবাসের কাছে হোমোমাল ক’রে কোচাচেন টাকা ধার সেবার জন্য। যাতে ঐ খিটটোর দেখতে পারেন। কেউ টাকা ধার দিচ্ছে না। নানা অসুবিধা দেখাচ্ছে। তারপর দেখলেন সকলেই ঐ খিটটোরের সমস্ত হোস্টেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে—কেউ বেনের বাসায়—কেউ অন্য কোনও আত্মীয়ের বাসায়। বেশ দুঃখিত পারছেন। সবাই খিটটোকেই যাচ্ছে। কিন্তু তাঁকে বঞ্চিতনা। অল্প এমেরই কতদিন নিজে সেবে খিটটোর দেখিয়েছেন। দুঃখ কোডে ওঁর চোখে জল এল। যনের দুঃখ তাঁর ঘাটে শূন্য কোন সময় নাকি ছাঁড়তে পড়েছেন। শূন্য দেখলেন তিনি খিটটোরের সামনে পাছকরাই করলেন,

পকেটে পরমা নেই মনে মনে। হঠাৎ দেখলেন লাল পাড় শাড়ীপরা শ্রীমতীসারবা মা এসে হাজির। ওঁকে দেখে ব'ললেন, "তোরা খিরচোর সেবার খুব ইচ্ছা নারে!" উনি ব'ললেন, "হ্যাঁ মা, কিন্তু পরমা নেই যে!" মা তাঁর অজলের গিট খুলে একটা আর্থালি খুলে ব'ললেন, "এই নে, টিকট কাটবার পরমা!" ঠক করে একটা আগরাজ হ'ল। ঘুম ভেঙে গেল। দেখলেন তাঁর একটা হাত খাটের বাইরে পাতা অবস্থায় রয়েছে, কেউ কিছু দিলে আমরা সেবার জন্য যেমন হাত পাতা সে অবস্থায়। আর সেই হাতের নিচে ফেলেতে একটি আর্থালি পড়ল।

আর একটি অনুগ্রহ ঘটনা বলি—খুব সম্প্রতিক ঘটনা। সারবা-গোরা মার সঙ্গে শ্রীকৈলাস ও মানসমতাকর পরিচয়। ক'রে কাশীর বিশ্বনাথ দর্শনান্তে কলকাতার ফিরছি। ট্রেনের উপরের বার্থে দুপুরে একটু ঘুমুচ্ছি। সারবা-গোরা মা ও নীচের বার্থে একটু ঘুমিয়ে নিয়োগে। জমা বাতীরা চা খাচ্ছে, কফি খাচ্ছে—ওঁর ঘুম ভেঙে গেছে। কফি খেতে ইচ্ছা হয়েছে। অথচ হাতে পরমা নেই। ভাবছেন, ল্যাম্পটা তৈরি ঘুমোচ্ছেন। টাকা পরমা সব ওঁর কাছে। কফি যে খাব, টাকা কই। ভাবছেন হঠাৎ টুক ক'রে একটি কাঁচা টাকা ওর কোলে পড়ল। তাই দিলে কফি খেলেন। ঘটনা শুনে আমরা বন্ধন মজা করছি "ঠাকুরের দেওয়া টাকা তোমার রেখে দেওয়া চিত ছিল।" তখন তিনি ব'ললেন, "বারে! ঠাকুর কফি খেতে টাকা দিলেন, কফি না খেয়ে সে টাকা যদি জামিয়ে গ্রাফি—তবু আবার দরকারের সময় ঠাকুর সেখান নাকি? ভাববেন, 'ওকে টাকা দিলে তো জামিয়ে রাখে। ওকে টাকা দিয়ে লাভ কি?' কফি খাবার জন্য টাকা দিলেছেন, কফি খেয়ে খরচ করলে আবার বন্ধন দরকার হবে, ঠাকুর নিশ্চয়ই আবার টাকা দিয়ে দেবেন।" এর নাম বিশ্বাস।

আর একদিনের ঘটনা বলি। এই বছরই গ্রীষ্মে কি রকম গরম পড়েছিল, নিশ্চয় সবলের মনে আছে। সেই গরমে বিবাহী বাগের কাছে ৩৫ টা ও ৪ টার সময় ব্যাচ। এ দীন-সেবককে বারা চেনেন, তাঁরা জানেন, সব সময়েই সে ব্যাগ ভর্তি অনেক মালাপত্র নিয়ে পথ চলে। ব্যাগটি বেশী ভারীই ছিল সেদিন—এ গরম! সন্ত শরীর বাঘে ভিজে গেছে। খুব তৃষ্ণা পেয়েছে, ভাবছি, 'হাঁস একটা কম্পদ আপ খাই, তবে ১-৬০ পরমা নেবে। এক গ্রাস আখের রস খেলে ১৫০ পরমা নেবে, একটা ভাব ২০০। থাক আর খেয়ে দরকার নেই।' অবশ্য শ্রীশ্রীঠাকুর যে পেশট পরমা মেনে নি, তা নয়। ইচ্ছা করলে ও সবই কিনে খেতে পারা যায়। কিন্তু ছোট কল থেকেই কন্টে মানুষ বলে এ পরমা খরচ করে আর কিছু খেতে ইচ্ছা করল না। ঠিক বন্ধন সিদ্ধান্ত নিয়েছি, পরমা বরু করে কিছু খাব না। অর্থাৎ একটি লোক এসে হাত ধরে ব'ললেন, "হংসরাজ, এই গরমে কোথায় যেমন নেয়ে চলেছেন? এক গ্রাস আখের রস খেয়ে যান।"—লোকটির নাম মনে পড়ছে না। চেনা চেনা মূখ। ব'ললাম, "ভাই, এক গ্রাস আখের রস খেলেই এখন ১৫০ নিয়ে নেবে। ডব্রলোক বলেন, 'নের নিক, আপনাকে তো আর দিতে হচ্ছে না। আপনি ভাবছেন কেন?' ব'ললেন, 'নিজের না লাগলেও কারুর না কারুর তো লাগবেই ভাবতে হবে যথাক্রমে।' "না, আপনাকে ভাবতে হবে না, এই সে তো হংসরাজকে এক গ্রাস ভালো আখের রস। গ্রাসটা ভালো করে খেতে দে ডাই।" এইসব বলে এক গ্রাস আখের রস খাওয়ালেন। একটা ভালো ভাব খাওয়ালেন। ২০০ গ্রাম আখের রসে মিলে। অর্থাৎ প্রায় আখ ঘণ্টার মধ্যে ডব্রলোক ও দীন সেবকের জন্য ৫১০ টাকা খরচ করে যেমতেন। তখন সত্যি গোপালজীর কুপার চোখে জল এসে গেছে। ও কে, 'ব'ললাম, 'দেখুন সত্যি কথা ব'লছি—বুঝি তেঁটা পেয়েছিল, কিন্তু আপনি না খাওয়ালে নিজে থেকে পরমা খরচ করে যেতাম না।" ডব্রলোক খুব ক্রীতভাব হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু আপনি না খাওয়ালে নিজে থেকে পরমা খরচ করে যেতাম না। শরীরকে এভাবে কন্টে দেবেন না। ঠাকুর তো টাকা পরমা একবারে দেন নি, তা নয়। এবার থেকে বন্ধন এখন তৃষ্ণা পাবে বা খিদে পাবে দরাক ক'রে কিছু, কিনে যাবেন।" কী ব'লল? সত্যি মনে মনে হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ ডব্রলোকের মূখ দিয়ে ঐ কথা ক'লেন, তাঁর মনের ভাব, 'দেখ, তুই যদি এভাবে শরীরকে কন্টে দিস, না খাব, আমি কতবার হাতা থেকে লোক ধরে ধরে এনে তোকে খাওয়াব বল? তুই যদি একটু শরীরটার দিকে নজর দিস, তবে আর আমাকে এত কন্টে করতে হয় না।" এর পরও কি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার অবিশ্বাস করব? কল না যে তাঁর নাম করলে তাঁর চিন্তা করলে সত্যি আমার মূখ হ'ল শান্তি হয়?

আর একটি কৃশা কাহিনী বলই এবারকার মত ক্যান্ড হব। যদিও কাহিনীর শেষ নেই। কশীতে গ্রীষ্মঋতুর একটু সেবার কাজ করাচ্ছেন। ওখানে ঠাট ঘর ভাড়া নিয়ে একটু জেরা করছেন গ্রীষ্মঋতু—প্রায় প্রাতি একমাস সেখানে অজ্ঞত সেখানে যেয়ে বিবাদের নতুন কাণ্ড, শীতে কখন প্রকৃতি দেওয়া হয়। কশীতে বিবাদের কড় কড়! সাহায্য করার কেউ নেই। অর্থ বৃদ্ধি বড় কড়! থাকেন। অজ্ঞত সকলেই প্রায় বিশেষ সম্প্রদায় বৃদ্ধি। আমরা এসে নবো ৩০০ জনের মত বিবাহকে বছরে ঠাট নতুন কাণ্ড ও শীতে একটি করে কখন সেবার চেষ্টা করি। একবার কালী থেকে বন্দান দিয়ে কিশোরী। হাতে মাত্র ঠাট টাকা রয়েছে। আশ্রমবাসী সত্যগোপাল কঠিন অসুখ নিয়ে হাসপাতাল গেছেন। তার কন্দুরাও সব সেইদিনই হাসপাতাল থেকে ওকে আশ্রমে এসেছে। সে বেশ পূর্বল। বন্দুরা এসে বলেন, “স্বামীজি ডাক্তারবাং সত্যের জন্য এইসব আশ্রমে এসেছে। আপনি তো হবে ক্রান্ত হয়ে কালী থেকে মিরেছেন, যদি আমাদের গোটা ২০ টাকা দেন, তবে আমরা এসব ওকে কিনে দিয়ে যেতে পারি। আপনাকে তাহলে আর কোনও পরিশ্রম করতে হবে না।” বৃদ্ধি সবত প্রস্তাব। কিন্তু হাতে তো মাত্র ৫ টাকা যদি ওদের দিল, ‘তাই হাতে টাকা নেই, তোমরা এখনকার মত কিনে দিয়ে যাও, পরে টাকা দিয়ে দেব।’ তবে হস্ত আর টাকা নেই। তাই ওদের কলাম, “ক্রান্ত হয়ে আসা সত্যও কলকাতার কেন্দ্রেই হবে। নিজেই এসব কিনে নিয়ে আসব। তেমনদের আর বড় করতে হবে না।” মনে মনে ভাবছি, কলকাতার যাতায়াত স্টোর্স আছে। ওখানে গিয়ে বিপদে পড়ে টাকা চাইলে হাজার টাকা পসর দিয়ে দেয়। ওখান থেকে ২০ / ২৫ টাকা নিয়ে সব কিনে আনা যাবে। এদিকে আর একটা কারণে একজনের সঙ্গে কথা বলতে করতে ঘেরী হয়ে গেছে। বাসে উঠছি প্রায় ৭৫ টার সময়। মনে মনে উচ্চৈশ্ব, চিন্তা বর্ধিত। দোকান তো সারি ৮টার কথ হয়ে যাবে। কলকাতা যেতে ছেড়ে তো ৮৫ টা বেজে যাবে। তাহলে সত্যের পছন্দ কিনে কি করে? এইসব ভাবছি আর চোখ বৃজে গ্রীষ্মঋতুর কথা ভাবছি ও নাম করছি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা উপনিষদে যদি ধান কিভাবে করতে হবে, তাতে বলেছেন, “ঐ প্রবো ধনঃ শরোহ্যাত্মনা ব্রহ্ম তন্মহা হৃতাতে। অপ্রমত্তেন বেৎন্য শরবত্তমরো ভবেৎ ৮” প্রসব বা গুরুমত মন হ’ল বন্দু, শর হ’ল আশা, ব্রহ্ম বা ইষ্ট হ’ল লক্ষ্য—অপ্রমত্ত ভাবে অর্থাৎ অন্য কোনও কিছু না ভেবে শর যে ভাবে লক্ষ্যে গিয়ে সেই ভাবে আশাকে ইষ্ট মিলিয়ে যাও। সে যখন ছিল তাঁর নেতের হৃদয়, তাই যদি ধানকে এই কৌশল দেখানেন। বাসে উঠলে তাই মনে করি—বাস বেন ছুটে চলেছে ইষ্টের দিকে নিজেও সেই সত্য তাঁরই দিকে ছুটে চলেছি। বাসনা কামনা সব লিঙ্কনে ফেলে। খুব ভালো লাগে এইভাবে ধান ও রূপ করতে যখন কোনও চলল ধানের মধ্যে থাকি। যাইহোক এইভাবে নাম করতে করতে চোখ বৃজে চলেছি। চোখ খোঁজা অবস্থার অভাব করলাম, পাশের ভগ্নলোক উঠে গেলেন। বাসে তো আর খালি জায়গা থাকে না। আর একজন এসে পাশে বসলেন। নিজে তো চোখ বৃজে নাম করছি। চোখ মেলে চাইতেই ঘোঁষ পাশের ভগ্নলোক খুব বিনীত ভাবে ২টি ২০ টাকার নোট নিয়ে বললেন, “স্বামীজি, আপনি যে চাঁদা তোলার রসিদ বই দিচ্ছিলেন, সে বাব তো আপনাকে কিছু দেওয়া হয় নি। আপনি এখনকার মত এই ৬০ টাকা রাখুন। পরে হিসাব করে সব দিয়ে দেব।” চিন্তে পারছি না যেহে ভগ্নলোক বলেন, “আমার চিন্তে পারছেন না? আমার নাম লক্ষ্মীনাথ দত্ত। পোর্টকমিশনে কাজ করি। সেই যে বছর দুই আগে একটা রসিদ বই নিয়ে গেলাম, বলছিলাম আমার জন্য টাকা তুলে দেব। সে টাকা তো কিছু দেওয়া হয় নি। সেই বাব এখনকার মত এই ৬০ টাকা রাখুন।” তখন মনে পড়ল সত্যিই তো ইনি আমাকে সাহায্য করছেন চাঁদা তুলে দিয়ে হল রসিদ বই নিয়ে গেছিলেন। কিন্তু অনেকবার ছেলের পাঠিয়েছি, টাকার জন্য। নানা কারণে তারা টাকাও পাায় নি। রসিদ বইও ফেরৎ আনতে পারে নি। সেই লোক আজ সত্যের বাসের মধ্যে এসে সেখান টাকা দিয়ে গেল। ছেলের হাতে টাকা সেই সেখান লোককে উঠিয়ে দিয়ে পাশে একে বসিয়েছিলেন। পকেটে টাকা দিয়েছেন ওর মনে ধানের ভাব টুকিয়ে দিয়ে পকেটে পুরানো দিয়ে দিয়েছেন। এরকম আরও অজ্ঞত উদাহরণ এ গীতের

ঘটেছে। সোলা কথা এই যে যদি $H_2 + O_2$ যোগ করলে জল হয়ে যায়। বার বার যোগ করছি—যেখানি জল হচ্ছে। তাই এটা হ'ল একটা। বিজ্ঞানের নিয়ম যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন একমাত্র মেশালে জল হয়ে যায়। সেইরকম সারা জীবন ধরে যদি দোঁধ সর্বত্র বণ্ণনে পড়লেই তিনি এসে রক্ষা করছেন, তখন কে বৃক্ ফুলিয়ে বলিবে না। ঠাকুরকে ডাক, তাঁকে স্মরণ কর, তাঁর শরণাগত হও, দেখবে সর্বদা তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, সব বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করার জন্য।

তাই পুনরায় খ্রীষ্টীয়াত্বের আশ্বাস বাণী শোনাই। খ্রীষ্টীত্বের বলেছেন, জগতের সব তপস্যা আমি করে সেলাম, তোমার কিছু করতে হবে না। তোরা কেবল আমাকে ডাকবি। আমার চিন্তা করবি। যে আমাকে ডাকে, আমার চিন্তা করবে, সে আমার ঐশ্বর্য পাবে। আমার ঐশ্বর্য জ্ঞান, ভক্তি, দৈবিক, ঐশ্বর্য, শান্তি, সুখ, প্রেম, সমাধি।"

—১১—

কে যেন বলে

স্বামী বিমলানন্দ

কে যেন বলেছিল

জীবনটা একটা গল্প এবং

সে গল্পটা বানিয়েছে কোনো এক মূর্ত্যোত্তম স্রষ্টা,^১

আর সে গল্পটি প্রত্যেক জীবনেই রূপ নেয় নাটকের—

পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে সে নাটকে অন্য সবাই পাশ্চর্য্য!

আবার কে যেন বলেছিল,

জীবনটা একটা লম্বা ঘুম,^২ আর সে নিদ্রা স্বপ্নময়—

সেই স্বপ্ন বৈচিত্র্য আছে, বার্ষতা ও সাফল্যও আছে

স্রোত অচেনার ভীড় আর লত লত সাধ ও সাধনা

শেষের মূর্ত্ত^৩ এসে জাগ্রত দিয়ে বার,

ভেঙে বার স্বপ্নটোও।

কে যেন বলেছে আরো স্বপ্নের বেঁচে থাকার এ জীবন

যেন একটা টিলা কিংবা মালভূমি

এপারে ওপারে বার রহস্য, শূন্য রহস্য,^৪

তার মাঝে জীবনটা অস্তরীণ

অন্ধকার কেঁড়াঝলে যেন একটা ট্রুট^৫ ফোকাস।

হৃৎস্পন্দর জাল বুনে রহস্যের অস্তরালে কি কি আছে তাও

কেউ কেউ বলে। 'মা' 'মা' থেকে সূত্র^৬ করে

'কল হরি হরি বোল' এ সীমারহিত পার্শ্ব^৭ অস্তিত্ব

অর্চ্যপূজ্য অস্তরীণ খনি।

এবং কে যেন বলেছিল,

জীবন একটা সপ্তাহ, যে সপ্তাহে মৃত্ত^৮ শ্রেণী

শোবক আর শোষিত।

এ সপ্তাহে কেউ বা হারিয়ে বার, কেউ হয় নির্বাসিত,

কেউ কেউ গুলিবিদ্ধ, আরো কেউ অবহেলায় পরিত্যক্ত।

জীবনের গল্পটা সপ্তাহমুখর এক স্মরণীয় ঘূর্ণজড়ানো

নাটকের মতো, তবু এই নাটকেই জেগে ওঠা আছে

জীবনকে নৈরাশ্যের নৈরাশ্যের কুমাখা ছিঁড়ে

অর্থহীন করে।

মনে ওঠে, কী রূপ সে জেগে ওঠা?

পশ্চিমের স্তর থেকে ইন্দ্রের জাগা, নাকি

ইন্দ্রের মধ্যে থেকে ঐশ্বর্য প্রকাশ?

কেউ বলে এ ভাবনা আত্মপ্রশ্ননা আর

কেউ বলে—না গো না, এ এক চিরন্তন আশ্বার প্রকাশ।

পাগল ঠাকুরকে আজ মনে পড়ে তাই,

বলেছেন, যেখানি যে ইন্দ্রকে আমি, জীবনের

উদ্দেশ্য এই ইশ্বর লাভ^৯।

এ বিশ্বাস রেখে গেলে সব পেতে পারি

জীবনের মানে একটা হৃদয়ে পেতে পারি

আমার তোমার মধ্যে মজাদার যে মোকদ্দমা বসে আছে

তখন সে জগতের সুখে দুখে, ফুলে বা কাঁটার

সে রক্ত বালির দেবে, যে রক্তের মজা আছে অবদান নেই।

ঈশ্বর, জীব ও সংসার সম্পর্কে উপবাস আদি শঙ্করাচার্যের চিন্তাবাদ

লেখক—অশ্বপুত্র শঙ্করাচার্য্য স্বামী ভারতী কৃষ্ণতীর্থী মহারাজ

অনুবাদ—শ্রীশ্রুতি কৃষ্ণোপাধ্যায়

(১২)

শ্রদ্ধা সমাধান—

এখানে এটা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, 'আচ্ছা আমরা যদি ঈশ্বর হই, সজ্জানন্দ স্বরূপ হই এবং মৃত্যু; অজ্ঞান এবং দুঃখ কেবল উপলক্ষ, যা বাহ্য কারণে উৎপন্ন হয় এবং বাইরে থেকেই আসে তাহলে আমাদের নিজেরদের জন্য কোন কিছু করার প্রয়োজন কি? অজ্ঞান এবং অসুখ—উভয়গুলোর উক্তার মত আপনা থেকেই ভ্রমণা; কীশ হয়ে চিরদিনের মত আমাদের থেকে কি আগাবা হয়ে যাবে না? এর উত্তর হচ্ছে এই যে 'হ্যাঁ' পরমজ্ঞান যদি এমনই রেখে দেওয়া হয় তাহলে বর্ষাসময়ের আপনা থেকেই ঠান্ডা হয়ে যাবে, কিন্তু আমরা এটা ভো বর্গিনি যে আগুনের ওপর রাখা স্ফটিক ঠান্ডা হয়ে যাবে। আগুনের ওপর রাখা থাকলে তা ঠান্ডা হওয়ার পরিবর্তে আরো গরমই হবে। এইরকম দুঃখের জীবনের যে যে কারণ রয়েছে সে সব যদি অপরিবর্তিত থাকে, অপরিবর্তিত রেখে দেওয়া যায় তাহলে যদি অজ্ঞান এবং দুঃখ অপরিবর্তিত থেকে যায় তাহলে তার পরিণাম স্বরূপ দুঃখ এবং ক্রোধ কিভাবে কীশই বা হতে পারে আর আমরাও আমাদের হৃৎকন্দর পুড়ত লক্ষণ যা অবার, সনাতন, আনন্দ সে সবই বা কিভাবে পাব?

এ বিষয়ে একটা প্রশ্ন হতে পারে যখন এক ঈশ্বরই সত্য আর বাকী সব মিথ্যা তাহলে আমরা দুইটি মিথ্যার কথা থেকে—অর্থাৎ পুণ্য এবং পাপ এই দুয়ের মধ্যে পাপ পরিত্যাগ এবং পুণ্যের গ্রহণ, এরকম পংখিভেদ কেন করব? এর উত্তর সন্দেহের এই নীতিবাক্যে দেওয়া হয়েছে—“কটকং কটকেনৈব গরেন চ যথা গরম্।” তোমার পায়ের তলার যদি কোন কাটা বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে তুমি এটা নিশ্চয়ই চাইবে যে কাটা বের করা হ'ক এবং তার ব্যাধি হওয়া যন্ত্রণা দূর হয়ে যাক। এই কাটা কিভাবে বের করবে? সূঁচ দিয়ে, পিন দিয়ে অথবা অন্য কোন কাটা দিয়েই। তখন তো এটা বলবে না যে এটাও কাটা আর গুঁড়ো কাটা, দুটোই কাটা এর মধ্যে প্রভেদ কেন করব? কাটা তো দুটোই কিন্তু গুঁড়োর মধ্যে পার্থক্য শূন্য এইটুকু যে একটা কাটা দুঃখের, অন্যটা দুঃখ দূর করে। যেহেতু কোন ডাক্তার কোন বিষকে নষ্ট করার জন্য যে ওষুধ যেন সেটা ওই বিষকে নষ্ট করার প্রতিবিষই (এ্যান্টিডোট) হয়ে থাকে, যেটা ওই বিষের চরিত্র বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত। এতে সন্দেহ নেই যে দুটোই কি, কিন্তু দুটোর মধ্যে মস্তকর পার্থক্য হচ্ছে এই যে একটা হচ্ছে জীবন নষ্টকারী বিষ, অন্যটা ওই প্রসঙ্গে জীবন রক্ষাকারী বিষ। পাপ এবং পুণ্যের ব্যাপারটাও তাই, দুটোই মিথ্যা এবং একই রকমের মিথ্যা, কিন্তু দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে পাপের মিথ্যাক্ষেত্র (শাস্তি এবং অন্তর্ভুক্তি ব্যাধিও প্রমাণিত) রূপ হচ্ছে তাই যা কষ্টের এবং দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং পুণ্যের মিথ্যাক্ষেত্র রূপ হচ্ছে এটা যে, সে দুঃখ দূর করে এবং সুখের কারণ হয়। দুঃখ গ্রহণে যদি তোমার কোন আশ্রয় না থাকে তাহলে পাপ গ্রহণও কোন আশ্রয় নেই, কিন্তু যদি তুমি দুঃখ গাও তাহলে তোমাকে পুণ্য করতে হবে এবং তারপর আমাদের শাস্তি বলে যে প্রথম ঘটনা যখন অন্য কাটা ব্যাধি উপস্থাপিত হয় তখন যেহেতু দুটো কাটাই ফেলে দেওয়া হয় তেমনিই যখন পুণ্য পাপের প্রতি বিধে পরিণত হয়ে তাকে নষ্ট করে তার কাজ পুরো করে ফেলে তখন পাপ এবং পুণ্য উভয়কেই ফেলে দিতে হয়—“উভে পুণ্যপাপে কিং।”

যেভাবে প্রশ্ন বা কোন জিজ্ঞাসা করতে পারে, পুণ্য এই নর জিজ্ঞাসার বা কথা উচিত তা হচ্ছে এই—অজ্ঞান, যদি এরপর আর কোন পাপ না করা আর আর এইভাবে দুঃখজনিত জ্বরের নীচে থেকে আসলে সরিয়ে নেওয়া যায় তখন তো জল আপনা থেকেই ঠান্ডা হয়ে যাবে? যদি তাই হয় তাহলে এইটুকু বলার পরামর্শ নয় যে পরে আর কোন পাপ করো না। আত্মসংস্কার এবং তার আনন্দের উপার হিসাবে আত্মার এবং পরমাশ্রমের সঙ্গে তার তামাশার বাস্তবিক শব্দগুলোর প্রবণ-কন্দ এবং নিষ্কাম্যসনও আবশ্যিক কেন করা হয়?

এই প্রস্তর উত্তর দিগে—

(১) হ'ল, আগুন যদি একদম সরিরে দেওয়া হয় এবং তা যদি বরাবরের জন্য সরিরে দেওয়া হয় তাহলে জল অকস্মিৎ ঠাণ্ডা হবে, কিন্তু এটা ঠাণ্ডা হতে বড়টা সময় লাগবে তা তোমার ইচ্ছাধীন হবে না, বরং বড়টা তাপ পর্যাঙ্ক জল পৌঁছে থাকবে, তার ওপর নির্ভর করবে। কিন্তু তোমার যদি এমন পিপাসা পায় যে থাকা থাকে না এবং জল ঠাণ্ডা হওয়া পর্যাঙ্ক অপেক্ষা করা অসহ্য হয় তাহলে এই বসার কাজ হবে না যে 'জল বহানময়ে ঠাণ্ডা হবেই' এর জন্য কোন উপায়ই করতে হবে। (যেমন জলকে একটা পাত্র থেকে অন্য পাত্রে ঢালা, বরফের সঙ্গে রাখা ইত্যাদি।) যাতে জল শীঘ্র ঠাণ্ডা হয় ওই কথা এখানেও। আমরা পানের ওপর পান করে স্তুপাকৃতি করে এলোঁছি কেবল এই ক্ষমতাই নয়, অসংখ্য জল বা আগুন কেটে গ্যাছে, তাতে এসবই করে এসেছি আর এইজন্যই রাশি রাশি দুগ্ধ, ক্রেম এবং দুগ্ধগতি আমাদের হিসাবে চাপানো আছে, যদি এসব পানের শেষ হওয়া পর্যাঙ্ক সারাটা সময় তুমি এদের নষ্ট হওয়ার প্রতীকাত্মে কাটতে পারো এবং পরে কোন পান না করে থাকতে পারো তাহলে আমরা কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি একে অসম্ভব মনে করছো—এবং এই সমস্ত ঘটনা তাড়াতাড়িই শেষ করতে চাচ্ছে। যদি তোমার কোন বাধা, দুগ্ধ বা ক্রেম না হোত, তাহলে তো আমি তোমাকে কোন রকম ঔষধোপচার করতে বলব না। কিন্তু দুগ্ধের অনুভূতি তো তোমার হয়ে থাকে এবং যতকণ পর্যাঙ্ক হয়ে থাকে ততকণ পর্যাঙ্ক ঔষধোপচারও প্রয়োজনীয়ই। যদি আরনার তোমার দুগ্ধ দ্বাখাতে এমন কোন প্রতিবন্ধ দ্বাখা না থাকে, যেটা আপত্তিজনক তাহলে তোমার চোখ বন্ধ করে নেবার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু যতকণ পর্যাঙ্ক তুমি প্রতিবন্ধকে দেখছো এবং যতকণ পর্যাঙ্ক তুমি এরকম দেখতে না চাও ততকণ পর্যাঙ্ক আরনার সাহায্যে নিজের চোখ বন্ধ করে নিতেই হবে। ঠিক সেরকম কথাই এখানে বোকা উচিত। যদি তোমার কোন দুগ্ধ না থাকে সত্য শাস্ত্রের সবে সূখী থাক তাহলে তুমি আপন উদ্দেশ্যপূর্ণ করে ফেলছো, নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে গ্যাছো, এখন তোমার জন্য প্রত্যাগী মাথাঘের কোন দরকার নেই, কিন্তু যদি তুমি দুগ্ধই হও এবং দুগ্ধ থেকে দুগ্ধ চাও তাহলে তা গরম জলকে দুগ্ধ ঠাণ্ডা করার পদ্ধতির মত এখানেও প্রকা মননাদির মাধ্যমে বিদ্যমান, আর দ্বারা সমস্ত সাক্ষিত পাপকে অতিক্রম করে তুমি শীঘ্র মোক্ষ লাভ করতে পারবে।

(২) আর, তারপর গরম জলের নীচে থেকে আগুনকে সরিরে নেওয়ারই বা এখানে কি অর্থ? এই প্রস্তর উত্তর শুধুই ঠিক হতে পারে এমন এটা সঠিকভাবে জানা যায যে এখানে আগুন বলতে কি বোঝানো হয়েছে। শাস্ত্র বলেন—'দোষ অবিদ্যাকামকর্মভিজ্ঞ' এবং নিজ অনুভূতিদ্বারাও এটা জ্ঞাত হয় যে তিনটে এমন ব্যাপার রয়েছে আর দ্বারা আমরা বাঁধা পড়ে বাই এবং আর জন্য আমাদের বারবার এই সকল বিবিধ শরীরে জন্ম নিতে হয়, তারপর আপন আপন অশাস্ত্র মর্ত্যশরীরে বন্ধ হয়ে নিজ সত্যদ্বার পরমাশ্রয়ী হুলে বাই। এই তিনটি বিষয় কি কি? এই তিনটে বিষয় কি কি? এই তিনটে বিষয় হচ্ছে—(১) নিজ অনন্তক্ষমতায় বিষয়ে অজ্ঞান বা অবিদ্যা এবং (২) এই হেতু 'কৃত্ত পদার্থ' সকলের ইচ্ছা বা কাম এবং (৩) এসকল কর্মপরাগের জন্য নানাবিধ মূর্ত্যাদর্শকর্ম।

অবিদ্যা থেকে এই কালের সৃষ্টি হয় এবং কাম থেকে কর্ম আর তারপর এসকল কর্মের ফল ভোগার জন্য বিবিধ শরীরে জন্ম লাভ হয়, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং সেন্সের বন্ধ হয়ে পড়তে হয়। অন্তঃকরণ জন্ম ফলনের মূল কারণ যে অবিদ্যা, মর্ত্যধীন না তার বিনাশ হচ্ছে ততদিন পর্যাঙ্ক ফলন কখনো নষ্ট হতে পারে না, অর্থাৎ এখানে যে আগুন সত্যন্যের ব্যাপার সেটা আত্মপ্রকাশের আনন্দব্যতির জন্য থেকে অবিদ্যাকে সরিরে দেওয়া এবং মর্ত্যধীন আমরা প্রকা মনন নিবিদ্যাসনের দ্বারা এটা অবিদ্যাহীনী অগ্নিকে সরিরে না দিচ্ছি ততদিন পর্যাঙ্ক মূর্ত্যভোগ আর বিদ্যমান থাকে। এর দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে থাকবে যে প্রকাশি মাধ্যম কেন প্রয়োজনীয়।

মাঝি ডেকেছে !

ঐশ্বর্যশেখর চক্রবর্তী

দিনের শেষে তরী এবার
তীরে লেগেছে !
“পারের বাতী, আর চ’লে আর”—
মাঝি ডেকেছে !
সূর্য নামে অস্তায়লে,
আঁধার ঘনায় পল পলে,
আবছা-ছায়া দিকে দিকে
ও’রে উঠেছে
মাঝি ডেকেছে !

সমুদ্রাশ্রমের হৃদয় আঁচল
পড়ছে ছড়ারে !
তাইত’ মাঝি ডাকছে তোদের
বাহু বাড়ারে !
ক’রলে ধেরী হইবি প’ড়ে
বাটের কিনারে,
কাদিতে হ’বে তোদের তখন
তরী বিনা রে !
আর চ’লে আর আঁহিন্ ধারা,

নইলে ঘুমে হ’বি সারা,
বেলা পোহালে !
পারের তরী ধারে চ’লে
আঁধার ঘনালে !
এখন ধারা ঘুমিয়ে আঁহিন্,
সুখের আবাসে,
নিবিড় রাতের অন্ধকারে
কান্দি তরাসে !
মাথায় নিয়ে ফুলের বোকা,
পারবি নাহো চ’লিতে সোঝা,
পথের মাঝে লক্ষ্য খোঁজা
বুধাই হ’বে রে
পারের বাটে শূন্যতা যে
ঝেঁজেই হ’বে রে !
দিনের শেষের দয়াল মাঝি
তাই ত’ এসেছে !
পারের তরী পারের জরে
তীরে লেগেছে !
মাঝি ডেকেছে !

—:০:—

। ভ্রম সংশোধন ।

ভাস্কর্যের গত আঙ্কন সংখ্যার ১৫০ পৃষ্ঠার ১৭ নং লাইনে “প্রতিমা” পড়িয়া হর, আর ঠিকরে হর না”—এই
কথটির মধ্যে ঐশ্বর্যের স্থলে ‘মানব’ পড়তে হবে । অনবধানতাজনিত এই দুটির জন্য আমরা দুঃখিত ।

মা এসেছেন—অতীত-কাল-জ্ঞান-সারাণী। সত্যের বুক খাটু নন্দিত। সত্যের কাছে যা যে কিছু আপন।
এক সখল মনস্তত্ত্ব মা—করুণাময়ী অপার করুণা—মারের কাছে ৩:১৫ মঃ ২৫ মিঃ ৫০ সেকেন্ড—৩৫ই হে। শ্রী-অমর

কান্তিক : তেরশ^১ একনিবই। ঐমং বানী অংভনানশ মহারাজের শুভ জন্মতিথি... টাইশত তিরাত্ত

আমাদের সার, মা বলছেন, “ছেলে গোধ করতে তো হয়েছে কি? ছেলে কাদা মাটি মাখলে মাকেই তো বুকে মুখে কোলে করতে হবে।” কোনও ভয় নেই আমার ছেলেরের চিন্তা বিতৃষ্ণ মনোরমেরও কথাতো নেই কিছু করে।”

“তোমাদের আর কেউ না থাকে জানেবে একজন মা আছেন”—বাস! আবার কি চাই—একতৃষ্ণ ভরসায় কথা ছেলেকে মা ছাড়া আর কেউ কি বলতে শেয়েছে। সেই আমার সারমা মা—সবার মা। তিনিই গ্রীষ্মমকুমারী জননী সারবা। তিনিই ‘একৈবাতং জগতঃ সিতীরা কা মমাপরা’—মহামায়া কত বাঁধে বাঁধুক না। মাকে বললে মায়ার বঁধন আলগা হয়ে বাঁধে। থাকবে না। মহাসমুদ্রী পূজা শেষ। মায়ের চরণে সকলে পুষ্পার্চন দিলেন। প্রসাদ গ্রহণের পালা শেষ হল। সন্ধ্যার মায়ের আরতি। সম্মানিনী মায়েরা গ্রীসত্যানন্দ সঙ্গীত গাইলেন।

পরের দিন এল মহাষ্টমী—মায়ের মহাবোগিনী বেশ ‘গৌরী-চন্দ্রাধি-বরে মহাব্যক্তবাহিনী’। শিরে অর্ধচন্দ্র রত্নাকর মালা—গৌরিক বস্ত্র এক মহিমামণ্ডিত রূপ। ভাবার কথা করা যায় না।

“সম্বৎসর মরী সত্য সত্যানন্দ সন্ধ্যাপী।

অনন্তা ভামিনী ভাব্যা ভব্যাভাব্যা সন্ধ্যাপী।”

বহারীতি অষ্টমীর পূজাতে এল মহাসম্বৎসর—গ্রীষ্টীচামুদ্রা রূপের পূজা। বলিমান প্রথা শাস্তসম্মত। গ্রীষ্টীকুর অনব্যয় নিয়ম প্রবর্তন করছেন এখানে। কোনও জীব বলিমান নিষেধ। প্রাণের পূজা সার্বিক পূজা। তাই এখানে অনুষ্ঠান অঙ্গলির সাথে আপন বুক চিরে রক্ত বেগুলা হস্ত মায়ের চরণে এ পরম ক্রমে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মহাপূজা শেষ হল। সকলে স্নান পেরে তৃপ্ত। বহারীতি সন্ধ্যার আরতি সম্পন্ন হল।

নবমীর দিন আবার মায়ের রাজরাজেশ্বরী মূর্তি কি অপরূপ! কি মণ্ডিত। আমার মাকে বড়ই সাদান হোক দশহাতে বত অষ্টই থাকুক না কেন চোখ বুটুতে মেহ করুণা করে পড়ছে। সূত্র—অসুর সবাই তো তার সন্তান। সৃষ্টি রক্ষাক্ষেপে ধর্ম রক্ষা করতে হবে ঠিকই কিন্তু অসুর নিবনেও তাঁর চোখে জল। তাই চরণে ঠাই দিয়ে তাদের করেছেন তৃপ্ত। বহারীতি নবমী পূজা শেষে পুষ্পার্চন দিয়ে সাধু ভক্ত সকলে প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

এল সেই দশমী তিথি—কড় করুণ সবার চোখে জল, মা আজ চলে যাচ্ছেন কৈলাসে। না না আমাদের মা তো থাকেন মা তিনি তো নিত্য বিরাজিত। তবে কেন এ রকম হর। হবে না? হাজার হাজার বছরের সংস্কার চিন্তাধারা। তার একটা গভীর আবেদন আছে। তাছাড়া মায়ের এ কদিন যে দুর্গারূপের প্রকাশ হয়েছিল—সে রূপের তো অপ্রকাশ, হুঁকি বিন্দুনের সাথে তাই বেদনাও আছে—ভরসাও আছে। বেদনা—চলে যাকেন হলে—ভরসা তিনি আছেন জেবে।

“মোটে তিনদিন থাকিয়া কাঁপতে আসে নাই হিলোচনী

বরষের পর বরষ বাপিলা রহিবে দিবস বামী”

দশমীর পূজা শেষ। অঙ্গলিমানের পর শান্তি বারি সকলের শিরে বর্ষিত হ’ল—ও’ পৃথিবী শান্তি, অন্তরীক্স শান্তি, কিংবা সোবা শান্তি। সম্বৎসরিত ও’ শান্তিরেব শান্তি অস্তোচ্চারণের সাথে সাথে।

বিজয়দশমীর সন্ধ্যার গ্রীষ্টীকুরের পরম আশিষ গুরুজনের আশীর্বাদ ও সমবহসীদের প্রীতি মিলন এক ছোট্টোরে মেহ আলিঙ্গন।

গ্রীষ্টীকুর এইদিন সকল সাধুদের গৌরিক বস্ত্র দিলেন এবং বিশেষ আশীর্বাদ করলেন সকল সন্তানদের, সেটী বহারীতি অক্ষও চলে আসছে। গ্রীষ্টীকুরের প্রতিবর্ষি হরে সন্ত সন্তাপতি সকলকে বস্ত প্রদান করেন—সকলে গ্রীষ্টীকুরের পুতে পাদুকার মাঝা বুটুতে সেই স্পর্শ পেরে মায়ের পূজা শেষে সারা বছরের চলার পথে পাথর আহরণ করে নেয়।

শ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠিত মণিমাণ্ডরে বৈদ্যনীর মাণ্ড দলচুড়া রূপে এই কর্ণিক পূজা গ্রহণ করেন। শ্রীঠাকুরই এই নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন। এক স্বর্গীয় বিভাষ মণ্ডিত হয়ে ওঠে মায়ের রূপ। শ্রীঠাকুরের ছোট মেয়ে হলে কি হবে দলহাত নিরে সেজেপজে একবারে আনন্দে আটখানা—তখন আর আদুরে দুলালী নয়। অনেক কণ্ঠে হাসিচোপে বেশ গম্ভীর হয়ে বেন বগছে, সবাই দেখ না গো আমার কেমন লাগছে—সবই আমি—জান আমিই কুক আমিই কালী। আমিই দুর্গা আমিই সত্যানন্দ দেখতে পাছ না কুককালীই সত্যানন্দ হয়ে এখানে রয়েছে। তোমরা প্রণাম কর—যা চাইবে দেবে। ছোট মেয়ে হলে কি হয় খুব বুদ্ধি, আদর ক'রে তুলিয়ে ঢালাকি ক'রে যে আসল জিনিস নিয়ে নেবে—তা হবে না—এ ঐষ্টকুণ্ডেই জেগে চালাচ্ছেন, কম নয়। তরিত পূজা চাই—পূজকের আসনে ঠা শান্ত চৈতন্য। চণ্ডীপাঠ করছেন একজন সম্যাসী। পূজারী বেশ শান্তভাবেই ডাকমল পূজা আরতি নির্ভার সূত্র সাধ করলেন সন্তুর্নী থেকে দলমী পর্যন্ত। এই ভাবে আশ্রমে মহাদুর্গাপূজাপর্বে শেষ হল। জয় ঠাকুর

—১৪—

সম্পাদক—ভাবমুখে

তখন তুমি

(ঐষ্টাঠাকুর সীতারামদাস এভারনাথদেবকে নিবেদিত)

ঐবাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পি-জি-বি-টি

আঁধার বন্ধন আসবে নেমে

চলার পথে

ভাবগরকম লাগবে একা

এই কক্ষতে।

দারা-সুত আর পরিজন

থাকবে পড়ে আপন-আপন

তখন তুমিই কাছে এসো

বালোর রথে।

(২)

কিনবা আমার ছাড়বে বারা

অবহেলায়

তুচ্ছ জ্ঞানে থাকবে থলোর

হেলোফলার।

এই উপেকার দায়ণ দিনে

আর কে আপন তুমি যিনে—

হলো ক্ষেড়ই তুলবে তুমি

অলৌলার।

(৩)

অটিলম্বাহের কুটিল বাহে

থাকবে বন্ধন

প্রান্তি নিরে পদ হবে

সচল জীবন।

আরাধ্যন পরমজনে

রাখবে বন্ধন কিম্বরণে

তখন তুমি তুলো না গো

অমম তারণ ॥

॥ মহাপ্রয়াণে সন্ন্যাসিনী উষাপুরা ॥

সম্বৎসর পঞ্চমাব্দে শ্রীমত্যানন্দদেবের আশ্রিতা সন্ন্যাসিনী উষাপুরী মাতা গত ভাদ্রে শ্রীমদ্রু চরণে লীন হইয়াছেন। আগ্রমে তাঁহার ধর্মজীবনে তিনি শ্রীমদ্রু দেবার দুলভ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। উদ্‌লোকন্যাসিনী এই বর্ষেরই এই সন্ন্যাসিনী মাতার আত্মা শ্রীমদ্রু চরণে চিরশান্তি লাভ করুক।

॥ মহাপ্রয়াণে শ্রীপদ্মপতিনাথ যুথোপাধ্যায় ॥

জগদগুরু। সম্বৎসর ও স্বর্গীয় আচার্যদেব শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্য-সন্তান লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট শ্রীপদ্মপতিনাথ যুথোপাধ্যায়, প্রতিষ্ঠাতা মেনার্স পি. এন্. যুথোপাধ্যায় এ্যাণ্ড কোং; ১১, ওল্ড পোস্ট-অফিস স্ট্রীট, কলিকাতা-১; গত রবিবার, ২২শে অক্টোবর রাতি সাড়ে নয় ঘটিকার ভবানীপুত্রের তাঁর নিজ বাসভবনে সম্ভ্রান্তে শ্রীস্বাম্যকুলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন।

তিনি ছিলেন ভবানীপুত্রের প্রখ্যাত দেওয়ান গোরারাম যুথোপাধ্যায়ের বংশধর। পিতা বৈদ্যনাথ যুথোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র শ্রীপদ্মপতি নামের জন্ম ১৯২০ সালে, বহুসপতিবার। ১৯৪৭ সালে লন্ডন হইতে চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্টস পাশ করিয়া ১৯৪৮ সালে কলিকাতার উপরোক্ত অফিস স্থাপন করেন। তাঁহার পত্নী গৌরীমণী শ্রীচাকুরের পুত্র্যশ্রমের সহিত সম্পর্কিত হওয়ার গুরুপিতা শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের সহিত প্রথম হইতেই তাঁহার নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং শ্রীশ্রীস্বাম্যকুল আশ্রমের আইনগত ব্যবসায়ী হিসাবে নিকাশের দায়িত্ব তাঁহার কোম্পানীর উপর ন্যস্ত হয়। শ্রীশ্রীচাকুরের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৪৬ সালে বরাহনগরের শ্রীস্বাম্যকুল আশ্রমে গঙ্গার ধারে। গত ২১শে অক্টোবর, ১৯৮৪, শ্রীযুথোপাধ্যায় অমরলোক বাত্যা করেন। বহু কর্মক্ষেত্রে অর্ধাশ্রিত থেকেও শ্রীপদ্মপতিনাথকে প্রায়শই দেখা হেত গুরুভাবে ভাবিত, গুরু চিন্তায় নিমগ্ন, গুরুদ্ব্যানে ধ্যানস্থ। নানোভাবে সাহায্য স্বাক্ষাও আগ্রমে তাঁর নিঃশ্বাস বহুদান আজও তাঁর স্মৃতি বহন করছে। গুরুদেবে আত্মসমর্পণের বোধ করি এইই বিধি। তাঁহার স্ত্রী, এক সন্তান ও এক কন্যা বর্তমান। তাঁহার অমর আত্মা শ্রীমদ্রু চরণে চিরশান্তি লাভ করুক ইহাই প্রার্থনা।

ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

স্বত্ব অমৃত করে দান

সেই সব মহাজীবনই সার্থক ধারা ঢালে যাবার পর (বাবা) যায় একটি ব্যক্তিত্ব কত বিপুল শূণ্যতার সৃষ্টি করে দিতে পারে। অমরত্বের দাবি আছে, তবুও মহাকাল স্রোতে সবস্মৃতির স্নানিমা আসে, কিন্তু মহা মাতৃশক্তি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যেভাবে অকস্মাৎ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন—তার স্মৃতি অতলস্বর্ণী এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মরণের বহুৎসবে যে অমরার প্রদীপ তিনি জ্বালিয়ে গেলেন তা ভারতের বুকে চির অম্মান থাকুক, আর ভারতকে দেখুক নূতন রূপরেখার আলোকবর্তিকা। সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে আমরাও শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আমাদের সমবেত প্রার্থনা জানাই ইন্দিরা অমর হউন।

Srimad Devi Bhagavatha Mahatyam

By courtesy of Sri T. B. Manon

West Bengal and Kerala are at two corners of India, north-east and south-west, which, though far away, one to the other, have a close affinity in several respects. Climatic conditions, proximity to the ocean, a long coastal line and a marine culture, food habits clothing, typical villages, vast rivers even people's facial similarity, worship of the universal Mother in the form of the great Kali Mata and the Shanti-faced Durga, etc. are all points of sameness and one-ness, which do not fail to catch the eyes and thoughts of even an informal observer. Even the language of both the states—Bengali and Malayalam—owe a great deal to mother sanskrit, although both languages are entirely different, when pronounced and spoken. The village men and womenfolk working in paddy fields, i.e. culturing, replanting, reaping, husking, etc. look similar, but one distinguishes them from the other only when language is spoken and the folk songs they are singing are closely listened to.

The system of Goddess worship and singing the glory of the consort of Lord Siva are perhaps never practised in any other part of the country as rigorously in the same form and methods as in West Bengal and Kerala. It is this fundamental reason, which explains religious pundits, that Srimad Devi Bhagavatha Mahaynam which in days of yore used to be conducted in all parts of this holyland, is now perhaps confined to the two corner states of our mother land. It is for this reason also according to the learned scholars that those capable of performing this difficult yajnam are only few in number today.

Of all the eighteen vedic puranas, Srimad Bhagavatham (Vishnua) is the most popular, and very rarely there would be a Hindu home which does not possess this holy grantham and worship same as Ma Saraswathi. Srimad Devi Bhagavatham is one of the difficult sanskrit literature, and with an air of modesty we can say that even closer studies of this holy grantham have not been sufficient. Both the granthams deal with the various avatharas-incarnations of God as human being to protect the righteous and destroy the wicked. The story of the demon-king, Mahishasura, being killed by Durga-Devi is the story of glory of success of good over evil. All the incarnations of the Goddess and her hand-to-hand fight with the wicked demons form the Devi Bhagavatha yajnam.

Of all forms of worship in this Kali-yuga, Nama-Sankirtanam and Sath-Sangam are the surest ways of realising liberation, moksha. People who were born in the Dwapara-yuga and who attained Moksha by penance and Nachikethas (the supreme fire) appeared to have prayed for their re-birth in Kali-yuga, simply because of the simplest methods of God realization, i.e. by the Sath-Sangam and Nama-Sankirtanam, as compared to the arduous methods of the days of yore.

The Truth of Yajna

Sri Sri Baba Thakur

[10]

Guru is so worthy of true worship and meditation. His body (form) is the best object of meditation. His words and teachings are essence of mantras. And his lotus feet are real object of worship. In a word devoutful service to Guru is the real form of upasana. There is no spiritual sadhana or austerity greater than the worship of Guru. Truly speaking Guru is the fulfilment of all laws, all ideals, all goodness and all virtues. He embraces all beings, and all becomings.

The best way to serve Guru is to accept and embrace Him in all beings. That is to say, to love and serve all beings as Guru Himself is the best means for spiritual perfection and highest liberation. To serve Guru means to serve the entire creation with equal spirit or with the knowledge of Infinite oneness.

Since Satguru is the supreme and fundamental reality and ultimate essence all gods and goddesses are but His different aspects. As He is the supreme One or the Absolute Being His sakti is also one and infinite. He and his sakti are not different but one and the same. Where there is display of sakti there is Guru and vice versa. The worship of different deities is the worship of Guru in different aspect without proper knowledge. But the worship of Guru is in reality the worship of all deities.

Greatfulness which is the most important in the worship of Guru makes the disciple obedient and loyal to Guru. And ungreatfulness is a disqualification which makes the disciple disobedient and disloyal to Guru. Since Guru is the true Self (Siva) of all beings His real bhava is felt within the heart of a greatful and devoutful disciple. In fact guru consciousness is self-consciousness, which is awakened within the heart of an individual (sadhaka) through self-meditation, self-analysis, introspection, love and all surrender. One's own consciousness is an inseparable part of guru consciousness. To become happy in the prosperity of others and to become unhappy in the misery of others both are signs of one's own consciousness. Sympathy and love unfold one's own consciousness. With the expansion of own consciousness equal vision develops. Equal vision or one love for all provides the best service to Guru. Insincerity which is born of ungreatfulness and little knowledge is ignorance. One having such insincerity can not render real and proper service to Guru and due to it one shows disregard, disrespect and dishonour to Guru. Only through the sincere culture of equal vision or unity of consciousness will all service to Guru be well done and thereby the highest honorarium is paid to Guru (preceptor). As a result of paying such honour to Guru the influence of little knowledge goes away. Equal vision or knowledge of Infinite oneness (Divine Oneness) and Satguru have the same meaning. Thought of undivided one consciousness is verily the thought of Guru. To reflect and meditate on supremely

one consciousness (Divine or Self Consciousness) is in essence to reflect and meditate on Satguru. To perform all actions through equal vision or unity of consciousness is true service to Guru. In & through the thought of Guru Guru-sakti itself works in sadhaka. That means in & through the meditation or reflection of unity of consciousness power of pure consciousness (super conscious divine power) freely functions in sadhaka. When the seeker's mind gets fully unified with Guru-consciousness or equal consciousness sadhaka becomes himself a Satguru. To become a Satguru means to become one with the divine existence.

The blissful divine lila is the sportful dramatic same side game of self consciousness, power, bliss and love. In this divine game the divine Self Himself is the being and becoming both, universal and individual both, subject and object both, satta and sakti both purusa and prakriti both, spirit and matter both. He is consciousness and energy both, action and result both, cause and effect both, difference and identity both, unity and diversity both, one and many both. Furthermore He is religion and reality both relative appearance and reality both, duality and non-duality both and again He is ever transcendent and beyond also. In this game the most important role that He plays is the role of Satguru. He is personal and impersonal both.

In His personal aspect He is featureful, attributeful and ever related as one with all the becomings, all His devotees and those who surrender themselves to Him for their spiritual perfection, highest liberation and divine realisation. In order to make them purified, faultless, perfect, wholly spiritualised and divinised and make them one with Him or to say, to reveal in them in His full divine nature, He initiates them according to their innate nature, urge and intensity of divine perfection. To the initiated He first defines what is the highest object of attainment the highest good, the truth, immortality and reality and next unfolds the means for their attainment. He discloses to them the secret of spiritual discipline, most fruitful means—the process for the attainment of inner perfection, true knowledge and basic unity with the true Divine Self. He also unfolds the truth of jnana and vijñana (the manifested divinity and the unmanifested), of personal Godhead and impersonal Godhead. He unfolds the science of fourfold celebrated yogas namely karma-yoga, dhyana yoga, bhakti yoga and jñāna yoga—the fourfold means or ways for the attainment of spiritual perfection, liberation and the realisation of truth and divine Self.

The seeker of truth and liberation attains perfection, liberation and self-realisation only through the grace of Satguru. Divine grace comes to the seeker in fourfold manner. They are atma-kṛpā or self-effort (endeavour), sastra-kṛpā or scriptural knowledge, Guru-kṛpā or conscious support of Guru and Iswar-kṛpā, the culmination of the three, which is the supreme. Of these four, the first one is a must, without which the third one i.e., Guru-kṛpā is not attainable and without Guru-kṛpā the fourth one i.e., Iswara-kṛpā is not possible to attain. In many cases without the sastra-kṛpā one can attain spiritual perfection only through the grace of Satguru Who is the embodiment of all knowledge.

This spiritual path is very rugged. It is just like the sharp edge of a razor. There is always chance for pitfall. The divine grace is the only support which most safely carries the seeker to the other side of great ocean of worldliness which is full of wild, ferocious and dreadful creatures and hostile beings. Without such grace none can cross over the ocean of worldliness. It is the all merciful God Who in the form of a Satguru releases and rescues those individuals—Jivas (His inseparable parts lying in bondage of limitations and conventions caused by ignorance—avidya) who most devoutly and humbly surrender themselves to Him, rely upon Him, depend upon Him and always think of Him with intense faith and love.

Satguru and Divine Self are one in reality. God reveals as Satguru and through Him He spiritualises and divinises others. A true devotee by the grace of his Guru the perfect master gradually realises that a Satguru is verily Siva the Divine Self or Brahman. To him Guru is the highest object of worship. By virtue of sincere Guru bhajan he realises Guru as his true self and also the self of all. He is the universe, the universal Self or God and the transcendent as well. His true nature is ever transcendent which never changes under all circumstances even though He appears to be creator, sustainer and destroyer in His sportful dramatic same side game of world drama. In this drama, He assumes multitude of beings (jivas), Jivas are many but their self is one, infinite. On the realisation of Guru in His personal aspect sadhaka tries to realise Him in His impersonal aspect.

The impersonal aspect of Guru is Sacchidananda absolute. He is existence, knowledge, bliss, love and peace absolute. He is eternal existence, the Indivisible one, the infinite one without second. He is pure Intelligence, infinite knowledge, light of all lights, the only illuminator of all, the underlying essence of all, the life pervading truth. He is without beginning and without end. He is endless ocean of bliss, the only substratum of all, the undivided and infinite back ground of all, the everlasting peace, the ever present, the Absolute I of all. The highest realisation is unity of jiva and Iswara with Atman and Brahman. Satguru is the embodiment of Iswara, Atman and Brahman. Hence the realisation of Iswara, Atman and Brahman is the realisation of Satguru and vice versa. On such realisation jiva attains the highest perfection, liberation, immortality and reaches the supreme state whence there is no return. He becomes one with all, all in all, all in one, one in one and one beyond one. He is verily Brahman and Atman Himself and none else,

With Best Compliments Of :



Gram : COKEOVEN, CALCUTTA
Telephone : 24-4492, 24-5930

INDIA POTTERIES LTD.

Manufacturers of :

Electrical Insulators upto 33 kv range as per I. S. Specification

And

Quality Tableware, 'India' Water Filter, Filter
Candles, Figures, Dolls, Toys, Industrial
Ceramics Etc. Etc.

Factory :

8, Nilgunj Road, Belgharia,
Calcutta-700056
Phone : 68-1198

Office :

91, Dharmatala Street,
Calcutta-700013

Regd. No. WB/NC-34

* -BHABMUKHEY

*

Phone : 52-7133

'SAFEX' LAMINATED SAFETY GLASS
TOUGHENED GLASS
"TWINBIRD" MIRRORS ETC.

20 Nov 1964



Manufactured by :

Hindusthan Safety Glass Works Private Ltd.

2, ST. GEORGE GATE ROAD, HASTINGS,
CALCUTTA-22.

Gram : "DEVGLASS"

PHONE : 45-0125 (3 Lines)

প্রজ্ঞাপন পত্র : এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো যাচ্ছে যে, সত্বেশিতা লীমিটেড স্বামী সত্যানন্দদেবের সমাধিস্থল

সংলগ্ন স্থানে—স্বামী অরুণানন্দ ও স্বামী নীলানন্দ।

প্রাথমিক সেবার জন্য, ২নং প্রাণকর সাইন লেন, কলিকাতা-৩৬ হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবে।
বহার্য্য নং, কলিকাতা-৩৬ হইতে মার্চ ১৯৬৫ (৫২-৫২৭৯)।

প্রতি সংখ্যা : এক টাকা পঁচিশ পরসী মাত্র।

১৯৬৫ খ্রিঃ চৈত্র মাসে।



শ্রীরামকৃষ্ণ

ভাবদে

সত্যানন্দ

আবির্ভাব সংখ্যা-১৩৯১

ভারতের মোটর পার্টস্‌ ব্যবসায়
একটি ঐতিহ্যপূর্ণ বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
হাওড়া মোটর কোম্পানী
- লিমিটেড -

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬৫, শরৎ বোস রোড

কলিকাতা - ২৬

প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জি রোড

কলিকাতা - ১

অঙ্গার শাখা—দিল্লী ঃ কটক ঃ বানবাস ঃ পাটনা ঃ শিলিগুড়ি ঃ গোহাটী



DRINK

ORPHAN'S TEA

For

HEALTH & ECONOMY

ORPHAN TEA SYNDICATE

133 Cornwallis St., Shyambazar

Phone : 55-2704

ফোন : ৫৫-৭২৫৬

এন্, কে, স্পোর্টস্‌

৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলিকাতা-১

ধাবতীর খেলাধুলার সরঞ্জাম এবং কাপ
নীলু ইত্যাদি বিক্রেতা বিভিন্ন ক্রীড়ামোদী
কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান।

ঃ

ঔরামকৃৎ আশ্রম পরিচালিত বিভাগীঠ
সংস্থের ধাবতীর প্রয়োজনীয় খেলাধুলার
সরঞ্জাম আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

“হাস্যবের মাঝে হাস্যই স্বভাব আছে”—শ্রীজীঠাকুর



কান্তন
একাদশ সংখ্যা



অষ্টাভিংশ বর্ষ
‘ভেরশ’ একানকই

তোমারে নিবেদন	০৬৭	শ্রীশ্রীঠাকুর
বর্তমান সভ্যতা ও আত্মিক বিকাশ	০৬৮	স্বামী সত্যানন্দ
ফাল্গুনী দ্বিতীয়া	০৭০	স্বামী সাধনানন্দ
আপন সাধন-কথার স্বামী সত্যানন্দ	০৭০	
সত্যানন্দ সাহিত্য	০৭১	
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য	০৮০	শ্রীঅর্চনাপুরী
‘গৌরান্বয়’-এ এক সত্যানন্দ	০৮৪	স্বামী মহানন্দ
কাঁড়ারী গো	০৮২	স্বামী বোধানন্দ
স্বামী সত্যানন্দের শিক্ষা-চিত্রা	০৮৯	ডাঃ গৌরবরূপ কপাট
দেশপ্রেম ও শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ	০৯১	শ্রীসাধনাপুরী
জুপা ব্রহ্ম	০৯৫	স্বামী দিব্যানন্দ
শ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার	০৯৯	শ্রীসন্ধ্যাপুরী

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের নবপ্রকাশিত কয়েকটি পুস্তক

সাধুর চলার পথে	সাধকের জীবনের পথ নির্দেশ	মূল্য—৬'০০
উপনিষদ চয়ন—	উপনিষদের কয়েকটি স্রোতের অমূল্য ব্যাখ্যা	মূল্য—৪'০০
ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও অবতারবাদ—	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবতারত্ব সম্পর্কে নবীন দৃষ্টিতে আলোচনা	মূল্য—৩'০০
৪। আশীর্বাণী—	স্বামী সত্যানন্দদেবের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত আশীর্বাচনের সংকলন	মূল্য—৪'০০

। প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ২, প্রাণ কৃষ্ণ সাহা লেন
কলিকাতা-৭০০০৩৬, ফোন : ৫২-৭১৩০

ফান্ডন : তেরপ' একানমই]

ভাবসুখে

[অষ্টাভিশে বধ : একাদশ সংখ্যা

শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, সকল রকম শীতের পোষাক, বেনারসী, লিড, তাঁতবস্ত্র,
মিলবস্ত্র, সর্গপ্রকার তৈয়ারী পোষাক, হোসিয়ারী ও আধুনিক ডিজাইনের
ডেকরণ, টেরিলিন, টুকিল ও ওয়াস্ এণ্ড ওয়ার শাড়ী বিক্রোতা।

রামকানাই আমিনীসুগুন পাল প্রাঃ লিঃ

বড়বাজার, কলিকাতা-৭ কোন : ৩৫-২৩০৩

**Electrical Motor, Double Ended Grinder, Polishing
& Buffing. Flexible Shaft Grinder Etc.**

MANUFACTURED BY

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2, PRIYANATH MIDDYA ROAD. (Belgharia)

CALCUTTA-700056. Phone : 58-1575

মঙ্গল ডেকরেটিস

ভববিবাহ ও যে কোন উৎসবের

প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৩৫এ, ভবু, লি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

কোন : ৫৫-২১৪৯, ৫৫-৬৫৬৫

Gram DISWASHING

PHONE : { Office : 24-1236
Works : 55-1738

PELICAN ENGINEERS

Fabricators of Stainless Steel Chemical Plants,
Pharmaceutical & Fruit Preservation Equipments.

4. HARTFORD LANE. CALCUTTA-700016.

Works : 161, Upper Chitpur Road,
Calcutta-700005

কল্লিকট কথা	৪০১	ডব্লিউ উমা রায়
বৃন্দ-পদ্যে স্বামী সত্যানন্দ	৪০২	শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্রতী, কাব্যশ্রী
কি সেই কথা	৪০৪	সজীব চট্টোপাধ্যায়
গান	৪০৫	নিবারণ চন্দ্রতী
সুন্দর গদ্য ঠাকুর শ্রীশ্রীসত্যানন্দসেব	৪০৬	কনপ্রভা ডাঙ্গড়া
প্রেমের পথ	৪০৭	শ্রীঅর্চনাপুরী
মহাভারতের কল্পকথা	৪১১	স্বপন বড়ো
শ্রীশ্যামকৃষ্ণ লীলা অঙ্গনের ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়	৪১৭	শ্রীসত্যীন্দ্রনাথ, ভক্তিবর
কথামতে শ্রীশ্রীশ্যামকৃষ্ণের জন্মোৎসব চিত্র	৪১৯	রমা মৃণোপাধ্যায়
বৃন্দ-পদ্যে স্বামী সত্যানন্দসেব	৪২০	করী বসু
মানব পরমী শ্রীশ্যামকৃষ্ণ	৪২২	শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রতিভা করে থাকি	৪২৪	মাক্তশালি দাস
কে এই পদ্যের প্রবান	৪২৫	স্বামী জরুদানন্দ
দ্বৈত ঠাকুর আমার ঠাকুর	৪২৭	স্বামী হীরানন্দ
স্বপ্ন ব্যক্তবে মিলে গেল	৪৩০	স্বামী পূর্ণানন্দ
চুলের কবি সত্যানন্দসেব	৪৩১	শ্রীব্রজনারায়ণ মৃণোপাধ্যায়
"বীণা নিবেদন"	৪৩৪	ডাঃ পদ্মপতি
প্রথম দর্শন	৪৩৬	শ্রীসুধোদ্যাপুরী
তুই যে আমার প্রিয়	৪৩৯	শ্রীজ্যোত্স্নাননাথ মল্লিক
টাকা হারানো	৪৪০	স্বামী সত্যানন্দ
শ্রীশ্যামকৃষ্ণ কথামতে অকল্যাণে—পদ্য আর ছড়া	৪৪২	—প্রবন্ধ
কিশোর শাস্তা	৪৪২	শ্রীযোগেন্দ্রপুরী
মঙ্গল	৩	শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ দেব
গীত	৩	শ্রীঅর্চনাপুরী মা
মঙ্গল	৩	স্বামী শৃগানন্দ
স্মৃতি তীর্থ	৮	স্বামী নিবেদানন্দ
অমিত স্মৃতি	১৩	জ্যোতিষা পুরী
বেদজন্ম	১৪	শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ দেব কী বেদবাণী
The Lord's Play	৪১	Swami Satyananda
Swami Satyananda Deva— a Poet of Divinity		Compiled by Swami Shivananda
World Philosophy, World Ethics and World Psychology three outstanding contributions of Sri Mad		
Swami Satyananda Deva	৪৩	Compiled by Swami Shivananda
Divine Name and the Divine Reality	৪৬	Swami Bimalananda
Ramkrishna Vivekananda Movement	৪৮	Prof. Premlalav Sen
'Sister Nivedita'-or-the dedicated one (1)	৪৯	Kalikinkar Sengupta

কাল্পন : তেবশ' একানব্বই]

ভাবমুখে

[অষ্টাবিংশ বর্ষ : একাদশ সংখ্যা



Phone : 57-4562

TRINAYANI ELECTRIC Co.

Electrical Engineers & Govt. Licensed contractors

145, LAKE TOWN, Block—'A'
CALCUTTA-700089

With Best Compliments from :



RELIABLE ENGINEERS & TRADERS

25, Horachandra Mullick Street
Calcutta-700005

কাল্পন : তেজশ' একানকই]

ভাবযুগে

[অষ্টাব্দিং বর্ষ : একাদশ সংখ্যা]

* আশ্রয় পূর্ব পঞ্জী : চৈত্র, ১৩৯১

০২	চৈত্র,	১৭ই	মার্চ	রবিবার	— একাদশীর উপবাস ও রাতে হোম ।
০৫		২০শে	"	মঙ্গলবার	— বারুণ্যবোণ
০৮		২৩শে		বৃহস্পতিবার	— রাতে অমাবস্যার হোম ।
১১ই		২৬শে		বৃহস্পতিবার	— ত্রীতীয়াসম্বোধের বর্তমান পূজারম্ভ ।
১৪শে		২৯শে	এপ্রিল	শুক্রবার	— একাদশীর উপবাস ও রাতে হোম ।
১৭শে		৩ই	"	শুক্রবার	— রাতে পূর্ণিমার হোম ।
২০শে		৬ই		শনিবার	— রাতি ৯টার বর্ষশেষের হোমানুষ্ঠান ।

* বিগত সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে ।

জাতব্য বিষয়—'ভাবযুগের' ১৩৯১ সালের বাকী চাঁদা ও ১৩৯২ সালের অগ্রিম চাঁদা বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে পাঠাইয়া ঐঠাকুরের কর্মব্যয়ে সহায়তা করুন ।

ঐঃমহাক্ষণ্য ভরসা

৮বামাপন ঘোষ প্রতিষ্ঠিত

নারিকেলডাঙ্গা রোলার ফ্লাওয়ার মিলস্

১৭/৪, কেবল ঠান্ডে রোড, কলিকাতা-৬

স্থাপিত ইং ১৮৮৬ সাল

৯৮ বৎসরের

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ফোন : { ৩৫-৪১২৪
৩৫-৪১২৫

। বহাধিকারী ।

রথেন্দ্রনাথ ঘোষ এ্যাণ্ড ব্রাদার্স

N. G. Chakrabarti Alloy Steels (P.) Ltd.

Manufacturers of :

**Direct Arc Electric Melting Furnaces for Melting
all Grade Steels,
Alloy Steels & Alloy Iron etc.**

MINI MODEL

SR-1—150 Kgs. Batch

SR-2—250 Kgs.

SR-3—500 Kgs.

MAXI MODEL

SR-4—1000 Kgs. Batch

SR-5—3000 Kgs.

SR-6—5000 Kgs.

also supply

**Special Steel and Iron Casting being manufacture
under technical guidance**

and undertake

Projects and Turn-key jobs

Quality : : Guaranteed

Registered Office :

**3-D, NANDY STREET,
CALCUTTA-700 029**

Phone - 42-5197 : Gram : ENGEECEE



শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেব প্রতিষ্ঠিত

অষ্টাদশিৎ বর্ষ	ডেরশ' একানকই	ফাঙ্কন	আবির্ভাব সংখ্যা
----------------	--------------	--------	-----------------

তোমায় নিবেদন ঈশ্বরীচাকর

কাঙারী গো তোমার নামেই করি পারাপার
এই করে হে দহাল ঘেন নিও দীনের ভার ।
মূলের মত গন্ধ বিলাই করে ঘাওয়ার আশা
তোমার পায়েই হে দীননাথ ঠাই যে আমার ।
কাতাল করা সকল ব্যথা তোমায় নিবেদন
হে গদাধর তোমার পায়েই শেষ ঐশ্ব্যের হার ।

বর্তমান সভ্যতা ও আন্তিক্য বিশ্বাস

রামী সত্যানন্দ

বর্তমান সভ্যতার প্রধানত: তিনটি দার্শনিক অবদান ধর্মের বিরোধিতা করতে গাঁড়িয়েছে। এরা যথাক্রমে মের্টারিয়ালিজম্, ফ্রয়েডিয়ানিজম্ আর প্লেজারিভিজম্। ফ্রয়েডিয়ানিজম্‌দের মত এই যে, ভগবানকে মানুষ সৃষ্টি করেছে, ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করেন নাই। তাঁর মতের একটা অংশ আমরা এখানে বিবৃত করছি। শৈশবে আমাদের পিতামাতা ভর সঁপ্তরে আমাদের পড়াশুনা বা সংস্পর্শে নিয়োজিত করেন। আমরা পিতামাতাকে ভয়ের চক্ষে দেখি এবং সেই ভাবে আমাদের নৈতিক জীবন গড়ে ওঠে। এইসব ফ্রয়েডেমেরা কালে যখন এই মানস প্রকল্প নিয়ে কাজ করে ওঠে তখন পিতামাতা ইহজগৎ হ'তে অন্তর্ধান করেছেন। এইসব ফ্রয়েডেমেরা তখন ভয়ের মানস সত্তাকে ছাড়তে পারেনা, কাজেই তখন তারা এক ভগবানের পরিকল্পনা মনে মনে করে। ইনিই হচ্ছেন Father image। ধর্মভরের ভিত্তি এইভাবে গড়ে ওঠে, আর ভবিষ্যৎ ধর্মের জীবন এইই ওপরে নির্ভর করে চলতে থাকে। নৈতিক জীবনও এই ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে।

কিন্তু আদর্শিক সভ্য। আমরা জানি যে প্রথম সমাজ গড়ে উঠেছে মাতৃতন্ত্র বা Matriarchy নিয়ে। সেই সমাজ ব্যবস্থার পদুম্বাসের এক স্থানে স্থায়ী কন্যাস গড়ে উঠে নি; সভ্যতার সেই উৎসাহে মাই ছিল সর্বময়ী কন্যা ও সমাজ সংরক্ষক। কাজেই Father image না হ'লে Mother image হওয়া উচিত। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমাদের অধিকাংশ সহজাত বস্তুগোষ্ঠ পদুম্বাসের হ'তে গৃহীত। সেক্ষেত্রে পদুম্বাসের ভিত্তি ভগবত চৈতন্য গড়ে ওঠে না। তারাও তো ভর পায় এবং অতি শিশু অবস্থার পিতার অনুসৃত থাকে। আর একটি কথা হচ্ছে, প্রথম যে মানবসমাজ গড়ে উঠেছিল তাদের ভিতরে—এই ভয়ের কথা ভগবত চৈতন্য কি করে পরিণত হয়? দ্বিতীয়তঃ অর্থপদুম্বাসের ভয়ে স্মৃতি ক'বে অদৃষ্ট থাকতো সেই হিসাবে ব্যালোর স্মৃতি তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূছে যাওয়ার কথা। আরও একটি কথা যে, পিতামাতা আর ভগবততত্ত্ব এই দুয়ের ভিতরে যে অলম্ব্য ব্যবধান সে ব্যবধান দূর হয়ে যায় কি করে? বাবা, মা বাড়ী হোক তাদের ভিতর একটি সীমা থাকে, কিন্তু ভগবততত্ত্ব অসীম। আমাদের ভিতরে যদি একটি পরম পিতার স্রোত্তা বা নিউক্লিয়ার ফন্সেশন না থাকে, তাহ'লে আমরা এই দুলম্ব্য ব্যবধান পার হই কি করে?

এছাড়া আমরা আসি মের্টারিয়ালিজম্‌ প্রবৃত্তি। এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞান অনুসারে আমরা দেখি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সৃষ্টির আদিতে মন বা আত্মা কিছুই ছিল না। জড়ের সর্ম্মিষ্ট বা জড়ের খেলাই এই জগতের আদি তত্ত্ব। আমাদের কদুম্বাসের বিভিন্ন সচেতন সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। কাজেই মন জড় হ'তে উদ্ভূত এবং সেটিও জড়। এদের মতে আত্মা বা পরমাত্মা ভগবান এবং তত্ত্ব সম্প্রদায় বিশেষের শোষণনীতি হতে উদ্ভূত হয়েছে। সাধারণ প্রকটোরিয়েন্ট বা ভ্রমিক সম্প্রদায়ের সরল ও স্বাভাবিক এদের মতে পরকাল, ধর্ম, নৈতিকতা, ধর্মের জীবনের মোহাই দিয়ে তাদের উপর প্রভাব করতে চেষ্টা করেছে। আবিষ্কার-এর সেন্সার যেমন লোকে নানা কল্পনা দেখে, ধর্ম এবং ঈশ্বরতত্ত্ব তেমন কল্পনার কল্প। কিন্তু বর্তমান বর্ণন ও বিজ্ঞানের কথা আমরা একই ভাবে দেখি। ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি বেসব পরমাণু পরমাণুর আদিতত্ত্ব বলে বিজ্ঞান গ্রহণ করেছে, সে সব দৈবপর্যায় দৈবকালের উপর নির্ভর করেছে—Time-space continuum। বৈজ্ঞানিকদের মতে Time-space হচ্ছে mental construct। এটি ন্যায় জৈবদৃষ্টিগত, আইনস্টাইন প্রভৃতির মত। জৈবদৃষ্টিগত ভগবানকে একজন Great Mathematician বলে আখ্যা দিয়েছেন তাঁর Mysterious

ফাঙ্কন : তেরশ' একানব্বই ।

বর্তমান সভ্যতা ও আন্তরিক বিশ্বাস

তিনশত উনশতর

Universe' বইতে । বিখ্যাত দার্শনিক রাসেল বলেন, জড় আর মনের ভিতরে যে সীমারেখা তা ধীরে ধীরে মূছে যাচ্ছে । জড় মনের পরীরে এসে পড়েছে, যাঃ মন এসে পড়েছে জড়ের পরীরে । তা ছাড়াও কোন কোন মনশীলের মত যে Dust Cloud—সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ বলে ধরা হয়েছে, তার থেকে বর্তমান গ্রহ-তারকার উদ্ভব ; Dust Cloud-এর ভিতরও জীবনের আঁধার ছিল বলে মনে হয় । প্রায় পল্লীপটি বড় বড় বৈজ্ঞানিক ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক পুঙ্ক্তক রচনা করেছেন । এই পুঙ্ক্তকখানির নাম Evidence of God in the Expanding Universe । এটি J. C. Monsma'র সংগ্রহ ।

এরপর আসে পছের্টিজ'হ । এই মতবাদে কোন অজাগতিক কথা মানতে চার না । তাঁদের মত হচ্ছে আমাদের সত্যবস্তু পাবার একমাত্র উপায় Logic এবং Science, ভগবৎজড় এর ভিতর পড়ে না । ভগবৎজড়ের কথা তাঁরা উড়িয়ে দিয়েও আমরা জানি যে, Science এবং Logic ছাড়াও আমাদের সত্যবস্তু উপলব্ধি হয় । যেমন শ্রীতত্ত্ব বা Aesthetic তত্ত্ব । কোন রিলিন্স, যেমন হিমালয়ের রূপের দৃশ্য—কিন্তু science এর প্রমাণ দেয় না । মঙ্গলদ্বী উবা কি সংখ্যার নয় সৌন্দর্য' আমাদের এত ভাল লাগে কেন তা যদি analysis করি বা বিজ্ঞান সম্মত কেটে ছেটে বিশ্লেষণ করি তাহলে ঠিক হবে না । Science স্বীকৃত সত্য ছাড়া জগতে আর কোন সত্য নাই একথা যে কত ভুল তার প্রমাণ Science আলো বা বর্ণের কাল তা পাল্টে দিচ্ছে । নিউটনের মতবাদ আইনস্টাইন খণ্ডন করছেন । আলোর আইনস্টাইনের মতবাদ আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক নারসিকার খণ্ডিত করছেন । অন্যদিকে বিজ্ঞানের যে সব সত্য বেরিয়েছে সে সব সত্য সংখ্যায় এত আকর্ষণকর যে সমস্তের আলির সঙ্গে এর তুলনা করা হয়েছে । মহামারি নিউটন এই কথাই বলেছেন ।

এই বিশ্বপ্রকৃতি—Expanding Universe ক্রমাগত বৃহৎ হতে বৃহত্তর পথে চলেছে । তার তত্ত্ব মানুষ্যের মত ক্ষুদ্রবৃত্তির কাছে যে কত অপমান তা আমাদের অজ্ঞাত । মানুষ্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বৃত্তিও পশুদের কাছে হীন একথা আমরা জানি । আলোর তরঙ্গ বা শব্দের তরঙ্গের পরিমাপে বিশেষ বিশেষ পশুদের দ্বারা অনেক উৎকর্ষতা দেখা যায় । কাজেই আমরা সের্ব্বত্র এই তিনটি ধর্মের বিরোধী মতবাদ, তন্ন্য কত অপার ।

—১১—

এ জগৎটা যেন ভগবানের সাজানো বাগান । বেশ সাজানো গোছানো বাগানে যদি একটী মাত্র গাছের অভাবও হয় কিংবা আলোর মালা দিয়ে সাজানো ঘরে একটী অলোরও অভাব হয়—তাহলে সৌন্দর্য্য কি কিছু ব্যাহত হয় না ? তেমনি এই জগতের বৃক থেকে সিদ্ধপুরুষের দেহ যদি চলে যায়, ঠাকুর তাকে টেনে নেন ও তাঁর আত্মা যদি অনন্তে absorbed হয়ে যায়, তাহলে জগতের এই পরিব্রততা ধানিকটা ব্যাহত হবে না কি ? তাই ঠাকুর চাই করে মুক্তি দিতে চান না । অবতার পুরুষ সিদ্ধপুরুষ সকলকে তাই এই জগতের কল্যাণের জন্ত বার বার আসতে হয়—আমাদেরও তাই প্রয়োজন হলেই আসতে হবে । অবশ্য এই যে—যাওয়া-আসা, এগুই বাসনাদিষ্ট আত্মার মত জন্ম-মৃত্যু নয় ।

—দ্বিতীয় সত্যানন্দদেব

ফাস্তুনী দ্বিতীয়।

স্বামী সাধনানন্দ

মিথ্যে সমীরে পলক বৃষ্টির

নন্দন-বন-স্বপন ।

এল ভুবন নরন গগন-বিমোহন

এল স্বপ্ন-স্বপ্ন-বন্দন ॥

এল ষষ্ঠীর চপ্পে

এল পূর্ণিমার চপ্পে

তার সূর্য শত রশ্মি

দিক গগনবিহীন রণিত নৃপৎ

অর্জিত স্বপ্ন-চন্দন ।

জাগে দিশি অতপ্ত

এল কি স্নানানন্দ !

জাগি ফেরান ধ্যান পরম লগন

কে জাগাল জ্যোতিস্পন্দন ।

বাংলা ১৬, পূবা—দিল্লী : ১২৭।৫০

—১০৬—

আপন সাধন-কথায় স্বামী সত্যানন্দ

আমার জীবনের সাধনার কথা বলতে গেলে বলতে হয় আমি প্রথমে অন্ধিতে বিষাদী ছিলাম—কবে ধীরে ধীরে অন্ধিত হ'তে বৈত ভাব আসে—সে সময় ধ্যান ক'রতে ব'সে এইরকমটা মনে হ'ত যেন একটা কমল কুঁড়ি নীচের থেকে উপর দিক হাচ্ছে—ক্রমে ক্রমে সেটা সহস্রাণ্ডে গিরে উঠলো আর একটি একটি ক'রে পার্শ্বিৎ ব'লেতে লাগলো—সমস্ত পার্শ্বিৎগুলি ব'লে মন টুপ' ক'রে সেই ফোটা পদ্মের মাঝে জুবে যেত—তখন সমস্ত দ্বির নিধর । তারপর ক্রমশঃ মা এসে বাসা বাঁধলেন । আবার এই রকমে যেতে যেতে কেমন ক'রে যে ঠাকুর এলেন জানি না ; একরকম হঠাৎ এসে জুড়ে বসলেন—সে এক বিরাট কৃপা ।

সকল গ্রন্থি বা কলন দূর হলে মানুষ মূর্ত্ত হয়ে যায় । মূর্ত্ত হওয়া অর্থ—কল্পমত্বের পারে যাওয়া ! মূর্ত্তির পারের অবস্থা হচ্ছে পরম শান্তিলাভ করা বা পরম আনন্দ লাভ করা । সেটা হয় ব্রহ্মানন্দ লাভে ।...একদিন একাকী আনন্দে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে আছি, মনটা এক অনাবিল আনন্দে ভরে গেল । সে আনন্দের রেশ বহুদিন ছিল মূহুর্ত্ত নয় এখনও পর্যন্ত সে আনন্দ যোব ক'রে আনন্দ পাই ।

—১০৭—

সত্যানন্দ সাহিত্য

ও' সহনাবদ্ধ, সহনোন্মত্ত, সহবীর্য করাবাহে ।

ভেল্লি নাববীরম্পু মা বিধিবাহে ॥

ও' শাক্তি শাক্তি শাক্তি ॥

[শাক্তিপাঠ, কঠোপনিষদ]

উপনিষদের বাণী হচ্ছে—শাক্তির বাণী, ভেল্লের বাণী, সাম্যবাদের বাণী । ব্যক্তিগতভাবে গভীর ভগবৎ চিন্তায় কথা তো এতে আছেই, উপলব্ধি স্বকল্পক নিয়ে চলার কথাও আছে । এখানে বা প্রার্থনা করা হচ্ছে গুরু ও শিষ্য উভয়ের জন্য, একলা কারুর জন্য নয় । এটাই বৈশিষ্ট্য । সাম্যবাদের স্বকল্পক নিয়ে চলতে হবে একসঙ্গে উঠে, একসঙ্গে খাবে, একসঙ্গে উপসনা করবে, তবে সেটা যুগোপযোগী হয়ে উঠবে । উপনিষদের 'সহনাবদ্ধ'র কথা ভাববার দিন এসেছে । প্রতি কর্মসংকে অন্য সংঘর্ষের সঙ্গে যোগ রাখতে হবে । ধর্ম U. N. O. গড়ে তুলতে হবে । ধর্ম ধর্ম বিধেয়ের দিন চলে গেছে যেদিন ধর্মমহাসম্মেলনের বাণী এনেছেন গ্রীষ্মকক । ধর্মের এই নির্দীন প্রত্যেক অবস্থায় অব্যাহত হ'ক—গ্রীষ্মকদের চরণে আমাদের একান্ত আকৃতিভরা এই প্রার্থনা । [উপনিষদ, চরন]

যজ্ঞানিতান সজ্ঞা মৃত্যুন্তে সশ্রীকৃষ্ণিবৈ ।

ভুক্ততে তে কবং পাপা যে পশুভ্যাক্তারণাং ॥ গীতা—৩/১৩

বৈদিক যুগে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হ'ত, বহু কবি সমাগত হয়ে যজ্ঞ করতেন, তখন লোকসংখ্যাও কম ছিল আর জিনিস গরুও ছিল প্রচুর । প্রচুর ঘি, দুধ, ময়ূ, ঘাঁহ, সব ইত্যাদি এসে উপস্থিত হত যজ্ঞোৎসবের এবং যজ্ঞে আহুতি দিয়ে অবশিষ্ট প্রসাদও থাকতো প্রচুর, সেই অবশিষ্ট আবার সম্ভবত কবি সজ্ঞন মন্ডলীর মধ্যে বিতরণ ক'রে যা অবশিষ্ট থাকতো তাই রাজ্যের ঋগ্বিদ্য আহাৰ করতেন আর তাতেই তাদের পানকখন সব মৃত হ'য়ে যেতো । এই যুগ practical (কার্যকরী) কথা । এক দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রসাদ, তা'তে অবশিষ্ট ভাগ সবটাই নিজের স্বার্থে যায় না ক'রে অল্পভাগ পরার্থে দান ক'রে অবশিষ্ট ভোজন করার সত্যিই কোন লোভ বা কখন স্মৃতি হ'ত না, কাজেই পাপ থেকে মুক্তি লাভ হ'ত । কিন্তু এখনকার দিনে তো যজ্ঞ নাই, তবে কি প্রত্যেক মানুষই পাপ ভঞ্জন করছে ? এর উত্তরে কথা যায়,—গীতায় যে ভগবান 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ ব্যাপকভাবেই ব'লেছেন, যুগ বৈদিক যজ্ঞই এর অন্তর্ভুক্ত নয়—বিকৃতিতে কামনা ক'রে তাঁর নামে যজ্ঞ করে আমরা যে কোন কাজই করি না কেন, মনে যদি কিছু অর্থাৎ নিজ ইচ্ছার প্রীতি কামনা ক'রে, তিন করাজেন মনে ক'রে বড়টা সম্ভব সাধ, সজ্ঞন, গরীব, দুর্ভাগ্যের মধ্যে বিধির দিয়ে, অবশিষ্ট নিজের প্রয়োজনে লাগাই তাহলে সেটি যজ্ঞ ব'লেই গণ্য হবে । গীতার অন্যান্যস্থানে আরও ব্যাপক অর্থে 'যজ্ঞ' শব্দ গৃহীত হয়েছে । এই বিষয়ে সব কিছুই বিকৃতিতে জন্য সম্পাদিত হচ্ছে, কাজেই এ বিরাট বিষ সবটাই তাঁর যজ্ঞকর্তা । এই যজ্ঞকর্তা আমরা যে বত স্বাধ'ভ্যাগ ক'রে সেবোদ্দেশ্য ও পরার্থে কাজ করতে পারব, ততই মৃত্যুপ'রূপ হ'য়ে যাবে ।

এখানে লুকিয়ে আছে Communism-এর মস্ত বড় কথা । রাশিয়া Communism-এর দেশ হলেও গীতার বাণী নিরঙ্কর । Communism-এর এত বড় কথা গীতা ছাড়া অন্য কোন শাস্ত্রে নাই । দেবতা বা ভগবানের কথা মানলেও তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সেই প্রসাদ সকলের মধ্যে বিতরণ ক'রে তারপর নিজে গ্রহণ ক'রবে, এবং দেবতা না মানলেও যুগ নিজের জন্য পাক করলে এবং স্বার্থপরতার ক্ষুদ্র মতি নিয়ে সেটি গ্রহণ করলে সে পাপ ভঞ্জন করবে এইটাই Communism-এর মূলকথা । — গীতার বাণী

গ্রীষ্মকক কথামৃত আজ বিক্রেত বাইকেলে বলে গণ্য হতে চলছে। বিশেষ এতে প্রধান প্রধান সব জাতিস, সব ধর্মের কথাইতো রয়েছে। অনুবাদ সাহিত্য হিসাবে আজ প্রায় সব প্রধান ভাষার এর স্থান অবিসংবাদী। আরো, কথামৃতঃ ভাষার অনবদ্যতা, এক নতুন কথা-সাহিত্য সৃষ্টি করেছে। ...সে যুগে তখনও দিবা অথচ চলতি ভাষার ব্যবহার সূত্র হরনি। হয় 'আলালা' 'দুতোমী' ভাষা, না হয় শব্দ 'বিশ্বমী' ভাষার বহুগ সেটা। কথামৃতের ভাষা ভাববাহী আর জ্ঞানবাহী দুইই। যেমন—“চাইনিতে বেন জগণ্টো নড়ছে,” “জগতের সব গম্ভীর নিয়ে গাড়িরে আছেন,” আবার সেই ভাবজাতিক, বস্তুজাতিক দুইই খটে। যেমন বহু মন্ত্রকের ঐশ্বর্য দেখে সবাই, বাবুকে খেঁজে ক'জন? আবার মাঝে মাঝে লম্বা পরিবেশের সৃষ্টি করেছে—কুর্কিগোত্রকে বলছেন—তুমি তো 'খ'—জব যদি টেক (বাড়ীর) না থাকত। কিছু কিছু খেউরও কথা-সাহিত্যে প্রয়োজন। যেমন—“আমড়া কেবল আঁঠি আর চামড়া—খেল হয় অম্মদুল, বাগাওলা প্রায় ঐ রকম হয়, গাল ডোকড়া, পেট মোটা, হাতে ডাগা।” সর্বদা ভাবে ব্যবহৃত অথচ কি গভীর দৃষ্টি—এই সাহিত্যিকের দৃষ্টি—এমন কত আছে। ফলেই, আমি হাসিজনগণ। বিশেষ ঐ থাকের ভরতো আসতো। কথামৃত শব্দ সাহসের জন্যই তো নয়, সব নিয়ে কথামৃত একটি কাব্যগণেশ। তিনি যে কবি যুগে যুগেই।

মানবতার এই বাইকেলে রয়েছে ধর্মের কত না গুঢ় ভাব, যেমন—সাথে দর্শনের পুঙ্খবহুর নিশ্চেষ্টতা আর প্রকৃতির প্রসববর্মী স্বেভাবের সঙ্গে বিবাহ উৎসবে নিশ্চেষ্টে গৃহ কর্তা। আর গৃহ কঠোর তুলনা। মাথা সেরেই অন্তঃস্বরের কথা—মহামহিম আল্লার কথা, ভগবান যুকের কথা, কি যে নাই! আরো রয়েছে সমসাময়িক ভক্ত মহাপুরুষদের সঙ্গে শ্রীঠাকুরের আলাপ-সংলাপ। এদের মধ্যে রয়েছেন—মরায় সাগর বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, কবি মাইকেল, ব্রহ্মানন্দ কেশবস্বর, মর্হাৎ দোকেন্দ্রনাথ হাজারি কত না জীকাদম্য হওয়া এর পর। ধর্মিক ভক্তির রাসের ইচ্ছার জীবন-নায়ন, ফেরি না করা সারগের চরিত। এমন কত তত্ত্বময়ি যে জ্ঞান রয়েছে কথামৃতের পাতায় পাতায়। আর আছে যিটু কথার নিজের লীলাভঙ্গ, নানা ভক্তসঙ্গ, নানা পরিবেশে বসিন তার পলপুটে আর তারই সঙ্গে জমিত হয়ে রয়েছে কত মধুর কণ্ঠের সাধন সঙ্গীত; সমস্ত কথামৃত বেন এক সব পেরোছির স্বর্ণ—মৃতের বৃক অমরার অবসান—নিত্য বলাচরন নিত্য ভগবানের সহ। —কথামৃতের কল্পলতা।

তুয়ারতীর্থ হিমালয়ের উপরে আগা সাতরলা রামচন্দ্র হাসি দেখে কি—আর দেখে প্রবৃত্তির মাদিক ছাড়ির পড়া ভোরের আলোর গমন গঙ্গা?

তেরনি এসেছিলেন আবার কারায় নীলমণিকের রক্তবৎ আর বেঞ্চেরেয় পাখশালার মেহতন, ঈশামণী—আবার সেই নবীরায় শচীর দ্বালাল শত চাঁদ মাথা অঙ্গে ... এয়ার কিন্তু বিকের আঁঠি নিয়ে এসেছিলেন চন্দ্রের তালা ঘরে এক মূর্তা জুই-এর মত গবাবর ... সেদিন ফুপিয়ে জাগরনি কোন আগমনী—শব্দ নেমে এসেছিল একটি আনন্দের গলিত—আর পুঙ্খের একটি মঙ্গল

স্বর্ণ বেন দাঁড়িয়েছিল ধরার আনিয়ার—আর ধরা সে শব্দ মেয়েছিল লাঞ্চ নত গোখে।

আলোর দেশ সপ্তর্ষিমন্ডল—জ্যোতিষন কো দেওয়া খণ্ডের ধর পার হয়ে অখণ্ডের ধর, রাশি রাশি জ্যোতিষন তেরী তার পথ তখন পরভাং সমস্ত আবারের পারে সে দেশ — সেখানে ধরার ধলির, ধরার সৈন্যের প্রবেশের পথ নাই—আছে শব্দ শান্ত-শব্দ-বান শব্দের প্রকাশ ... সেই যেখানে সাতটি কবি তাদের সমাধির গহন গাহনে নিবাত নিবর রূপে বসে আছেন জ্যোতিষ ন্যাতিজ্ঞের মত সেই স্থানে ঘটেলা এক পরম অন্ধকার। এসে পড়িলো এক কুমার কিশোর—অল্প যদি হুঁপারিত হয়—সমস্ত স্বর্গের সূচ্য যদি গোহ মন্দন রূপ নেয়—যদির জ্যোতিষ যদি নিবর নির্বিড় হয়ে ধরা দেয় বাহুর কখনে, তবুও তার শ্রীঅঙ্গের এক কণাও হয় কিনা সম্ভে—যার কণিকের ইচ্ছাবিলাসে সব শব্দের

প্রকাশ হয়, তার অকল্পনীয় রূপের কথা কি বলা যায় ? সেই চির পিপাসিত ধ্যানের ধন—বৃষ্ণবৃন্দ কেনার গড়া জ্যোতি-
ঘন-তন্দ্র অবিমর্ষ বিশোর এসে পড়িলো সত্ত্ববিলোকে। সেদিন গগনে ভূতন জেগেছিল যে হর্ষ, সে প্লেব—তার প্রকাশের
ভাষা যে নিখর।

সে তার তুমার উন্মিত বাদু দিয়ে ধরল জড়িত সত্ত্ববিলোকে প্রবীণতম কবিতা, যার চিত্রার কবির ধ্যান
গভীরতা—যার চিত্রার কবির গহীনলোকে ধাম, তার আগমনে কবির নেই সাড়া—বিশোর আর পারে না—খীরে গভীর
ভাবে জড়িত ধরে তার ব্যাকুল বাদু দিয়ে কবির কণ্ঠ—কণ্ঠ কেন্দ্রবীণার বলে,—ওগো কবি। জাগো, জাগো—আমি যে
হাচ্ছি—তুমি যাও না ? এখনি ক'রেই কি জাগো ও দরাস সব নীরবতা—সব নিখরতা—সব জড়তা। যার ডাকে সৃষ্টি
একদিন গীতারিত হয়েছিল, তার ডাকে কি সাড়া না দিয়ে পরা যায় ...

জাগেন কবি—সত্ত্ববিলোকে প্রবীণতম কবির নিকটতম ধ্যান যার ভেগে, ভিত্তিত নেত্র জেগে ওঠে প্রেমের
স্পন্দন—সেদিন সেই পরমকণ্ঠে কেউ কি দেখেছিল মৃতি অন্নান প্রভাতী তারার মত ধরার ধ্বংস নেমে এসেছিল পার্ব
আর তার সারথী, নর আর নারায়ণ, ন্যায়িকী আর শ্রীতিধুর ! [বৃষ্ণে বৃষ্ণে যার আসা]

“আঠারো শতকের বাংলা—কবির বাংলা—কবি তপস্বীর বাংলা—হান্নার বাংলা—সোনার বাংলা। তার
শায়ায়িত অঙ্কল সূত্রে স্বচ্ছন্দে সৌরবে বাস করতো এই বাঙ্গালী।

মাঠে মাঠে ছিল শ্যাম শস্যের প্রাচুর্য, বড় বড় বীথিকার কাকচক্ৰ জলে ছিল মাছের প্রাচুর্য—সেই দেশে বাস
করতো বলিষ্ঠ চিত্রাশীল একজাতি, বাত্যা ছিল ভারতের তথা জগতের লুপ্ত নেত্রের লক্ষ্য, এই দেখভূমিতে যারে যারে
এসেছেন কত সাধুসন্ত—সতী-সীমালী। এই দেখভূমির রাশা ধ্বংস আপনাকে নিরোহন মৃতিতে স্বয়ং ভগবান গৌরচন্দ্র।
ধ্বলা হতে গেছে সেনো—কাল হতে গেছে ধ্বা। আর আমরা মরণের মূখে পড়েও শত মূখে সেনো জর্জরিত হতে আজও
আমরা অমর ; বাংলার বৃকে আজও জ্বলে প্রেমের, শাক্তির, ড্যাগ বৈরাগ্যের, শৌর্যবীর্যের অনিবার্য শিবা—সোনার
বাংলা আজও মরে নি।

এই আঠারো শতকের বাংলার জ্বলে উঠেছিল এক জীবন-সমিধের শিখা। হৃদয়ী জ্বলার উত্তর পশ্চিমে
চিকুড়া মেদিনীপুরের মিলন অঙ্গনে সেরে গ্রামেই বাস করতেন কৃষিগ্রাম চট্টোপাধ্যায়—শিখার তীর জীবন।

বাংলার আঁবার ভেসেই জেগে ওঠে মল্লিকারী উষা, প্রতিক্ষের তুমাকুর বৃকেই কুণ্ডলার ধারাসার আসে নেমে,
বাঁধার রাঙা ফুরেই জেগে ওঠেন বাণাহারী নারায়ণ।”... [বৃষ্ণে বৃষ্ণে যার আসা]

বৃষ্ণে বৃষ্ণে এশিয়ার তথা ভারতের বৃষ্ণ নিভে ডাক উঠেছে স্পন্দনীর ধরার, ডাক উঠেছে অধর্মের প্রানির বিরুদ্ধে,
অশ্লিষ্টের বিরুদ্ধে। অন্যাশে ভোগ ব্যাকুলতা নিয়ে মানব তার দুয়ারে রাতে যারে আঘাত করেছে—তার ফলে সেইসব
দেশ তাঁর প্রকাশ হয়েছে শূন্য ভোগক্ষম বহন করে। আর ভারতের ইজিঙ্গাস, দেখভূমির ইজিঙ্গাস, তাঁরই ইজিঙ্গাস ভারত
অন্যাপ্য নিজে—সে পব যোগক্ষেমের পব—সত্য-শিব-সুন্দরের পব, তাই ভারতও এশিয়ার প্রকাশ ধর্মবীর্যের
—অবতারের।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের জগত নেমে এসেছিল অধর্মের এক রাশ আঁবার। ভারতের তথা বাংলার,
এখনকার সারা জগতের এ এক সম্মতময় বৃষ্ণ। জাতির ভিত্তিভূমি কেন শিথিল হতে বসেছিল—দিশাহারা তরলীর
মত আমরা যেন অকুল ভেসে চলছিলাম—লক্ষ্যহীন, আশাহীন। ভারত-পাথক তখন নবীন আশার, নবায়নের
প্রতীকার উদ্দেশ্যে আবলু হয়ে ছিল বসে।

এখনি বৃন্দসম্মতে নেমে এলেন করুণার রাগন মহাসম্মত মৃতি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, বিদ্রোহের আলোর মানবের

মন তখন এতদিকে জড়বোধে সরাচ্ছ, অন্যদিকে সম্ভব ও অবিস্মার্যে পথহারা। এই পথহারাদের পথের দিশারী হ'তে হ'লে এদের মতই হ'তে হর, তাই ঠাকুর বিজ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে ভগবৎ প্রাপ্তির পথ দেখাতে শূন্য করলেন, শূন্য ব্যাকুলতাই হ'ল সঞ্চল, শূন্য চোখের জলে ভরা হ'ল মঙ্গল ঘট—নিঃসৃত জীবন বলি দিয়ে কেনা হ'ল মা'র আশিস। এগনি ক'রে সব প্রধান প্রধান বৈষ্ণবের সাধনে সিদ্ধ হয়ে যখন অধৈর্যসিক্তে মন অশ্রুজর ঘর থেকে আর নামতে চান্না, সেই সময় মা'ই আবার নামের আনলেন বিঘের কল্যাণে অখণ্ড হ'তে খুঁজর রাজ্যে—করলেন, ভাবমুখে থাক'। কাগপেতে যে কলাদাবাণী শুনতে চেয়েছিল বিষ্ণু, সেই বাণী মা নিজেই শুনিয়ে গেলেন, "ওরে ভুই ভাবমুখে থাক'।" এগনি করেই কি ভাববাসের (আইজির্নালিজম) প্রতিষ্ঠা হ'ল উনিঃশব্দ শব্দকর জগতে ! এগনি করে তিনবার মা'র আদেশে মায়ের বলাল নামলেন সমাধির সপ্তলোক হতে। মরুর বকে সেদিন নেমেছিল ক'ঠ ভরা ভূবাহবা বীরকল...বার কুপাধারে শূন্য বাংলা নর, শূন্য ভারত নর, সমস্ত বিশ্ব অমৃত্যুরিত হচ্ছে। ... [বসে বসে বার আসা]

অবতার বা মহাপুরুষদের মধ্যে বিচার করা ঠিক নয়, কে ছোট কে বড়। ওরা সকলেই সমান, যখন যেমন রূপে বা ভাবে তাঁর আসার প্রয়োজন হয় আসেন। একেরই তো প্রকাশ রূপে বসে। তবে শ্রীমহাপ্রভু শূন্য একটি ভাব নিয়ে সাধনা করেছিলেন, আর দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর সমস্ত ভাবের, সমস্ত মতের, সমস্ত ধর্মের সাধনা করেছিলেন, সিদ্ধ হ'লে ছিলেন একই বোধ, একি কব কবা ? তারপর তৎকালীন বড় বড় পণ্ডিত জ্ঞানীগণেী সব এসেছিলেন ঠাকুরের কাছে—তবে ঠিক সময়েই অর্থাৎ ঠাকুর সেহে থাকাকালীন সত্যিই মহাপ্রভুর মত অধ্যাত্মা পাননি, কিন্তু মেহাক্তের পর তাঁর আকর্ষিত বার্জা আসমুদ্র হিমালয় ছাড়িয়ে পড়ল। ইউরোপ আমেরিকা সমস্ত দেশে তো ভগবান ব'লে মেনেছে। ১৪টি মহাভাষার ঠাকুরের কথামত অনুদিত হয়েছে, কিন্তু মহাপ্রভুর বসে তাঁর কথা শূন্য ভারতের বুকুই ছিল। তঁরে আর অবতার বরিত্ত বলতে বাধা কোথায় ? সমস্ত অবতারদের ভাব এসে তাঁতে মিলেছে। [ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও অবতারবাদ]

ব্রহ্মের তপস্যায় বিশ্বসৃষ্টি। বিরাট তপস্যায় বিরাট সৃষ্টি। ভগবান শ্রীমহাকৃষ্ণের তপস্যায় বিরাট। তাঁর সৃষ্টিও তেমনি বিরাট সম্ভাবনা পূর্ণ। উপনিষদে আছে 'স জগাহতপত্য'—এতেই বিরাট সৃষ্টি। শ্রীঠাকুর প্রধান প্রধান ধর্মমত, আর হিন্দুধর্মের প্রায় সবমতের সাধনা করেছেন। এ বিশ্বব্যাপী বিরাট তপস্যার ফল আদ্যে শ্বে হয়নি। বহু আশাপূর্ণ এর পরিণাম। —বেদহুদা

অবতার পুরুষদের ও মহাপুরুষদের চিন্ততে পারা যেমন কঠিন তেমনি তাঁদের লীলাসারিনীষের চিন্তাও দুঃস্বাধ্য। শ্রীশ্রীমহাদেবী সর্বদিকে ঠাকুরের প্রকট অবস্থার অনুরূপে মধ্যায়া দিতে পারেন। আমরা জানি লাট-মহারাজকে একদিন ঠাকুর নিয়ে হলেন,—ভুই বার ধান করছিল সে ব'লে নহবতে মল্লা মাথু—দেখে আর। ওরপরে লাটুমহারাজের আর কোনাধীন কুল হয়নি মা'র স্বরূপে বসে। স্বামী সারদানন্দ একবার গঠনক ভক্তরে এবট দৃষ্টকণ্ঠে বলেছিলেন—ঠাকুর থাকে বিবাহ করেছেন, তাঁকে সাধারণ পর্যায়ে কখনও ফেলবেনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর কলেন—

যে বার সে তার

বসে বসে অবতার ॥

আমাদের মনে পড়ে শ্রীশ্রীরা তখন কৃত্যার চন্দ্রলেখা। তিন বলর হয়েস। শিখড়ে ভরসারামের গয়ে হয়েস সন্ন্যাসের আসর। শ্রীমহাকৃষ্ণে ক'রে নিয়ে হয়েছেন জটক। সন্ন্যাসের একটা বিশেষ মোহ আছে। শূন্য বেন দেস

আসে মর্ত্যের মাটিতে আর মর্ত্যও কেন উঠে পড়ে স্বর্গের দিকে। এই অমৃতের মূহুর্তে কেউ একজন জিজ্ঞাসা করে গ্রীগ্রীমায়ে—ক' দেখি স্যার, তুমি ক'কে খিরে ক'রাবি? গ্রীগ্রীমাও শুকন তীর বালাপয়া স্বর্ণমূর্তিট ভুলে দেখিতে সেন সন্নীতের আবেশে নয় গ্রীগ্রীমাখরের দিকে। হৃগনান্দিতা সারসার নিঃশ্বাসে পরিভ্রমিত জিনতে এতটুকু বিলম্ব হয়নি। গ্রীগ্রীমার বর্ণেছিলেন,—সেখণে জরগ্রামবাতির রাক্ষুসুজ্যের বাড়ীতে কুটো থাণা আছে।... গ্রীগ্রীমার গ্রীমায়ে জীবনিকর নির্দেশ দিয়ে গিরোহিলেন, ব'লে গিরোহিলেন—কালে জোয়ার অনেক ছেলে হবে তাদের দেখতে হবে। আমি আর কি ক'রে বললাম, জোমায়ে এর চেয়ে ঢের বেশী ক'রতে হবে। আর তাই দেখি সেন-সেনাভরে মা কুটো বাজেন, ভাবার সঙ্গে পরিচয় নেই তবুও তাঁদের দিচ্ছেন দীক্ষা। মনঃকরার কাছে কোন ভাষা বাধাম্বরূপ হ'তে পারেনি। জোয়ার ছানেকই কি কোন ঠিক ছিল, হয়তো স্টেশনেই কাউকে দিচ্ছেন দীক্ষা। কুলি মেয়ে, এসে পাঁড়িতেছে জানকী-মাসি ব'লে—আর মা নিরোহেন তাকে ব'লে দিগ্য পঙ্কর নিরিখ।

দ্বিদেশী ভক্ত ভাষার হেলক ও মিস ট্রে,—এরা সব এসেছেন মা'কে দেখতে। তাঁদের আচরণ দিচ্ছেই বাবহার ক'রছেন হাসিমুখে। কেউ জিজ্ঞাসা করেন তুমি যে আমায়ের কালী সেকথা কেমন ক'রে জানব? মা বলেন,—কালে ব'কেতে পারবে। সত্যিই দেখি পরবর্তীকালে নিমেষ থেকে পত্র আসে,—কে তুমি জননী,—আমরা এখন থাকে বাসে তখন সেরীর পাশে এসে দাঁড়াও?

ভক্ত প্রেষ্ঠ নাগমশার—একবার এক হৃদয় আম নিরে গিরেছেন মা'র জন্যে। মা সেই আম গ্রহণ করেন ও পরে নিজের হাতে নাগমশারকে খাইরে সেন। নাগমশারও আনন্দে চাঁকতার ক'রতে থাকে,—বাপের চেরে মা দয়াল। এর পিছনে একটা ইতিহাস। নাগমশার পুজার পর একদিন ঠাকুরকে দর্শন ক'রতে এসেছেন। ঠাকুর ব'কলেন এ কু কটিন ভক্ত—নিজের একই গ্রহণ ক'রে প্রসাদ নাগমশারকে দিয়ে সেন, সেদিন একাদশী তিথি।—সেই বিখ্যাত প্রসাদের স্মৃতি গ্রহণের সময় নাগমশার ভেবেছিলেন সেই প্রসাদ ঠাকুর তাকে খাইরে দেবেন। কিন্তু ঠাকুর এটি মজের জন্যে রেখে দিয়েছিলেন। তাই দেখি মা, নাগমশারকে খাইরে দিচ্ছেন—গিরীন্দ্রঘোষ, থাকে পাঁচসিকা পাঁচআনার ভক্ত ব'লে ঠাকুর পরিচয় ক'রে দিয়েছিলেন, মা নির্বিচারে তাঁর বিদ্যনা বাগিন ঝাড়ছেন, রোপে দিচ্ছেন! চাঁদের চেরেও অবলম্ব যে জীবন তাঁর এই মনকে নাহিরে নিয়ে আসা এটি গ্রীমা'র পক্ষেই সম্ভব। আমরা এর আগে অন্য কোনও অবতার জীবনে পাইনি।...

মুগের সারাধ হ'জ্জৈ তো অবতীর্ণ হওয়া—খর্মের প্রতিষ্ঠাই তো অবতরণের রহস্য—পান্ডাতে মাতৃজাতির প্রতিষ্ঠার নিরিখ ইতিহাসের পুঁথার দেখা যায়—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ, নান্যভাবে মাতৃজাতিকে উদ্ধৃত ও মৃত্ত করার চেষ্টার মাহেশ্বরায়; এর সূত্র খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখি অমা-মণ্ডিত দ্বিযামা এক রজনী—ফলহারিণী কালিকা পুজার এক পূণ্য তিথি।

তারকিত শত আঁখি মেলে সেদিন কালো মেয়ে প্রতীকারত—নরন আসয়ে পরমহুগের এক সূত্রে ধমক—আনন্দোচ্ছল সুরধনী কেন নিরুদ্ধ আশার কাম্পিত—দক্ষিণেছরে একগিত সে উৎসব সন্ধ্যার রাতি, আর অনাধিকে গ্রীঠাকুরের হান্দরে জ্বলে উঠেছে একটি নিবাত প্রেম-প্রদীপ। সামান্য উপায়নে—খুপে গীপে, প্রাণের পুজার মনই হচ্ছে দ্বন্দ্বিত। উদার অভ্যাসের মূহূর্তগুলি ও ইতিহাসের হারানো পাতা—গভীর গম্ভীরে জাগে মনুষ্যের মনমাল্য—বোড়লী মাতৃকায় আবাহনী—হে বলে—হে সর্বশক্তি অধিকারী মাতৃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিবার উদ্ভূত কর—রহস্যপুজার কন্দরে স্বস্বদেহে গ্রীঠাকুর আর আলিঙ্গনমাণ্ডিত আসয়ে জননী সারদা—ত্রিপুরাসুন্দরী নিজে...সব সমাধির পুজা—ফলহারিণী ভবানী এই পুজাই গ্রীঠাকুরের শেষ পুজা—নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেবার শেষ আয়োজন—আপন জন্মমালা সৌর্য চরণে নিকেনে জানান প্রসাদ—হে সর্বমঙ্গলো—শিবগোহিনি, নারায়ণ জোয়ার প্রসাদ !! প্রসাদ !!

এর পরের কথা—ভক্ত আর শক্তি হয়ে যায় অভক্ত—দুই আঁখা সমাধিতে হয়ে যায়—অন্ধর।

বিশ্বের মাতৃ প্রতিষ্ঠা এই দিনেই হিঁক হরেছিল—চিরকল্যাণের দ্বার সত্য ক'রে এই দিনেই হরেছিল অপাবৃত্ত—
বিশ্বনাথ এই দিনেই নিজেকে করেন বিশ্বজননীর চরণে সমর্পণ—শিব যে অম্পর্গ্যের দ্বারে সর্বাংগী।

—শ্রীশ্রীমা (প্রবন্ধাবলী)

বীর বহুর বয়সের রচনা :

বীর সম্রাট চিত্রকালই fighting monk ছিলেন। বলেছেন—“ক্ৰেবাং বাম্ব গম্ব পাথ” —বেশ শূদ্ধ লোক
কতই হরি হরি বলছি, ভগবানকে ডাকাছি ; ভগবান কিছ্ শুনছেনই না। আর শুনছেনই বা কেন ; আহাম্ভকের কথা
মানুষেই শোনে না তা' ভগবান। “এ যে ঢোক গিলে গিলে কথা কয়, মিনামিনে পিনাপিনে, ও হচ্ছে তমোগুণ, মৃত্যুর
চিহ্ন। সে মরিক সেশশুর্কে মহাবীরের পূজো চালিয়ে” —এইসব ছিল তাঁর বাণী।

শেষে শেষে যে সব নব জাগরণের কথা শুন্যো যাচ্ছে এই সূত্রের ভিতর একটি নতুন প্রবাহ, একটা নবসৃষ্টি দেখা
যাচ্ছে এটাই জীবনের চিহ্ন। স্বামীজীও তাই বলেছেন,—Expansion is life. It is better to wear out
than to rust out, তাই নতুন ক'রে গড়নের কথা তাঁর বীর কণ্ঠে ধ্বনিত হতো, আমরা নির্বাক শিশুরে শুনছি।
কিন্তু মহাপুরুষের বাণী কল্বেতে সমর লাগে, তাই তাঁর সবকথা এখন আন্তে আন্তে সফল হচ্ছে।

তাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ। স্বামীজীর জীবনে এ দুটি মূল্য হরেছিল। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর
বলেছেন,—“এরে দয়া নর, দয়া নর, শিব জ্ঞানে জীব সেবা।” শূনে অন্য সকলে চুপ ক'রে আছেন। স্বামীজী
বলেছেন—“কিছ্ বৃকাল ?—মাথা থাকলে তো বৃকবি ? আজ যা বৃকলম্ব ঠাকুর দিন দেন তো দেখাবো—বনের
কোষকে কি ক'রে ঘরে আনা যায়।” এর আগে সাধু হওরা মানে ছিল দীনাভিনী। জগতের সঙ্গে তার কোন ধরা
ছোঁড়া নেই। কিন্তু স্বামীজী বলেছেন—ও সূত্রের দিন নেই। “বহুব্রূপে সম্বন্ধে জোয়ার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ইন্দ্র।”
আর তাই আজ অসংখ্য গৌরবান্বিত শির হিমাচল হ'তে কন্যাকুমারী পর্যন্ত কোথার আত, কোথার পতিত, দরিদ্র-
নারায়ণ পড়ে আছে—তাঁদের সেবা করতে ছুটে যাচ্ছেন।

ঠাকুর স্পর্শ ক'রে লোকের চৈতন্য করতেন। আবার স্বামীজী কেন্দ্রে বলেছেন,—প্রাণ সেবতে পাছিন্দ না ?
করামলকবং—এই—এই—। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনমণ্ডলীর সব কিছুস্বপ্নের জন্য ব্রহ্মলীন হয়ে গেল।

আমরভোলা শঙ্কর যেন নিজেকে কুলতে জমাগত কাজ করে গেছেন। সত্ত্ববিশম্ভলীর কবিক ঠাকুর যে করাদিন
রাখতে পেরেছিলেন সে করাদিন তিনি যেন দিশেহারা হয়েই থেঁড়িয়েছেন। জামাদের শত্রু ও আধার অম্প। শ্রীভ্রামকৃষ্ণ ও
তাঁর পার্শ্বরূপে বাঁধা এসেছেন তাঁদের বৃকবার ক্ষমতা নেই। স্বামীজীর কথা কল্বে গিয়ে একজন ঠিকই বলেছেন—
তাঁর শত্রুর অতি অম্পই প্রকাশ পেয়েছে। পার্শ্বসারাধ যে অরতের চোখের জলে বৃগে বৃগে তাঁর পার্শ্বদের সঙ্গে করে
না এসে পারেন না—সে কথা বকেও বৃকি না, তবু এখন আসমুদ্র-হিমাচল এই পূণ্য ভূমিতে সহস্র সহস্র কণ্ঠ নব-
জাগরণের বাণী শুনি ভবন মনে হয় একদিন গৌরবান্বিত শির শীর্ষে জুলে যে বীর সম্রাট ভারত ও তা বিশ্ববাসীকে
ডাক দিয়ে গিরোজেনে,—“উত্তীর্ণত জ্ঞানত প্রাপ্য বরান্ নিবাবন্ত” —“ওঠ, জাগ—জুগাছ গুরুজীকী মত” —এ শূদ্ধ
তাঁর প্রভাত্য না হলেও আশাহীন নয়—Victory to the Lord. —বীরসম্রাট (প্রবন্ধাবলী)।

সৌর্যমা প্রব্র জীবনে মৃত্যুনা—ভবানীপুত্র এ'দের আদিবাস। কালীঘাটে পুষ্কার এ'র বংশত অধিকার
ছিল ব'লেই বিশ্বেরে অম্পটীয়েই হীন গৃহত্যাগ করেন। শ্রীঠাকুরের বর্শন আর কৃপা অতি শৈশবেই পান। পুত্র
গোমুখ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রজন্ম নিয়ে যুগে বেড়িয়েছেন লক্ষ্যাত্য তদারকত শিবামরী গোষ্ঠী মেরে। নানা

অন্য কিপরাই অচিরত্যাগ ভোগিনী গেরীয়া নানা বিবাকর্মে ডুবে ছেলেছে। রাষ্ট্রদ্রোহ একবার কোন মন্দিরে দেখে, মন্দিরের মধ্যেই একটি সূচামত্বে কিশোর ভোজন হত। ভাঙলেন হঠাৎ পুষ্কারেরই কোন বালক। পরে দেখে তিনিই আবার নিঃসঙ্গনে আসীন। মৃত্যুতে দৃষ্টি হয়ে যায় শব্দ। বৃকতে পারেন কে ইনি!—আবার বধন কোমল-করীর পথ, তখন সহসা জনৈক। হািমবরী হাকুমতীর প্রকাশ। হলেন, তিনি অতি আদরেই—এ লালী ছুঁ মৃদু কিধার বাতলী!—উত্তর শূনে অলপদমরেই এক নিভৃত পথ ধরে তাঁকে মন্দির ধারে পৌঁছে যেন। স্থানীয় পাহাড়ী জেলেরা শূনে হের অবাচ, এগর দিগে বাওয়া আসা অদৃষ্ট বলেই তারা জলেন।

এরপর আসে কর্মর জীকন। ঐ ঐষ্টাকুরের বাণী শুন করে প্রথমে ব্যাকপূরে, পরে কলকাতা, নব্বাপ আর গিরিভির শাখা এর পর প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধীরে ধীরে হাতা নেমে আসে—প্রাচ্যাত্মার দিন ছোট ছোট জেলেরা জিজ্ঞাস করে, দিগদা কোথায় বাবে—নহজ উত্তর আসে, রামকলোক—হুপের মত পুত্ররূপ জীনের দেখে ঐষ্টাকুরের চরণ গ্রহণীকই এইসে চরণ পরিণতি।

—গৌরীমা (প্রবন্ধাবলী)

উপরে নীল ঢালা নিধর আকাশ, আর নীচে নীল ধারার অনন্ত উচ্ছাব, আর তাদের বেঁধে ন্যম নীল এক রামকন, সাতরা তার মন—দুই অশ্রুর অগ্নিকে বাঁধতে ত' এই সপ্তর্ষের সেতু—মৃত্যুর মনে শব্দের অভীশা—শব্দের হাসিতে মৃত্যুর ক্লিঙ্গ—অসম নেমে আসে শীঘ্র আবার শীঘ্র ছুটে চলে অসীমার—থারা আড়ড়ে পড়ে কুলে আবার কুল ভেঙ্গে পড়ে ধারার—জীবন ভেঙে পড়ে মৃত্যুর কোলে আবার মৃত্যু হেসে ওঠে জীবনের অমৃত। মহাকালের নৌমুখের এই কল নিত্য। এই ইন্দ্রদ্যব অকতার, আর পার্থসেনা তাঁর সাতস্রের সাধী।

নীলবারার চপলতা নিয়ে ছুটে গেছে এক সূর্যর কিশোর উপল ভাঙ্গা চরণে—পৃথক নাই দিশা। ...পাশে সুখেন্দু—গৌরক গুপ্তর ডাক—কিশোর হারার পথ—কেশর পথ ছিলে দিশা—প্রজ্ঞার শীতল পঞ্চটী তাকে জেঁক মের নিকড় মিশ্রতার—তার বৃক জড়ান হারার মন ভরে বার পরম আঘাসে—কিন্তু দেবতা কই? দীক্ষাপুরে যে শূন্য

ঐষ্টাকুর তখন কলকাতা নগরীতে। কিগোরে চোখে নেমে এসেছে মধ্যাহ্নের আধার—পিছনে ফেলে এসেছে সে সূর্যের নীচ, প্রির সমারোহ—সম্মুখে নিখিঁবে দীক্ষাপুরী, আশাহত মন পাননা কোন দিশা—সহসা ঘোমের সাধীর মেলে সন্ধান—ভাই, পরমহংসের কোথায়? প্রশ্ন করে আর এক কিশোর, আশার শিখা তার নরন থেকে ... এ প্রশ্ন পরম আশীরের বহু ব্যক্তিদের এই প্রশ্ন এই প্রথম প্রশ্নের জন্যই সে কেন এসে পড়েছে জীনের এই মহাতীর্থে ... রহস্য-ময়ী জননীর নরনে দেখিন হরত জেগেছিল এক মিলন মারলিক—ভবিষ্যতের রামকল সোধী। ...

সূর্যেন্দ্রের মান পূর্ণাঙ্গকে মিশ্র তনু দুই কিশোর পেশল হা' প্রসাদ—জীবনের প্রথমদিনের হারা দীর্ঘ হ'রে আসে—প্রাচ্য পদে নেমে আসে অজানা সখা।

ভবতারণী ভবতারণীর প্রসাদ অমৃত দুই বধু হলেন ভূত—রাতি ঘন হয়ে আসে, একটুতে রাতির পক্ষ্মদল ঘন রহস্যান্বিত করে তোলে দুই কিশোরে প্রাণ। ...সহসা রাতির তোয়ালে উন্মাদিতার ডাক শোনা যায়,—কালী কালী; এত। অগলি জেগে উঠে ডাক না অশ্রুধার আঘাসে—কে দেখে দিশা?—কিশোরের পরিচরে প্রভু হলেন—তুই আর জন্মে একজন কড়ি যোগী ছিল—আশা আকাশের গজনীতে ধীরে দেখে আসে উষনী—আলোর ডানায়েলে... কিশোর প্রস্তুত হইতে এসেছে... দীক্ষাপুরের সাতরা রাশীতে তখন লালিতের আলাপ—উত্তরের অলিঙ্গ ঐষ্টাকুরের স্পর্শ শূনে নিধর ব্যানে বার ভূমে—জজলের অলাব জলে। এমন ছু দিগেই ত' প্রেম-মলি কুড়িরে বাহ পাওয়া ... এই কিশোরেই বিশ্বস্রের পাকি অতলানন্দ—

সে এক বোধন-নবমীর পূর্ণাতিথি—নবদুর্গার আবাহন মন্ত উয়ার হাশ্বে উঠেছে জেগে দুর্গার ধরণীর বকে, ওঁদিকে পঞ্চটীর শব্দে ডাক পড়ে—ওরে তোরা কে কোথার আঁধার আর। সপ্ত-লোকের মন নিয়ে মা'র 'প্রাসাদ' তখন আছেন ব'সে, ওরা ধোঁওয়ার বাইরে—সেরী হয়ে গেছে—ডাক বেন পৌছায় না—সমাধির নিষ্পত্তি কি বোধনমন্ত নাই—জোর ক'রেই নামিয়ে আনতে হয়—বেঁধেই বুকি বা আনতে হয় নীড়হারা মনকে। বেননার বোধনেই বুকি জমে ওঠে মা'র চোখে একেফোটা জল—আর তারই শজলে গড়ে ওঠে মৃত্তা—নিটোল মূর্তির সে মৃত্তা। আঠারোশো সাতভটির পূর্ণাতিথির এই লগ্ন, স্বাধী অভ্যাসের আবির্ভাবলয়। ঘরে ঘরে তখন শায়দীরা মহোৎসবের নাসদীপাঠ হয়ে গেছে সুখে—যে কলাগবলপ দীর্ঘ তিরাস্তর কবসর ধ'রে ধরণীর বকে মহামহোৎসবের জড়ো তার বোধনের এই পৃথক সৈনিক ঘরে ঘরে তখন ছান্ডিত হচ্ছে—'সেই চাঁডকাঙ্ককে চাঁড—চাঁড কিরকারিণি কিলকাধাং সমাপিত্য তিত্ত সেবি স্বা সুখ'—আত'ধরণীর বোধন মাসলিক। —মুগাচাৰী

জর্ডনের জলটা কড় লাল হয়ে গেল—আজও হচ্ছে, বাঁশী শিশু বেজে ছিল নীলগ্রেম—প্রমাত' প্রাণের সে ডাক বহির হয়ে শুনলো। না জনক—এই হচ্ছে কালের অভিশাপ—যাত্রা জর্ডনের জল রক্তরাসা ক'রে তুলেছিল তারা ভাবেনি—তুমারদ্রব জল রক্ত দিয়ে বা কোন কিছু দিয়েই তাকে রঞ্জিত করা যায়না—সে চিরদিন তুমার দিম্ব—পবিত্র... কুমারী মেরী—সে এক দিবা মধ্যর দিন, তিনি দেখলেন তার গৃহে আবির্ভূত হয়েছেন স্বর্গের দেবতা—জোয়না চকিত সে রাগি মেরী কোনদিন জোয়না নি—জগৎও কোনদিন কুলতে পারবে না। স্বর্গের দত্ত বলায়লেন, হে পবিত্র কুমারী, তোমার কাছে আবির্ভূত হবেন বিনি—তিনি অর্ধ জগতের হাজা ইশামাসি—তুমি তার জন্য প্রস্তুত হও।

বীশুর পিতা বোশেমের কাছে প্রকটিত হয়েছিল এক দিবাম্বল। ভগবান ইশামাসি এসে জানালেন—পুত্র হয়ে তিনি আসবেন। বোশেম বেন এ বিষয়ে কোন কথা না করেন। গভীর রাতে তারার দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনজন পূর্বদেশীর ধর্ম—তারার কাছে এক বার্তা পেলেন, তারা বৃকতে পারলেন ওই তারা তাদের জানাচ্ছে, ওই অসীম অনন্ত আকাশ থেকে জন্মেছেন একটি আত্মা—বিনি জনকে পাপ থেকে উদ্ধার করবেন ভবিষ্যতে।

—আর্ডের তরে এসেছ নামি (অসমাপ্ত রূনা)

॥ দৃশ্য ১—রবিনহুডের প্রাসাদ ॥

[চারিদিকে গোলামাল, শত্রুরা চারিদিক ঘিরে ফেলেছে—দূর চারটে বন্দুকের আগুয়াজ হচ্ছে। রবিন ও তার ভাই উইল হুটে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল।]

রবিন—জলু ভাই পালাই, দেখাছস না, চারিদিকে শত্রুরা আমাদের ঘিরে ফেলেছে, বন্দুকের আগুয়াজ হচ্ছে—ওঃ আমাদের যদি একটা বন্দুক থাকতো তা'হলে দেখতুম।

[ভাই এর হাতের জঙ্গলের মধ্যে ঢলে গেলো।]

২ দৃশ্য ১—রবিনহুডের ভাস্করীভূত প্রাসাদ ॥

[ভাইএর হাত ধ'রে রবিনের প্রবেশ]

সঙ্গ—সংখ্যা

রবিন—হায় হায় ! উইল দেখাছল—আমাদের বাড়ীটা সব পুড়িয়ে দিয়েছে, আমরা কেমন ক'রে থাকবো ?

উইল—(কান কান করে) আমরা কোথায় থাকবো বাবা ?

রবিন—(আকাশের দিকে তাকিয়ে) ঐ আকাশ সাক্ষী, এর প্রতিশোধ আমাদের নিতে হবে। আর এখানে থাকা সঙ্গ নয়, চল্ আমরা শেরউল্ কললে চল যাই—সেখানে আমি কতদিন শিকার করে ফিরেছি।

[দুই ভাই শেরউল কললে এল—সেখানে রবিনের আরও অনেক সঙ্গী]

রবিন—সেখ ভাই, এই জঙ্গল আমাদের রাজ্য। এই রাজ্য দিয়ে আমরা কোন কলোকে ছেড়ে পেরোনা। —ওরা গরীবদের মারে, ওরা অত্যাচারী—নিজের সূত্রে অন্য টাকা ধারায়। আমরা ওদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে গরীবদের দেবো—এই আমাদের প্রতিজ্ঞা। ওদের ওই বিরাট নীল আকাশের দিকে দেখো... কত বিরাট—কত উদার—কত পবিত্র। আমাদের চোখের দিকে তাকাও, দেখ সে চোখও আকাশের মত নীল—প্রতিজ্ঞা কর; সেও হবে অর্নি আকাশের মত উদার—পবিত্র। সবাই তোমরা হাত তুলে বল—এই আমাদের প্রতিজ্ঞা—G. P. S (দুইসেলের লম্ব করিল)।

সকলে—(হাত তুলে) G. P. S.—আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, আমরা বীরদের বন্দু, ধনীর শত্রু, আমরা সব পবিত্র, উদার—God, purity, service এই দ্রোক আমাদের War cry—G. P. S. [সকলের প্রস্থান]

—রবিনহুড

*

কলকাতার সোঁদনের কথা—জনে পড়ে প্রথম গান্ধিজীর আন্দোলন। আমরা তখন বিদ্যাদায়ে পড়ি। সারদারঞ্জন তখন প্রিন্সিপ্যাল। J. R. Banerjee তাঁর নীচে। ছাত্ররা এসে জড়ো হরোহে সমুদ গলির রাজ্য পেরিয়ে। আমরা সবাই—বলে ডাক দিচ্ছে আমাদের। জ্ঞানবান্ধু বোঁররে এসে তাদের বললেন, আপনারা ভেতরে গোলমাল ক'রবেন না। শিশির ভাবুড়ী মশাই আমাদের পড়াতেন। গেটের কাছে একটা গাছ ছিল, গাছটা কি গাছ ঠিক মনে নাই, তিনি সেই গাছে একটা হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কি ভেবে দেখলেন জানি না। তবে ধীরে ধীরে বোঁররে চল গেলেন। এর পরের ইতিহাস আমাদের না কললেও চলে। অভিনয়ের উন্নতি ক'রলেও অন্য দিকে সেটা কিছু দৃশ্য নয়। আজও মনে আছে শুঁড়ি পাড়া রাস্তার একটা পুরানো বাড়ীতে থাকতেন। কল্লের কিছু কাঠে ডেকেছেন। তখন সকাল ৯টা। গিরে দেখি তখনও শূঁরে আছেন। বাড়ীটা দুমহলা ছিল, তিনি বাইরের মহলায় শুঁতেন। বোঁহর রাতে কোথাও অভিনয় ছিল। তাকাতাড়ি ঘান করে কিছু বেঁরে আমার সঙ্গে চললেন কল্লেরে। রাস্তার চলেছেন মাথা উঁচু করে—সেখে সত্যি গৌরব থেবে ক'রেছি। শূঁনৌছ কল্লেন, পেশাবারী থিয়েটারে ডাকলে দূতৃতার সঙ্গেই বলতেন, আমি এয়েচার ছাড়া নামি না। কলকাতার সে সব রাজ্য, বাড়ীঘর আজ আর নাই বোধ হয়—shifting scenes of life.

এই সঙ্গে মনে পড়ে ছবি বিশ্বাসের কথা। সে তখন আমাদের সঙ্গে পড়তো। সেদিন কল্লেরে একটা অভিনয় হচ্ছে। কি অভিনয় ঠিক মনে নাই। তবে সেদিন আমরা শূঁব হাততালি দিয়েছিলাম যখন অভিনয়ের ভেতর অহেতুক তার হাতের তেরোঘাটা চাঁপিয়ে ছিল। দেখতে বেশ সুন্দর ছিল সে। পরে সে পড়শুনো ছোঁড়ে দেয়। পরে ছিল দুসলমানের বিশেষণে শূঁনি আমরাই আত্মীয় রামচন্দ্র এমের রক্ষা করে। কিন্তু বিধাতা তাকে বেশীদিন রাখেন নি। ছবি রাক্ষো ছবি সত্য অপরাধের ছিল সেদিন।

—পুরানো কলকাতা

শ্রীশ্রীরাধকৃষ্ণ বললকাব্য

ত্রিঅর্চনাপুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তবু সৈনিন বিধার আড়াল চোলে
হাতের যুঁঠায় লুকিয়ে রাখা মিঠা
অধোরমাণি গড়ায় প্রকৃত্তর ধারে
লক্ষ্মী আসে নাইতো পুঁজি পিঠা ।

এমন ক'রে খেতে চাপ্তার সাথ
দুধক মিঠায় মিটেবে কেমন ক'রে ?
ভীষ্ম মনেই দিল প্রকৃত্তর হাতে
অমনি হাসি জাগলো শ্রীমুখ ভ'রে ।

মিঠাই খেয়ে বলেন প্রকৃত্তর
কোথার পেলে ? কিবা রত্নের স্বাভ
অধোরমাণির দুটি নয়ন ভরে
এল এসে বার ভেঙে বৃকের বর্ধ ।

দুধ দুটি দু'কনো সংবেশ
তারি তরে এমন আকুলতা
হলন ঠাকুর আসবে আবার বৈদ্য
স্বার্থাঙ্ক ব'লে রেখেই বেন কথা ।

খরচ ক'রে কিনোনা আর মিঠাই
তোমার রাঁধা সুতো কি তরকারী
একটুখানি লুকিয়ে নিয়ে এসো
তাঁতেই বে সের তৃপ্তি হবে ভারি ।

তোমার হাতের লাউ শাক চর্কাড়
সজনে খাড়া হয় যে খেতে সাথ
নয়তো নিজের হাতের গড়া নাড়
ভাই এসো মা মিচিকি বে তোর হাত ।

অধোরমাণির বৃকের মাঝে কোথা
রত্নের ব্যাধা ব্যাধির ওঠে বেন

নাড়ির টানের থালাইটি নাই বার
কিসের টানে তার এ বেদন বেন ।

দূরে কোথার ভেসেই গেল তরী
বৈঠা ঘারে উজ্জলে ওঠে ভেট
কাঁপিয়ে পড় দামাল শিশুর মত
কুলের বৃকে রাখতে নায়ে কেউ ।

মিচিকি বেন সবুজ হাসি হেসে
কুল তারে কম আর না ঘুমা ঘুমা
বল-বাঁলয়ে হাসছে তবু চেউ
ছাড়িয়ে দিলে হাজার আলোর চুমা ।

অধোরমাণির উদাস উদাস মন
সৈনিক পানে চেরেই কি যে ভাবে
একটি কঁচি মেঘলাবরণ মুখ
চোখের পাতার অশ্রু হ'রে কাঁপে ।

এলোমেলো কথার কাঁপি বৃকে
আবার সৈনিন ফিরলো অধোরমাণি
কখনও বা ভাকেই বসে বসে
হাজার প্রমাদ আপন মনে গাঁপ ।

গরীব আমি মিলাবে কোথা এত
উপকারের নিত্য সমান্তোহ
তার চেয়ে কাম নাইকো হোখার গিরে
ছিন্ন করাই ভাল মনের সোহ ।

এমন সাধু সৈনিনতো কহু
কত কি সাথ গরীব মায়ের কাছে
ভালো জ্ঞানায় মেসলে গোপাল মোরে
সেপোয় মত কিই বা আমার সাথে ।

তাই ভাল আর নাই বা গেলম হোবা
যেমন ছিলাম তেমনি রবো সুখে
কিন্তু একি ভাবতে গিয়ে কেন
আকুল হরে হল এসে বার চোখে ।

টনটনিরে ওঠে বকের কোণা
আরো কেন চোখের পথে ভায়
দাঁখন শূরের আলো ছায়ায় কোণে
সেই মেঘতার মুখটি আগে হাসে ।

তেমনি ক'রেই বলছে আবার কেন
“কই গো মা তোর ঈঠে সজনে খাড়ী” ?
আর পারে না ভাবতে অঘোরমণি
উঠেই পড়ে রাগতে তন্মজাড়ি ।

জুড়িয়ে আনে বা আছে বুঝকুড়ো
রান্নাশালে বসেই বতন ক'রে
সজনে খাড়ীর চকড়ি লাউশাক
রে'লেও কেন মনটি নাহি ভরে ।

ঘরের কোণে নিষ্ঠা ভরা প্রহর
হ'রেই গেছে কেমন এলোমেলো
এ তীরের এই গলাপাকের মন
কলছে শব্দে ঐ তীরতে চলো ।

হাজার বাঘার শাসন জগের মালা
কোনও মানাই মানছে নাকো সে
আবছা ভোরের স্বপন ঘোরের কেন
হয় গো মনে ডাকছে কেন কে ।

আঁচল কোণে সজনে খাড়ীর বাটি
জু'বিয়ে নিয়ে ছিল আঁচলেহত
অঘোরমণি তাইতো চলে চুপে
চির চেনা দাঁকশপু'রের পথে ।

কিলিমিলি পাতার পাতার সেলে
পলকটীর নিকিল শিহরণ

নিবিড় অনুভূতির মত বুকে
ঝাঁকিয়ে ধরে কপুছে সাঝা ঘন ।
মুকুটীর ডানার আঘাত লেগে
কুসুম কোমর করছে করোকর
তীরের বুকে বুজছে বেন বই
ওপাকের ঐ জুবোবাসের চর ।

দাঁকশপু'রীর সেবতা রস চেয়ে
দুরার পানে বেন গো কার আসে
অঘোরমণির পায়ের সাড়া পেয়ে
শিশুর মত অনবশতে ভাসে ।

কইগো যে মা কি এনোছিস্ দোঁখ
কলতে প্রচুর সরনা বেন তর
দিতে তাঁরে সজনে খাড়ীর বাটী
অঘোরমণির 'পরায়ণ' খরা ধর ।

সুখে কেন কতই ভগবন
এখনি হেসে বলেন প্রভু তারে
তোমার রাঁধা সজনে খাড়ীর বাটি
অমর্ত্যের গরব বেন কাড়ে ।

তারপরতে একটু মুখে দিরে
বলেন মা তোর রান্না তো নর শূদ্রা
যেকুঠের রাঁধুনী কি তুই
নারায়ণের মাটিয়ে এলি ক'থা ।

চোখেই বলে ডাবলো অঘোরমণি
গরীয় খ'লেই হরতো দ্বা এত
নরতো এমন কিইবা জিনিব হার
ভাবতে বুকে বাড়েই শব্দ ক্ষত ।

সজনে খাড়ীর বাজান একটুকু
তারি এতো প্রণামো সাতথানা
অঘোরমণির রান্না এমন ক'রে
মিষ্টি মুখে শেহেছে কত জনা ।

কতজনে খাওয়ার কত এতক
তার সাথে কি মোর তুলনা হয়
দাঁনের দহাগ বলেই দাঁনের বেওয়া
খুব কুড়োঠাই লাগছে কখনো ।

অখোরমাণির কথাবকের কোণে
স্নেহের স্নেহের তৃপ্তি যেন মেলে
নাই বা হ'ল নাড়ী ছোঁড়া ঘন
মোল তো জাগার হলয় শতমলে ।

এমান ক'রে দিনের পরে দিন
অখোরমাণি বাড়লো আসা যাওয়া
হাতের মূঠায় লুকিয়ে কিছু আনা
মিষ্টি হোসে প্রভুর চেয়ে খাওয়া ।

কখনও বা লাউয়ের মিঠে শাক
ক'রের নাড়ু একটু পরমাম
কখনও বা নারকেল তিল ছাই
সাথ বা জাগে তাই দিয়ে হয় খনা ।

এমান করেই দিনের পরে দিন
কালের পথে দিয়ে উজ্জান পাড়ি
কাম্বোদ্যাসির পল্লব মর্মে
জগৎ ধানি বাজছে নিতি তারি ।

কতগুলো ঘাসে মাথের কলাপ বসা
দাঁকিয়ে শুঁটা মূর্তা কলাপদালি
কতক ফুল কাঁড়মাথা ঠোঁটে
কাননে এলো উড়িয়ে পলাশ হালি ।

কুহেলী লেগে লালিত নীলতরু
কান্টিকা গন্ধকা পীতাম্বল
দাঁড়িয়ে বেশে অশোক মঞ্জরী
জাঁড়িয়ে পরে দিল্লীর গলে ।

সৌ দাদার গথ বাড়লো আলি
কিলাছে খুঁয়ে কুচড়ার তীর
কলসার কলসীটির ডলে
বাঁধতে কি চার একটি রত্নের নীড় ।

হিঙ্গল কুঁড়ি দলতে গিরে পায়ে
গানের কথার নবন শুটে যেতে
নাথ না জানা মোমাছিরে ভিড়ে
হারিয়ে যেতে চার যে মনে মনে ।

ফুল পল্লব নামিরে বার্ষিক
একটি পাশে দাঁড়িয়ে ভাবে একা
কলতটিনীর উপল ডাঙা অটে
কেমন ছবি আঁকে হবে আঁকা ।

আকাশ সোঁদান উবাও তারার দেশে
থমকে দাঁড়ায় হারিয়ে যেতে যেতে
দু এক কুঁচি জোৎস্না খেওয়া ফুল
পড়লো ধরে কোকিল ভোরের পথে ।

অখোরমাণির উদাস উদাস মন
আজকে কেন আরোই উদাসীরা
শেষ হাতের বাতুল সমীরণে
অকারণেই গুমরে শুটে দিয়া ।

দীর্ঘ জপের মালার প্রহর গুণে
কেটেই গেছে লায় নিরুপ শব্দ
কেমন কেন আতুল করা মনে
শেষ হারিয়ে প্রশ্ন নিবেদন ।

সহসা হার নরন সম্মুখে
হার মো একি কার মূর্তি হাসে
প্রাণান্তের গভীর নিশাস হাঁক
বৃকের পরে নিখর হয়ে আসে ।

বিস্ফারিত আঁখির তারা দুটি
হারিয়ে গেল যেন পলক মেলে
দাঁখলপুত্রের সেই সেবতা এবে
একি প্রহু কখন তুমি এলে ।

কল বল সত্যি এসেছে কি
একি তুমি কখনো কেন কথা
নীরব হাসির আড়ালস্থিত মনে
বাড়াও কেন বৃকের গভীর বাঘা ।

জগের মালা পড়লো ভূরে থেমে
ব্যাকুল মূঠি বাড়িয়ে অঘোরমাণ
ধরতে গেল সেই প্রীতপ্রভুর হাত
মিলার প্রভু প্রকাশে নীলমণি ।

মরি মরি কি অপব্ধ রূপ
নীল জোষনার মত যে মৃৎখানি
খলো খলো আঙুর দোলন চুল
চাঁপ কপালে এসেছে যে নামি ।

তারি কিছু চুড়ো ক'রে বাধা
কির্কির্কিরে মানিক নোটন গোলে
মরুত পাখা নিটোল করে গাঁবা
ছোট শিখি পেখন বেন তোলে ।

ভাগর ভাগর সজল কাজল চোখে
দুই হানি মিষ্টি হানি মাথা
তারি খানিক তুলতুলে লাল গলে
টুকটুক ঐ রঙীন ঠোঁটে আঁকা ।

গোপাল গোপাল উজ্জ্বলিমা ডেকে
হুটুয়ে কেঁদে উঠলো অঘোরমাণ
তুলকে ভাবার অবাক দিঠি মেলে
বেতছে আকাশ পুবেতে আনমাণ ।

গোপাল সেনা চাঁপ মূখে মা ব'লে
গোলাপ মূঠি তুলেছে মা'র পানে
তোতলা বোলার বাথো আথো ছলে
দাব মা ননী বলছে ফিঠল টানে ।

জাড়রে ধ'রে ব্যাকুল বাহুর মূঠে
প্রাণ কাড়া সেই প্রাণেরই নীলমণি
নীল বদনার উজান তুলে চোখে
অকোর কঁদন কাঁদছে অঘোরমাণ ।

সে কাঁদনের অব্যব বেন ভাবা,
জীবন ভরা কিসের আঁভমান
উজার ক'রে দিলেও বেন আভ
মিটেছে না সাধ হারের অব্যব প্রাণ ।

কাঁপরে দিশা গোপাল গোপাল ব'লে
ফুর্করি কর দুখীলী ব্রাহ্মণী
ওরে নিটুর সোনার বাদুনে
এই মা যে তোর দুখী কাঙালিনী ।

কি আছে যোর কি যেব চাঁপ মূখে
কীর ননী সর কোথায় পাব চাঁপ
কহতে গিরে হর না কলা আর
ভেঙে যে দার হিড়ার সকল বাঁধ ।

জাড়রে বৃকে, তুলতুলে গাল দুটি
চুমার চুমার পাগল ক'রে তোলে
দুই গোপাল সেই আদর কি মানে
কীর সরোর বাদনা চোখে তোলে ।

হুটুয়ে দুটি কচি হিঙুল ঠোট
কহছে শূদ্রই "চাই নাকে তোর চুম
সেনা ননী ভোর হরে যে এলো"
বাইরে তখন ভাঙছে আলোর ঘুম ।

কোথায় ননী নাই যে ঘরে কিছু
শূদ্রই দুটি শূকনো নাড়ু ছাড়া
নরন ওলে ভাই মিল ব্রাহ্মণী
দুই গোপাল কেঁদেই হ'ল সারা ।

চোখের ওলে কাজল খুয়ে দার
দার যে ধরে চন্দনেরই ফোঁটা
বৃকে ফেটে দার দুখীলী মার হার
দেখে সে মূখ অশ্রুজলে ফোটা ।

দুজিরে মাথা নাড়ছে কচি মূঠি
বলছে শূদ্রই নানো-নানা
শূদ্রই নাড়ু ঝাঝে না ভো আদি
কোথায় ননী সেনা এনে মা ।

আপন কামা তুললো অঘোরমাণ
হেলের কামা তুলতে যে হলে
গোপাল সোনার বৃকের মাকে তেনে
দুহতে নারে কি যে প্রবেশ দেবে ।

দুইই বলে লক্ষ্মী সোনা ছেল
 মারের কথা শোন বাপ নীলমণি
 এই বা এখন, পরে কোথাও হ'তে
 দু'হাত ভ'রে এনেই দেব ননী ।
 ডাগর ডাগর সজল নরন তুলে
 কল্লো গোপাল রিক দিবি তো এনে
 চোখের জল মিটি হারি মেখে
 যা কর ছেলের কপাল বানি চুমে ।
 এতদিন তো দিরোহি বাপ ডাকি
 আর কি ঘাঁকি দিতেই পারি গুরে
 তুই শূদ্র বল বাধিন আর ছেড়ে
 দু'কানী মা'র কোলটি আঁবার ক'রে !

অবুঝ গোপাল বুঝলো কি কে জানে
 উঠলো যেসে শূকরাদি মত
 একই খেয়ে শূকরো নাড়ুই
 মা'র মূখে সেসে সোহাগ ভ'রে কত ।
 অঘোরমণির আচার সেল ভেসে
 যতই বলে এখন যে নেই খেতে
 হরানি পুজা হরানি যে ভোগ পারা
 এই অবলার মরুবা সরমেতে ।
 দুই গোপাল শোনেই না যে কথা
 মারের মূখে মিঠাই দিল গুজে
 কোঁকা ছেলের অবুঝ এ আশা
 অঘোরমণি সইলো যে মূখ ব'লে ।

(ক্রমশঃ)

—১০৫—

‘গোরাঙ্গরূপে এল সত্যানন্দধন’

হামী মহানন্দ

(অধ্যাপক : অতেনানন্দ মহাবিদ্যালয়)

মানব সেহবারী দেবতা শ্রীরাঙ্গকক চলেছেন তাঁরই মন্দিরে মন্দিরে । চলেছে একটি বাটীভরা রেল, চলন্ত জীবনের প্রতীক । লক্ষ্যবিন্দুর ভাক আকাশের নীরবতাকে টুকুরা টুকুরা করে দিচ্ছে, নীচে ধূ-ধূ প্রান্তর । বাটী নামলো অনেক । কয়েকজন বাটীর সঙ্গে নেমেছেন দেবদানব । ভাবে টলমল অঙ্গ, বুচোখে কপাল সাগর যেন হঠাৎই খেমে গেছে । ‘মহিমা ভব উল্ভাসিত মহা-গানমাঝে, বিশ্বজগত-প্রগল্ভাৎ বোধিত চরণে ।’ দেবতার সামনে একদল দীনাতের কৃৎসাকতার দৃষ্টি । তাদের পরিচর—ভারা ভিকট, বৃক্ষফুল, জীববাস, শীর্ষসেহ, দু'হাত পেতে চাইছে দু'মুটি অন্ন । আর কিছ, চাহিবার বোধে তাদের হারিয়ে গেছে । থমকে যান দেবতা । গগনধ্বজা আর দেবতা পাশাপাশি । দেবতা ফিরে চান পাশে পাড়িয়ে থাকা ধনী ভয়ের প্রার্থে—‘মিনি হলেম সেক্ষ মধুরানাথ, দেবতা হলেন—এই জীবন্ত নারায়ণের উপরাস রেখে কোথায় বাব আমি তাঁর’ । এদের কথা আসে মেটোও । নতুন তাঁর’ রচনা করবার জন্য দেবতা এসেছেন নীচে । উপনিষদের উপলক্ষ বাণীক রূপে দেবার দায়িত্বও দেবতার—‘আমি সর্বত্র’ । দেবতা কংগার অটল । ধনী ভক্তদের ছোড়ে তিনি বসে পড়েন সেই দীনাতের মাঝে । ধরা নর, দেবা, দেবা । ‘জন্ম অবাক নীলাম্বর রঞ্জনী-ভারা, গাথিছে হে শূদ্র ক্রিয়মালা, বিশ্ব পরিবার তোমার ফেরে সুখে থাকাবে, তোমার স্রোত প্রসারিত যোমে যোমে ।’ দেবতা হলেন, এদের আমি ছাড়া কেউ নেই । বাও তোমরা তাঁর’ । আমি এদের কাছেই রইলাম । মধুরানাথ বলকাতার লোক পাঠিয়ে আনালেম সব কিছ । ভয়ের ভারে এল অন্ন-উপকার, এল লক্ষ্য নিবারণের বশ । দেবতার হুকু ভরে উঠল, ভক্তের দরশী নিষ্ঠার দেবতা প্রসন্ন চোখে চাইলেন তার পানে । সত্যাকর সেবা । পৃথক হ'লার পৃথক হ'লেন নারায়ণ শত দীনাতের হৃদয় ধরে, তার কথা না মিটলে মন্দিরের ঠাকুর থাকেন অসুখ । তাঁর'বাটা হল সার্থক । মধুরানাথের জীবন হল কলা ।

বৃষ্ণের পটভূমিকাজেই বৃষ্ণপদ্যের ঘটে আকর্ষণ। ইতিহাসের প্রয়োজনেই একই শব্দ বিভিন্ন বৃষ্ণে ভিন্ন ভিন্ন নাম নিয়ে আসেন। বৃষ্ণের স্মৃতি ভিক্ষণী আশ্রমালী, বিনি ছিলেন সমাজ উপেক্ষিতা, চৈতন্য অবতারে জগদীশ-মাধাই, আধার গ্রীষ্মকক্ক অবতারে গিরীশচন্দ্রকে দিলেন পূর্ণা কন্যাসা, উপেক্ষিতা নটী বিনোদিনীকে চৈতন্য দান করলেন গ্রীষ্মকক্ক। কবির ভাষার বলতে ইচ্ছা করে, 'জিন্দু বৃষ্ণে যতপার দান কর, আমি ততকণে দেখে লই এই কল্পণা খেলা।' বৃষ্ণপদ্যে সত্যানন্দ চলছেন বীরভূমের গ্রাম বাতিগারে। ভগবান তথাগত যেন স্নানার্থে পরিভ্রমণ করে ভিক্ষুকসমূহ গ্রহণ করেছেন, এবার অহংকার ভিক্ষা। পায়ে দুটি খড়ম, দাম মার ছ'দানা, কল্লরের ঘেহুয়া কাপড় একখানি সর্বস্ব। তখন বাতিকার বাবার জন্য কোন বাস ছিল না।

গ্রীষ্মক্কর বাধেন গোরুর গাড়ীতে প্রায় ২০২৫ টি গোরুর গাড়ী প্রস্তুত। সঙ্গে যাবেন ভক্ত ও মায়েজা। ঠাকুরের গাড়ীটি ঢালাডোনা সড়ক মহারাজ (স্বামী সত্যানন্দ) প্রায় ৮ মাইল রাজ্য। ঠাকুরের গাড়ীর সঙ্গে বেশীরা ভাগ সব হেঁটেই যেত। সে কি আনন্দ! কতকম ঠাকুরের গান, কত জয়ধ্বনি, কত রবমের প্রসাদ। কখনও ঠাকুর নামছেন, গান লিখছেন, হরত ছুঁতেন, সবাই তখন ছুঁতছে। তখন কে যে ছোট, কে যে বড়ো, কে যে মা, কে যে বালিকা, কারুর জ্ঞান নেই, সব ঠাকুরের সম্মুখেই বসে ছুঁতছে। হরত একটা সাইকেল পেলে ঠাকুর তাতেই চড়ে বসলেন। শৃংখ, হাঁস, শৃংখ, আনন্দ, শৃংখ, প্রসাদ, শৃংখ, প্রসন্নতা। সেই দলে তখনকার একটু বড়ো সুদাস, অরুণ, অমল, সুনীল, হীর, অমল। আছে আনন্দনা, খোকনা। আর একটু বড়ো হালু, সার মহারাজ। মানিকজাঠা সবচেয়ে বড়ো হলেও এসব আনন্দে সব চেয়ে ছোট। অকল্যাণী, মহামায়া, সূর্য্যনাথ, শরণাথ, বৃন্দা, গান্ধী, আরাধনা, আরতি, যোগদায়ী। একটু বড়ো আছেন উবালা, অম্পর্গমা, অমপমা, অপরমা, শতীমা, অর্পিতমা, শোভামা, বাতিকারে আবাহন করবার জন্য আছেন প্রভাকর মহারাজ, আর বাতিকার আশ্রমের প্রাণ শংকরাণী বেলামা, আর খুব ছোট শ্যামল আরো ছোট গদাই। সে বছর বোধ হয় গণাই-এর অগ্রপ্রাশন হয় বাতিকারে। লেখাটা বোধ হয় ছোট হয়ে গেল, কারণ বাতিকারে কখনোই ঠাকুর, বাতিকার নাম সংকীর্ণনে ঠাকুর 'গৌরান্দ্ররূপে এল সত্যানন্দধন'—এ যে দেখে নাই তার ঠাকুরের অনেকখানি দেখা হয় নাই।

বাতিকার গ্রামে এখনও ঠাকুরমেলা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যতম ভক্ত দিবাকর ঘোষ ও তাঁর ছেলেমতো সকলে উপস্থিত ছিল নাথ, ফুল, মালা নিয়ে। প্রায় ১ মাইল দূর থেকে প্রায় একশ হোল বাজিয়ে ঠাকুরকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া হল। গ্রামের উঁচু জাত থেকে নীচু জাত, অভিজাত থেকে অখ্যাত সকল মানুষ হাতে হাত ধরে নিয়ে চললেন ঠাকুরকে বড়ো মানুষ বড়ো ভক্তদের কথা আমি বলতে পারবনা, তবে সাধারণ মানুষ, যারা বাবুদের বাড়ীতে উঠতে পারেনা, সেই মানুষ তাদের চোখে এদোছিল এক পরম আশ্বাস। 'তারা তাদের 'সত্যানন্দধন'কে চিনে নিতে পেরেছিল। এ যে সেই গৌরান্দ্ররূপে এল সত্যানন্দধন' করেই হাজার মানুষ নামসংকীর্ণনে ডাকবিলে। সে বীর বিক্রম নৃত্য ও নাম থামান সম্ভব হয়নি। তারা বাবুবে না। এতদিন তারা পারনি, এবার তারা যে ফিরে পেয়েছে জীবনের আশ্বাস, সকলে যেন বলেছে, 'হে মহা ভিক্ষু, লও সবার অহংকার-ভিক্ষা' আর দাও প্রাণ কঠিন দীক্ষা'।

পারিনি সংগল বেলাকার দৃশ্য—শরে শরে বাতিকার গ্রামের অহংহালিত, অম্পৃশ্য, জাজে বড়ো বাবুদেরকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে রেখেছে—তারা এসেছে দান করে, দুর্ভিক্ষ পরে। তাদের দীক্ষার আরোহণ হয়েছে। সামনে জন্মছে হোমশিখা। মানিকজাঠাকে ঠাকুর আদেশ দিয়েছেন—তাদের জন্মান্তর ঘটেবে। তারা হবে 'বিজ্ঞ'। আজ তাদের সকলের সঙ্গে সমান অধিকার। শৃংখের প্রসাদ গ্রহণ—বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আজ 'এক শ্রেণী'তে বসে প্রসাদ নিচ্ছেন, প্রসাদ বিলি করছেন—সেই 'নবজাতক' বাবুর উত্তরণ ঘটেছে—তারা আর কারুর দাস নয়—তাদের পরিচয়—'ঠাকুরদাস'। তাদের খাওয়া পান্য ঠাকুর স্পর্শ করলেন—আর সমস্ত অহংমিকা চূর্ণ করে সমস্ত ভক্ত সেই ঠাকুরদাসদের খাওয়া পান্য গ্রহণ করে নিয়ে চললেন।

গ্রামাধ্যে ভোগ গ্রাহেন, সতীমা, শোভামা, মালতীমা, অমলামা, চারিদিকে খসে নিচ্ছেন কর্ণমায়া।

ঠাকুরের সঙ্গে এসেছেন—সেজকাকা, জ্যাঠামশাই (ঠাকুরের বাবা) আর ফটিবদাতা' আছেন। পরবর্তীকালে ঠাকুরের মোটা গাড়ীর সাহায্য ছিলেন ফটিবদা ও সূহাসিনী।

সুনীল, হীরু, বিমল, অমল, গাবু ইত্যাদি ঠাকুরদাসদের পাঠা যিচ্ছেন—গ্রামের সকল মানুষ আজ গণসেবতার ভোগ পরিবেশন করে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করছেন। গোটা বাতিকার গ্রামে ঘরঘরনি উঠেছে 'আমাদের ঠাকুর, জর জর', পরম বিশ্বাস নিয়ে এই সব জাগ্রত ভগবান ঠাকুরদাসের দল কলছে—'আমরা ঠাকুরের, ঠাকুর আমাদের।' তারা যেন একথাও বলছে—বাবুয়া গো—আমাদের জন্যই তোমরা ঠাকুরকে পেলে, ঠাকুর যে আমাদের জন্যই ছুটে এসেছেন এই গ্রামে—বাদের কেউ নেই তাদের ঠাকুর আছেন। আজও বাতিকার আগ্রহে চৈতন্য মহারাজ সম্যাসী হয়ে সেবা করে চলেছেন। চৈতন্য মহারাজ পূর্বপ্রবেশে ছিলেন জাগ্রতে ধাওড়।

সিউড়ী আশ্রম নির্মাণকালে তখন পুরনগড়া (শ্যামী পরমানন্দ) নিজে মিস্ত্রীর কাজ করতেন। ব্রাহ্মণ সন্তান পেয়ার উকিল, শহরের সম্ভ্রান্ত বাড়ীর ছেলে। তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণ করতেন এবংজন নামান্য শ্রমিক—নাম নিমাই। সামনে ঠাকুর কাজ দেখতেন। একদশনৈই সব একাকার। এসো হে ব্রাহ্মণ শূচি করি মন ধরো হাত সবাকার / এসো হে পতিত হোক অপনাত সব অপমান তার। অপমান তার দূর করছেই সত্যানন্দ-আবিরতি। আজ নিমাই মহারাজ সম্যাসী। মাদির্মিহে তিনি চরণামৃত দান করছেন বহু ভক্তকে। এই নিমাই মহারাজ কর্তা ঠাকুরকে খুব ভয় করতেন। আজ সত্যানন্দ-শূচি তিনি নির্ভীক সম্যাসী। সিউড়ী আশ্রমে প্রথমার্ধকে 'দরিদ্রনারায়ণ সেবা' সেই ১৯৩০ সালে থেকেই উপহারে বড়ো অর্থ। আমাদের মাদিকল্যাণী (শ্যামী নির্বদানন্দ) এ সংঘে খুবই উপহারী ছিলেন। বসন্ত কুমার সে, লক্ষ্মী নারায়ণ, শ্রীশঙ্কর নন্দী ছিলেন সমর্থক।

সারদা মেলা পর্যন্ত এই কলিঙ্গ দরিদ্রনারায়ণ সেবা চলত। সারদা মেলাতে সূহাস মহারাজ সব কিছুইই বুকি নিতেন। উকিল ৮ সূহাসচন্দ্র সেনগুপ্ত, আনন্দ গোপাল মিত্র এঁরা ভিক্স করে আনতেন চাল ডাল। ছোট্ট ছেলে মীন্দু সেও এনেছে 'ভারিচিক' (দাঁড়িম্বা সেনগুপ্ত) প্রথমেই শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ করেবজন বালক বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে নিজে পরিবেশন করতেন, প্রথমে গলার মালা দিয়ে, নুড়ন বস্ত্র দিয়ে তাঁদের আবাহন করতেন। তারপর অন্যান্য সেবকরা সারাদিন অন্ন পরিবেশন বস্ত্র বস্ত্র বিতরণ করতেন। কল্যাণিতপের তার ছিল রামবাবু উপর। হাজার হাজার মানুষের প্রেম ভালারসা উপহৃত পড়ত এই সত্যানন্দ চরণে, আর প্রভু সত্যানন্দ তখন দুটি হাতজোড় করে তাঁদের নমস্কার জানাতেন—চিকুরসেধর নীচে নেমে এসেছেন, নীলে তাঁর প্রেম হাত যে মিছে। তাঁর ইচ্ছা হল প্রেম কেমন, আশ্বাদন করতে। তাই ঠাকুরদাসদের প্রেম আশ্বাদনে তাঁর চোখ ছিলল। চিকুরসেধর তৃপ্ত হলেন। 'গৌরানন্দরূপে এসে সত্যানন্দ নে'—এই লাইনটি কে রচনা করেছিলেন জানি না কিন্তু সার্থক তাঁর রচনা। গৌরো অবতারের প্রয়োজনই হল চৈতন্য-চারিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কাঁকাজের মত—কৃষ্ণ ইচ্ছা করলেন—তাঁর প্রেমের রাবা এত ব্যাকুল—সে প্রেম কেমন—তাঁই আশ্বাদন করতেন 'রামভাবদুর্জিত' গৌরাসের অবতরণ। এবার সত্যানন্দ একজন মানুষের প্রেম আশ্বাদন করতেন। সত্যানন্দ শূনে গেলেন তাঁর আশ্বাদনের কাছ থেকে তারা যেন কলছে—

"তুমি আমার আপন / তুমি আজ আমার কাছে

এই কথাটি বলতে দাও হে / বলতে দাও।"

কুড়লা আশ্রমে অঙ্গদানন্দ মহারাজ গীতামা, মাদুরী মা এই অঙ্গদুটের ব্যবস্থায় ঠাকুরকে নিজে পেয়েছিলেন। আশ্বজাড়া আশ্রমেও মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন শ্যামী পরমানন্দ ও শ্যামী বোধানন্দ মহারাজ। সেই একদুশা—বহু মানুষের তৃপ্তিতে সত্যানন্দ হন পরমতৃপ্ত। নতুন ভাইবোনের সূচনা হল এই সব আশ্রমে—নরনারায়ণের ঘরঘরনি সর্বত্র।

কাণ্ডারী গো

দ্বিতীয় বোধানন্দ

অর্জনিত শক্তি প্রকাশের চরম অবস্থা হ'ল শক্তি নিয়ন্ত্রণ করা—"The greatest display of energy is in controlling energy."—এই কথা লোকাতীত পুরুষের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাঁদের উপশান্তির অনন্ত বিসারী প্রভাবে মানুষের আত্মিক কল্যাণ সাধিত হয়। লৌকিক জগতে তাঁরা সাধারণতঃ অলৌকিক শক্তি প্রয়োগে বিরত থাকেন। তাঁদের বিপুল শক্তিকে সবেত করে রাখেন।...কিন্তু কখনো এর ব্যতিক্রমও দেখা দেয়। দুর্বল অসহায়, দুঃখের দহনে দিশাহারা মানুষ বন্দন নরনরভাবে সেই দেবপুরুষের পরোক্ষ হস্ত, তখন পরোক্ষত ভক্তের আত্মা কাতর প্রার্থনার তাঁদের দ্বার কলিত হয়। করুণার রূপাশ্রয় হ'তে তাঁদের অলৌকিক শক্তির প্রকাশ হয়। তাঁরা আতঃ ভক্তকে অস্তর সেনা, স্বাভি সেনা, শান্তির চন্দনে তার ত্যাপিত প্রাণ মিশ্র করেন।...

অনেক দিনের কথা। কিন্তু আরো মনে পড়় সোঁদনের এক মধ্যাহ্নিক ঘটনা। মনের চোখে আরো জেনে ওঠে সেই শোকাবহ দৃশ্য। ১৯৫১ সালের ১লা মে শুক্রবার। একটি ছুট্টমুটে সমুদ্র তেলে। সোঁদন বিকেল বেলায় বাইরে গেছে অনাদিনের মতোই কেঁদে। কাছেই একটা গিলির পথ দিয়ে যেতে যেতে প্রকৃত এক ট্রাক আটকানো এসে তাকে থাকা দিল। ছোট্ট শরীরটা তার রাস্তার বাহুড়ে পড়লো। অমনি সেই মাংসবাহকী গাড়ীটা তার বুকটা পিছু ছেলে তখনই তাকে শেষ করে দিল। ...জেলের মা তার বাড়ী ছেঁড়া বনকে এইভাবে একদিনেই হারিয়ে ফেলে শোকে উদ্ভাসিত হ'ল। আত্মীয় পরিজন তাকে সাধনা বেওয়ার কোন তাহাই বুঝে পেল না। জুকের কেঁদে কেঁদে ওঠে মা। থেকে থেকে চাঁৎকার করে তাকে তার জিহ্বার মতো হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে। ...একদিনেই কয়েকটা দিন কেটে যাওয়ার পর তাকে নিয়ে আসা হ'ল সিউড়ী থেকে বরাহনগর আস্তে আস্তে তার গুরুদেব শ্রীসত্যানন্দ মহারাজের কাছে। শত্রুধর, সম্বন্ধী গুরুদেব দর্শন করে, তাঁর দৃষ্টিপ্রদানে পুত্রহারা মায়ের প্রাণ শীতল হ'ল। আস্তে শ্রীগুরুর শাক্তিহারাতে কিছুদিন বাস করে তার বুকটা ভুঁড়িয়ে গেল।

সোঁদন বরাহনগর আস্তে আস্তে মন্দিরে এসে আসেন শ্রীসত্যানন্দদেব। তাঁর ভক্তবিশিষ্ট মায়ের আর্গতি হচ্ছে। মন্দিরে বসে আরো পুত্রহারা মা। সঙ্গে আসেন তার সন্ন্যাসিনী বোন আর অন্যান্য সন্ন্যাসিনী মায়েরা।...হ্যান্সদেবের চোখ দু'টি মেলে শ্রীসত্যানন্দদেব কি কেন দেখছেন। প্রতিদিন আর্গতি গানের সুরে মায়ের অন্তঃ পতীর মিনি জুবে যান, আর তিনি কিন্তু কখনো চোখে চেয়ে চেয়ে কি কেন বায়ে বায়ে দেখছেন।...একদিনেই আর্গতি শেষ হ'ল। একে একে সবলে প্রণাম সেরে উঠে গেলেন মন্দির হ'তে। ছেলের মা-টিও চলে গেল তাঁদের সঙ্গে। সব্যঃ শেষে তার সন্ন্যাসিনী বোন প্রশ্নাম করে উঠেই দেখলেন—বর, গাঘন সত্যানন্দদেবের দু'টি আঁখি সন্ধ্যা তারার মতো মুটে উঠেছে। তিনি বললেন— "আহা। ছেলোটা মন্দিরে আর্গতির সময় সারাক্ষণ তার মায়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তার মা যেমন ফ্যান্টাস্টিক করে তাকিয়ে থাকে, সেও অমনি করে আমার দিকে আঁখিরেছিল। তার কচি বুকটা ট্রাকের চাপে একবারে চূর মাং হয়ে গেছে। কিন্তু দুঃখবানোতে মাথানো একটা শাফ্রী।... ওর মতোই আর একটি ছুট্টমুটে মেলে বেশ কিছুদিন আগে মারা যাওয়ার পর সিউড়ী আস্তে আস্তে মন্দিরে এসেছিল। তাকে যেখানে আলোকলম্বল দুঃখানি নিয়ে মন্দিরে ঠাকুরের সিংহাসন প্রদর্শন করছে। নাম তার মাণিক। কি জানিস, এইসব মূলদেবের শিল্পী হ'ল দুঃখলোকের মূল। দুঃখিনের জন্যে ছুটেছিল এই ধরার ছলার। মূলে মূলে পুঙ্খ গানে জিহ্ম-আনন্দে ভরা দিব্যলোকে এমনি কত দেবদেবী নন্দন আলো করে আছে।"

ঠাকুরের শ্রীমুখের এই কথাগুলি সম্মানিনী বোনের কাছে শুনে ছেলের মা আনন্ডান্ ক'রে কাদতে কাদতে বল্গ্গ তার বোনকে—“ঠাকুর কৃপা ক'রে কি আমার নীলুটির চাঁদ্র মুখটি একবার দেখাবেন না?” মারের প্রাণের এই আকুলতা ঠাকুরের কাছে নিবেদন কর্গ সম্মানিনী বোন। সজানহারা জননীঃ ব্যাকুল হৃকের এই প্রার্থনা শুনে বাথার বাথী ঠাকুর নিঃশব্দ হ'রে রইলেন। দরবারী মুখে কোন ভাষা নাই।

হালোকতা ভোরের গলা ধীর মধুর ভবেন বেয়ে চলেছে। নিতাদিনের মতো সোঁদান ধ্যানদানে বসে আছে ন শ্রীসত্যানন্দদেব। তাঁর ধ্যান সমাহিত শ্রীমুখের সারিখে ব'সে সন্ধ্যাসী সজানেরা জপনিরত। ধ্যানান্তে মহামোহী প্রশান্ত মুখি মেনে সম্পূর্ণ গম্ভীর দিকে চেয়ে রইলেন। কি এক ভাবে আবিষ্ট তিনি। তাঁর সম্মানী সজানেরা একে একে প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন দ্বানকৃত্যর জন্য। ওদিকে দুরার প্রাণে তখনো বসে আছে পুত্রহারা জননী। ঠাকুরের শ্রীমুখে পানে উন্মুখ হ'রে চেয়ে আছে সে।...হঠাৎ কোথা হ'তে তার সেই হারানো ছেলে নীলু শ্বশুরটিকে এসে দেখা দিল। গম্ভীর ঘাটের সিঁড়ি থেকে আস্তে আস্তে সে উঠে এল। মন্দির প্রাঙ্গণ আর সিঁড়ির প্রথম পৈষ্ঠার মাঝে যে রোলিং আছে, তার দুই হাতে সেই রোলিং ধ'রে দাঁড়াল। ভোরের আলোর মুটে ওটা কমল কলির মতো মুখখানি নিয়ে অনিমেষে চেয়ে রইল সে, একবার ঠাকুরের দিকে, আর একবার তার মায়ের মুখের পানে। মা দেখছে একসন্দিতে তার হারানো ছেলেকে। পুত্রদেবের দিব্যান্যায়িত্যে কোন বিফলতা, কোন উত্তেজনা উজ্জ্বল নেই মায়ের মুখে চোখে। ঠাকুরের শ্রীমুখে নিঃশব্দ সব প্রের উদ্ভূত। --এমনিভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, ঠাকুরের অলকা ইরিঙে ছোটটি যেমন ক'রে এসেছিল ঠিক তেমনি ক'রেই ঠাকুরকে আর তার মা'কে দেখতে দেখতে গম্ভীরঘাটের সিঁড়ি থেকে আস্তে আস্তে নেমে গেল। মিশে গেল নীলু নীল আকাশের কোন'খানে।...কম্ভাস্যবতার সত্যানন্দ সুল্লরের নরন হ'তে মহাশক্তি ক'রে পড়ছে। শান্তিভাজা শ্রীসুল্লদের তাঁর আশ্রিতা কন্যার দিকে তাকালেন; শ্রীমুখে দিব্যমুগ্ধ হাসি। কৃপাণ্যো শিখ্যা শ্রীসুল্লের চরণে লুটিয়ে পড়লো।...

শ্রীসমক্ক বললেন—“পুত্র কণ্ঠধার।” জীবন-ত্তরীর মাঝি।...হালের মাঝি থেরা প্যারাপার করে নির্ধারিন। কিরাম নেই, বিভ্রাম নেই তার। এপারে নীরব নিশ্চিৎ দিশাহারা বাটী বখন আকুল হ'রে চেয়ে থাকে ওপারে,—তার বুকভাঙ্গা কান্নার সাড়া দিরে মাঝি তখন আসে আলোর তরপী থেরে—এপারের থেরাঘাটে। হাতে হ'রে, বুক ঘিরে নিয়ে চলে ওপারে। বাটী তখন পরম শ্বান্তিতে পাড়ি দেয় ওপারে আলোর দেশে। সে যে তার জীবন মরণ সাধী। এপারে ওপারে আসা-যাওয়ার পথে নিত্যসঙ্গী। ভর-ভাবনা কী তার? জীবনমৃত্যু হাসিকান্নার পালা শেষে একদিন নিয়ে বাবে সে ওপারে উভার আলোয়। এ সে তারই প্রতিশ্রুতি। এই আশ্বাস বুক নিয়ে, মৌন নিবেদনের মাঝে প্রাণের পরম কণ্ঠটি জানায় তার কাঁড়রিক্—

“তুমি যদি স্বকামাকে থাক নিরবধি
তোমার আনন্দমুখি নিত্য হেরে যদি
এ মুখ নরন যোর। পরাপ্রসন্ন,
তোমার কোমলকান্ত চরণপদ্ম
চিরপর্শ রেখে যায় জীবন-ত্তরীতে,
কেমনো ভর নাহি করি বাঁচতে মরিঙে।”—রবীন্দ্রনাথ

স্বামী সত্যানন্দের শিক্ষা-চিন্তা

ডঃ গৌরবরঞ্জন কপাতি

(অধ্যাপক : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

‘মহৎ গম্য মহৎ মানুষ্যের অধঃপতন ভাষা’—কথাটি লিখেছিলেন একজন ইউরোপীয় সমালোচক অনেককাল আগে। পরবর্তী যুগে মিল্টন লিখে গেছেন মহৎ কবি নিজেই একখানি মহাকাব্য। তাঁদের লেখা এবং তাঁদের হলুদা বেন একই স্রোতার দুই দিক। সেজন্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা সৃষ্টি কর্তাকে জানার চেষ্টা করি। সাধন ডব্লেনের দুর্গম গিরিবর্ষে নাব্যরণ মানুষ্যের চলাচল বড় কম। এই উন্নত ভূমিতে বাঁদের আনাগোনা বেশী, তাঁদের যথার্থ পাক্রয় পাওয়া দুঃসাধ্য। সেইসঙ্গে এইসব মহাজনেরা স্বপ্নন জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করেন তখন অল্পা আয়ত্না তাঁদের কিছুটা নাগাল পাই। প্রায়ই দেখা যায় সাধুপুণ্ড্রব্রহ্মেরা সাধারণের মধ্যে জ্ঞানপ্রদেব করেন আবার সাধারণের মধ্যেই প্রতিপালিত হন কিন্তু অস্বর্নিহিত ঐশী শক্তির প্রেরণার এক দিব্যরাজ্যের সন্ধান পান। স্বামী সত্যানন্দ শ্রীশ্রামকৃষ্ণ গঙ্গনের একটি উচ্ছল জ্যোতিষক। তাঁর কৃপাদৃষ্টি লাভ করার সৌভাগ্য আমার হয় নি। অব শ্রীশ্রামকৃষ্ণ সেবারতনের (করানন্দ) বিশেষ সান্নিধ্য এসে যা কিছু উপলব্ধি হয়েছে, শুধু সেইটুকু সম্পন্ন নিয়ে এই প্রবন্ধের অন্ত্যস্তা—বাক্য বলে গলাফলে গলা পুজা।

ঠাকুর শ্রামকৃষ্ণ একদিন ভবংমনা পুণ্ড্রক বোগদিকে (স্বামী বোগানন্দ) বলেছিলেন “ভবং হতে হবে বলে কি বোকা হতে হবে? দোকানী কি দোকান থেকেই কর্ম করত হয়েছে, যে তুই তার কথার বিশ্বাস করে কড়াখানা একবার না দেখেই নিয়ে চলে এলি? আর কখনও ভুল্প করিস্ না। কোন দ্রব্য কিনতে হলে পাঁচ দোকান ঘুরে তার উচিত হল্য জানাবি, দুগটি নেবার কালে বিশেষ করে পরীক্ষা করবি, আর যে সব দ্রব্যের কাউ পাওয়া যায়, তার ফাটটি পর্য্যন্ত গ্রহণ না করে চলে আসবি না।”

স্বামী সত্যানন্দেরও ঠিক এই ধরণের শিক্ষা ছিল—‘সাধু হবি—তা বলে হুং হবি কেন?’ বাস্তবিক তাঁর মত পড়ুয়া সাধু খুব কমই দেখা যায়। পড়া এবং পড়ানো দুইই তাঁর জীবনের রত। একদিনকে কঠোর তপস্বী অনা-দিকে আজীবন শিক্ষারত। অজানাকে জানার কৌতুহল তাঁর স্বভাব সিদ্ধ—পড়ানোর ব্যাপার বেন তাঁর জগৎপ্রাণের অন্তর্গত—আবার সব কিছু নিয়ে Experiment করাই বেন তাঁর একান্ত মনোপ্ত। লিখে গেছেনও বড় কম নয়—‘পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ‘হুমে হুমে বার আসা’, ‘হুমাচার্য’, ‘বিবেক বোস’ ও ‘ভিতাইন্ হ্যাসেন’, ‘সন্ত অফ দি সোল’, ‘ওরাল্ড কিলসফি’, ‘ওরাল্ড এথিক্‌স্’ এবং ‘ওরাল্ড সাইকোলজি’। ছোটদের জন্য লিখেছেন ‘গলাধরের অ অ ক খ’ এবং ছড়া ও কবিতার বই—‘জীবন গুড়া’। লিখেছেন নাটকও—‘রবিন হুড’, ‘হুলাং কুলানন্দ’। প্রসঙ্গত বলি, স্বামীজী সম্পর্কে বহন আমি কিছুই জানতাম না, তখন ‘গলাধরের অ অ ক খ’ পড়ে কখন বেন মনে হ’তছিল যে লেখক একজন শিশু মনোবিদ এবং নিশ্চয়ই কোন সাধু সম্প্রদায়ভূর। প্রথম এবং সর্বাত চেনার তাঁর দকতা অতুলনীয়। বিভিন্ন ভাষায় প্রায় সাত হাজার সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, বার দিব্যভাব সম্পন্ন অতুলনীয়, আবার মনোবিদ্যায় প্রতি, বোধকরি তাঁর সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ। শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে কি ভাবে এই বিদ্যা প্রয়োগ করা যায়, সে ব্যাংয়ের তিনি অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন। শুধু তাই বা কেন, শিক্ষাসম্বন্ধিত নিয়ে ঠিক কি ধরণের Experiment হল্যা প্রয়োজন, তারও কিছু কিছু লিখেই তিনি দিয়েছেন।

স্বামী ব্রহ্মকানন্দ বলেছেন “শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রকৃষ্ট থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ”—সম্পূর্ণ সোচ্চািনর্ভর সাক্ষ্য, কোন সংশয় নেই। স্বামী সত্যানন্দ এটিকে ঠিক মতোয় মত গ্রহণ করেছেন তাঁর শিক্ষাদেশে। কতুত, স্বামী ব্রহ্মকানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ এবং স্বামী সত্যানন্দ—এঁরা সবলেই ভাববাদী দার্শনিক এবং গ্রন্থক-সোচ্চািনর্ভর অধ্যাপক। এমন প্রস্থ থাকে, কিভাবে এই শিক্ষাকে রূপান্তরিত করা সম্ভব? এ বিষয়ে স্বামী সত্যানন্দ সব চেয়ে বেশী জোর দিয়েছেন শিশু-মনোবিজ্ঞানের উপর। শিশুশৈল্পিক শিক্ষার তিনিও একজন ধারক এবং বাহক। তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ছিল—“ছেল্লেরের তৈরী করতে হ’লে আগে দান্দ্যারের তৈরী করতে হবে। দান্দ্যারের আগে শিক্ষা অর্জন করতে হবে। আগে নিজে duty, obedience, regularity, ছেল্লেরের প্রতি love বা স্নেহ রপ্ত করতে হবে। নিজের উপর নজর রাখতে হবে। তবে তো ছেলে তৈরী করার যোগ্যতা অর্জন করা যাবে।” এই সঙ্গে তাঁর আর একটি সম্পূর্ণ নতুন কথা—“আমাদের মতে সত্যিকার শিক্ষকের শরীর থেকে একটা কল্পন ছেল্লের। ছেল্লেরা যদি সেই শিক্ষকের সঙ্গ করে, তাহ’লে শিক্ষার একটা উন্নতি বোধ করতে পারবে।” এই স্নেহবাক্য শুভাি সম্প্রদে, আমায় মনে হয় নতুন ভাবে Experiment করার দিন এসেছে।

আধুনিক হলে বিশেষ করে উনিবিদ্য এবং বিশ শতাব্দীতে জামরা পুরাতন শিক্ষাকে নতুন করে বন্ধুতে পরিবর্তিত এবং তা সম্ভব হ’লেই যত্নে মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে। আজ আমরা জানতে পেরেছি যে শিশু বাস করে তার নিজস্ব জগতে, কল্পের জগতে নয়। তাই কল্পের জগতে যা অর্থহীন, শিশুদের জগতে সেসব মূল্যহীন নয়। স্কোলা ও কল্পনা নিয়ে তার জীবন। নিজেকে কেন্দ্র করেই তার পন্থকেন্দ্র এই পৃথিবীতে। আর এমন যে শিশু, তার দেশ ও কাল অনুসারে কোন পার্থক্য নেই। শিশুর অহং বৃদ্ধি, তার ক্ষমতার আকাংক্ষা, তার বড় হবার আয়ত, উচ্চত কল্পনার মধ্য দিয়ে সে চরিতার্থ করে। আপন প্রকৃতিতে সে যেন আত্মভোলা! শ্রীসত্যানন্দসেব শিশুর এই মনোপ্রকৃতি সত্যেই সম্পূর্ণ অব্যাহত। তিনি বলছেন—“শিশুদের শিক্ষা দিতে হ’লে আমাদের শিশুরাে প্রবেশ করতে হবে। তাদের চোখ দিয়ে জগতটিকে দেখতে শিখতে হবে, বন্ধুতে হবে।” তাঁর মতে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে ভালমাসাই হবে শিক্ষাদানের বিনিয়োগ। সেদিন একটি বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখি হািহিত তর্কবুদ্ধি—নার্সারী ইন্সকুলে শিক্ষার মাধ্যম কি হবে, ইংরাজী-না বাংলা? আমার কিন্তু মনে হয় নার্সারী ইন্সকুলে শিক্ষার মাধ্যম হবে মেহ এবং ভালমাসা। আন্তরিকতার সঙ্গে ভালমাসে শিশুকে বা শেখানো যাবে, সে তাই শিখবে মহা আনন্দে। এমন এই ভালমাসার কখন কিভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব? সম্ভব, কেবলমাত্র একাত্মিকত্বের (identification) সহায়তায়। আর এ ব্যাপারে স্মরণ সত্যানন্দ ছিলেন একজন সুনিপুণ শিল্পী। শিশুদের তিনি ভাবতেন ‘শিশুদান্দ্যারণ’, আর তাদের সঙ্গে একাক হ’লে তিনি খেলতেন—গুঁড়োচাঁর, লাফালাফি এবং বড়ি-ছোয়া ইত্যাদি। আর এই একাত্মিকত্বের মায়া সঙ্গ সঙ্গ এমন অবস্থার নিয়ে শোঁছাত, যে তিনি শিশুটি হ’লে নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। শিশুশিক্ষার পূর্বাপর স্তরগুলি তিনি যে ভাবে নির্ধারণ করেছেন তাও মনোবিজ্ঞান সম্মত। শৃঙ্খল্যানেই শেষ নয়, কোন জুরে ঠিক কি ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন, সে সম্প্রদেও তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট।

কোন কোন শিক্ষাবিদের মতে সহজাত প্রবৃত্তির উন্নীতরণই (sublimation) শিক্ষার লক্ষ্য। সহজ কথায় কলা বাহ সহজাত প্রবৃত্তির মোড় ফেরাতে পারাই প্রকৃত শিক্ষকের কাজ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন “কাম সোঁর্গাদি বন্ধন যাবার নয়, তখন সেগুলি মোড় ফিঁরিয়ে ভগবৎমুখী করে নিয়ে দিতে হবে।” উন্নীত করণের এর থেকে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি আর কি হ’তে পারে? জব বোহের সম্বন্ধে শর পদ্মাত, অন্তস্ত সাধারণ লোকের গম্ভ। এই প্রশ্নে স্বামী সত্যানন্দের কথামূলি (শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে) বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলছেন “শিশুদের সব সময় ভাল বোয়াক ধ’রে দিতে হয়। শৃঙ্খলে সে স্বকর মানে হরত তারা বন্ধুতে পারবে না, কিন্তু বড় হ’লে বন্ধুতে পারবে কি শিক্ষা পেয়েছে, তখন

ভাষা শিক্ষার মূল্য দিতে পারবে। আমার Education Theory হচ্ছে তাই। যেখানে যা কিছু সত্য-শিব-সুন্দর, যা কিছু ভাল জিনিষ শিক্ষা পেরেছি, শিশুদের ভ'রে দেবার চেষ্টা করছি।" স্বামীজী আরও বলেছেন, মানুষের মতো ভাল এবং মন্দ দুটো জিনিষ আছে। সাধারণ মানুষের আকর্ষণ কিন্তু মন্দের দিকেই বেশী। এখানে শিক্ষকের কর্তব্য হবে, যা কিছু সত্য-শিব-সুন্দরের প্রকাশ ব'লে, সেই সব ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করা। আর সত্যব্য উপায়েরও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁর 'গলাধরের অ আ ক খ' বইটিতে। যেমন নাকি "অ-এ দলগর আসছে ওড়ে, এর কদলে অ-এ অবতার এল দলে, 'অথবা ক-এ কুকুর, ক-এ খরগোস ইত্যাদির পরিবর্তে" কামারপুকুর গ্রামের কোলে, খুঁসির জোয়ার নিভুই চলে"। শিশু মনকে উজ্জীত করার জন্য তিনি রচনা করেছেন ঠিক এই ধরনের ভাবব্যঞ্জক ছড়া। ক্রিয়াচর্চার সাধে শিশুদের মনে জাগাতে চেষ্টাছেন দিব্যানুবাধ। আগলে গ্রীসতানন্দদেব একজন উচ্চ মার্গের সাধু—তাই সব সময়ে নজর রেখেছেন 'বুড়ি জোয়ার' দিকে। শিশুদের সাথে একাত্ম হ'তে তিনি যে গান গাইতেন সেটাও ঠিক এই একই সুরে বাঁধা—

"গ্রীসামক্ক চরণ-তলে, আমার দেহ আমার মন
কামাহানি সবল বধা, সব করাই সর্বাঙ্গ।"

শিক্ষায়তী সত্যানন্দ রেখে গেছেন তাঁর বিবিধ কর্মকাণ্ডের নিদর্শন—গ্রীসামক্ক আশ্রম, মীরশির আর শিশু বিদ্যালয়। দিয়ে গেছেন তাঁর শিক্ষামূলক বহু প্রবন্ধ এবং অমৃতময় বাণী। রচনা করেছেন তাঁর সত্য-শিব-সুন্দরমুখী শিক্ষার বিনিয়াম। কিন্তু কই আমরা তার কতটুকুই বা গ্রহণ করতে পারলাম? মাকে মাকে ভাবি, আমাদের ভিতরের গ্রাহকগুলি (receptors) কি পুরোপুরি অকাজো? তবে কি 'সার্জেন সাহেবের' কৃপা দিম ভাল হবার আর অন্য উপায় নেই?

—:~:—

দেশপ্রেম ও শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

ঐশাধনাপুরী

ভূটীয় পর্বতার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের দেশপ্রেম ও সত্য রাষ্ট্রের কুসল চিত্রা ও কার্যব্যায়র কথা কিছু কল।

ধর্ম, নৈতিকতা, দেবদ্বানের সম্মান, মাতৃজাতির সম্মান ও পরিব্রতা রক্ষা—এ সবের জন্য নিরন্তর জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করতে দেখেছি শ্রীঠাকুরকে।

শ্রীঠাকুর বরানগর আশ্রম আমার পর শ্রীঠাকুরের মন্ডর ব্যর্কার, গ্রীসমের অপর্ণ লাক্ষা, সহজ সরল উপদেশ বরানগর ওবা কলকাতার অনেক ভক্তকেই ম্হু লোভী প্রমত্তের মত টেনে আনল। বরানগরের ব'ব সমাজ, ছাত্র-সমাজ, স্বাধা প্রতীক্ষানের ছোট বড় ছেলে মেয়েরা সব

বাচ্যাত সুরে কল। অনেকেরই শ্রীঠাকুরকে আপনজনের মত ভালোও লাগল। জীবনে বড় হবার প্রেরণা শ্রীঠাকুরের কাছে তারা প্রায় পেত। তাদের সঙ্গে শ্রীঠাকুর কোন কোন দিন কিছু খেলাহ'লাও করতেন, হাত ভরে প্রসাদ দিতেন। অতি কঠোর তপস্বী জীবনের সঙ্গে শ্রীঠাকুরের সরল শিশুর মত আনন্দপ্রাপ্ত সত্যটি সকলকে ব'ব ম'ব করল।

একদিনে প্রাণব তেরোশো ভিগাম—সম্মান শ্রীঠাকুর পশ্চিমের বারানগর জপ নিবহ হয়ে বসে আছেন। সাতাদিন মৌন আছেন ও নিরম্হ একাশী করেছেন। এমন সময় স্থানীয় ক্লাবের ধুটী ছেলে এসে শ্রীঠাকুরকে জানালো আজ

রাত্রে মঙ্গলমানরা পাড়া জমালিরে সেবে—কলকাতার
বিভাবিকাশ্চন্দ্র কমানাল রাত্রে এখানেও ছাড়িয়ে
যাবে। জুট মিলের বড় সাইনও তাদের পক্ষে। শোনা
যাচ্ছে তারা সমস্ত দশদ্বাদশ মিলের মধ্যে আছে—রাতে
সুযোগ বৃক্স আক্রমণ করবে—সম্ভার কুলনের মেলার
গোলমালের কিছু নুতনা হয়ে গেছে।

সোন ভেঙ্গে শ্রীঠাকুর তাদের সাহস দিলেন ও বললেন,
'তোমরা বড়টা পার একতাবং ভাবে বাধা দেবার জন্য তৈরী
হয়ে নাওগে, আর আমি দেখছি কতটা কি করতে পারি।

যেলে দুটি প্রণাম করে চলে গেলে শ্রীঠাকুর তাঁর রাইকেলে
গুলি ভরে আসনের পাশে রাখলেন ও ছাদে সিঁড়ির মূখে
কাঠ, কেরোসিন, কাগজ ই'ট এসব রাখা বরালেন—আমাদের
বললেন, যদি পাড়া আক্রান্ত হয়, দুর্ভাগ্য এগিরে আসে,
তোমরা ছাসে চলে যাবে।

ত্রিটি সেক্টা আম্মা দ্ব'ভরা 'আল্লাহ' আকবর'
হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে ঘরদোর জমালিতে জমালিতে
এগিয়ে আসতে লাগল—শ্রীঠাকুর তাঁর এক হাজার গুলি
ও রাইকেল নিয়ে বিদ্যুৎ হেলস মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলেন
আগ্রসের গেল পাহাড়া দিতে—সঙ্গে ষাট পাঁচ জন সন্ন্যাসী।
আমরাও পুষ্ক নিশ্চ'শমত ছাসে উঠলুম। তখনকে বতবার
তারা 'আল্লাহ আকবর' বলে হুঙ্কার দেয় শ্রীঠাকুরও
সন্ন্যাসীগণ তলবার 'ফালী কপালী' বলে হুঙ্কার দেন
আর তার সঙ্গে রাইকেল ও গুলিও ওঠে।

আমরা ছাসে থেকে মোঝাই কাছাকাছি সমস্ত বাড়ীর ছাসে
ছাসে ঘোহটা দিয়ে মারেরা বসে—মধ্যে মধ্যে হুঙ্গান করা
যেখ বোকা সেল তারা সকলে স্টাইলাক নর—বাই হোক
শ্রীঠাকুরের কপাল দুর্ভাগ্য আগ্রস থেকে আড়াই মিনিট বত
পল্টুই আর না এসে দিবে সেল। আমরা তো ভোর হতেই
করক দিনের জন্য কাশীপুর চলে গেলুম, শ্রীঠাকুরের পৈতৃক
ভিতর, সেখানের হিন্দু বা ব'ব জোরালো ভাবে তৈরী
দ্বারের মোকাবিলা করার জন্য। গজগোল কিছুটা শান্ত হলে
শ্রীঠাকুর আবার আগ্রসে ফিরে এলেন—পাড়ার বিশিষ্টদের
ও জ্বায়ে ছেলেরের আগ্রসে আহবান করলেন—তাদের
প্রস্তুতি অজাব ও ভীতভার জন্য কিছু ভিন্নকার করলেন

ও একতাবং হয়ে ভাববাতের জন্য তৈরী হতে বললেন,
'সাহসী হতে, বীর হতে বললেন, 'খম' ও মাতৃজাতির পবিত্রতা
রক্ষার জন্য সব রকমে প্রস্তুত হবার জন্য উৎসাহ দিলেন,
প্রেরণা দিলেন। জ্বাম, কেটলু জ্বাম এসব কিনে দিলেন
সংক্রমণ, শিকামূলক গ্রন্থ, জাতীয়তাবোধ জাগার দেই বনে
শক্তি সত্তার করে এমন সব গ্রন্থ কিনে গ্রন্থাগার করার জন্য
এক হাজার টাকা দিলেন। শ্রীঠাকুরের এসব শুভ ইচ্ছা
পুরণের জন্য পিসমহার (শ্রীহামধং বদ্যাপাধ্যায়)
অর্থ নিয়ে এগিরে এলেন। এরপর স্থানীয় স্বাস্থ্য
প্রতিষ্ঠানের বালক বালিকা বৃক্স এদের একতাবং হয়ে
মৌহিক বলবৃদ্ধি মানসিক বলবৃদ্ধির জন্য উৎসাহ ও উপদেশ
দিলেন। আশ্র-ই তাদের মাঝে মাঝে এনে লাঠি, ছোরা
খোলা, নুতানীত, আবুস্তি অনুষ্ঠান করার সুযোগ দিতে
লাগলেন। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানটির নাম দিলেন 'অভেদানন্দ
স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান।'

ঐ একদিনে প্রাক্ষ শ্রীঠাকুর হিন্দী ভাষায় একটি জাতীয়
সম্মতি লেখেন। আলমবাজার ও বরানগরে রাস্তার পরিবৃত্তি
কিছুটা শান্ত হলে ঐ গানধানিতে শ্রীঠাকুরের প্রেরণা ও
নিষেধনার অর্চনার দূর দিলেন, আমরা সেটি শ্রদ্ধে
নিলুম। অভেদানন্দ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ছেলেরদের
লেখানো হল—আমরা এখন সম্মত ভাবে গানটি গেয়ে
চললুম তখন সেই নতুন কোনো জ্বামটি শ্রীঠাকুর বাকিয়ে
কললেন—শ্রীঠাকুরের শ্রীআসের তখনকার সেই জেজোদীপ্র
হুঙ্গ না দেখলে বোকা যায় না—সে হুঙ্গের বর্ণনার ভাষা
হয়ে যায় অক্ষম। আমরা সকলেই শ্রীঠাকুরের শ্রীকল
নিমিত্ত শক্তিতে বহুতে অভিত্ত হয়ে গেলুম। সোঁদনের
সেই হিন্দী জাতীয় সম্মতিটি হচ্ছে—

হিন্দু হিন্দু মেয়ে হিন্দুস্থান

মেয়ে লাগ আসমান

মেয়ে হিন্দুথক লাহানু। ইত্যাদি ●

(১২৫৩, ৩২ম প্রাক্ষ)

জায়েনমাজ বৃক্সমাজকে এইভাবে সংবদ্ধ করা, শক্তিমান
হতে প্রেরণা দেওয়া এদের ফল অতি অস্বাভাবিক ভাবেই ফলে
ছিল সে কথা পরে কব।

দেশমাতৃকার পরাবীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য, স্বাধীনতা লাভের আশোল্লসে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর কারাগার, শত শত শব্দীসের হাসিমুখে বৃত্তাবরণ এ স্বেদ ঘল ফলল—ঊনিশশৃষা সাত্তাইল্লসের পুনরই আশুট। সেই চিরঅবিস্মরণীয় দিনে ভারতবর্ষ' স্বাধীন হল—মারা ভারত জুড়ে—সমস্ত দেশবাসীর হৃদয়ে সে কি উন্মাদনা—সে কি আনন্দ জরজ—সৌন্দর্য সে সব কথা সবাই জানে—আমাদের আশ্রমেও জেগেছিল আনন্দের সাক্ষা। কিসাতী মতে ক্রোশই আশুট রাতি বারোটার পরই ঘোষিত হল—ভারত, স্বাধীনতাসন লাভ করল। হিন্দুশরী করল থেকে দেশমাতৃকা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করল। ঐষ্টাকুর তখন সিউড়ী আশ্রমে—ক্রোশই আশুট রাতি বারোটার পর সিউড়ী নগরীর প্রতিষ্ঠা পুঙ্ হতেই মল লম্ব বেছে উঠল। আমরা সমবেতভাবে মাইক্রোফোন ঘোষে ডি এল রায়ের লেখা, কবি নকরুলের লেখা, রবীন্দ্রনাথের জাতীয়সঙ্গীত পাইলায়, অর্জনাবি 'দেশমাতরম' সঙ্গীতটি গাইল। এরপর আমরা ঐষ্টাকুরের লেখা 'হিন্দু হিন্দু মেয়ে হিন্দুস্থান' গানটি গাইলুম সকলে মিলে। আর গাইলুম ঐষ্টাকুরের লেখা দেশোদ্ধাবক সঙ্গীত—

‘জর ভারত জর দেশমাতা

জর সব বন্ধন চাড়া’ ইত্যাদি

আমরা যখন ঐষ্টাকুর ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের লেখা দেশোদ্ধাবক সঙ্গীত শ্রোত চলেছি তখন ঐষ্টাকুর সেখানে বস—একটি সঙ্গীত চুলা করলেন—

‘আজি শুভ দিনে

লহ লহ বীণে

গাহ মঙ্গল গান’। ইত্যাদি

সঙ্গীত চুলা শেষে ঐষ্টাকুর সেটি পুড়ে শোনানেন ও অর্জনাবিকে তখনই সেটি সুর দিয়ে গাইতে করলেন। অর্জনাবিক সেটিতে কিছুক্ষণের খুদা সুরোত্তাপ করে গাইল। সেদিন সারা রাতি আনন্দের শিহরণে আমরা কেউ ঘুমোলুম না। পুনরোই আশুটের সেই উদানদ্বার চিহ্নত পূর্ণ-লিন্ধের দিকে সরে ঐষ্টাকুর প্রদায় জ্ঞানালেন সেই স্বাধীনতার বাস্তববাহী সৌভাগ্য রবিকর।

ঐ বছর বীরভূম জেলার সমস্ত বোয়ানিকতন থেকে জাতীয়সঙ্গীত গেরে ছাত্র-ছাত্রী দল ব্যাণ্ড ব্যাকপাই ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্রের সঙ্গে মার্চ করে সুর পর্যটনমা করল।

ঐষ্টাকুর প্রতিষ্ঠিত সিউড়ী ঐষ্টাকুরক বিদ্যাপট্টের জেল-মেরেয়া ও ঐষ্টাকুরের ভগ্ন বাড়ীর জেলমেয়েরা ঐষ্টাকুর রচিত ও সুরসম্বোধিত ‘হিন্দু হিন্দু মেয়ে হিন্দুস্থান’ সঙ্গীতটি গাইতে গাইতে ব্যাণ্ড ব্যাকপাই বাসোর সঙ্গে মার্চ করে নগর পর্যটনমা করল। সমস্ত জেলমেয়েরের জন্য একসকল পোষাকের ব্যবস্থা ঐষ্টাকুর করেছিলেন—অনেকের জামা পরগামিই তৈরী করে দিরাইছিল আর ঐষ্টাকুরের বিশেষ ইচ্ছার সূচনাবি বাটিকের কাজ করে আশ্রমের প্রতীক চিহ্নিত শত শত কড় রুমাল করে দিরাইছিল—ঐ রুমালগুলি টাই বাঁধার মত করে গলার ল্যাংঘর সকলে বোঁদেইছিল—যেথক ভাল লাগাইছিল বেখতর। ঐষ্টাকুরের নামাশ্রিত বিদ্যাপট্টের ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ ঐষ্টাকুরের রচিত জাতীয়সঙ্গীতটিই সকলের বেশী ভাল শ্রেগেছিল।

ভারত স্বাধীন হওয়ার ঐষ্টাকুরের খুব আনন্দ হইছিল—দিকে দিকে তখন স্বাধীনতার আনন্দে সভা-সমিতি হাইছিল—আমরা সেই রকম একটি সভায় স্বাধীনতা অনুষ্ঠানে বোলা দিতে গিতাইছিলুম। আখি, মারা, মূক, মহামারা, বন্দনা, অত্রোনা ও পূর্ণলকী এরা ঐষ্টাকুর রচিত ঐ ‘হিন্দু হিন্দু মেয়ে হিন্দুস্থান’ সঙ্গীত সমবেতভাবে গাঁড়ির গেরেইছিলুম আর ঐষ্টাকুরের লেখা আর একটি দেশোদ্ধাবক সঙ্গীতের সঙ্গে আমরা নেতাইছিলুম—

কব হিন্দকে হিন্দোল

জগদগা

জগত গোশনী

হোশ জা—ইত্যাদি

সহযোগী সকলেই ঐ সঙ্গীত গুটি ও সমবেত নৃত্য খুব ভাল শ্রেগেইছিল।

ঊনিশশৃষা আর্টচাট্রিশ বৃন্দোশে আবার কমুনাল রায়েট জেগে গেল সমস্ত দেশ জুড়ে—বিশ্বের হয়ে কলকাতা জুড়ে বিদ্যাবিকার ছাড়া নেমে এসে—যেথক সখ্যক লোকও মারা

পড়তে লাগল। উনিশশো খেচালেশের রায়টের কথা আগে
কলাই—তখন হিন্দু বা ভীষণভাবে কঠিন হলেছিল—
কিন্তু তারপর খ্রীষ্টাব্দের শতাব্দীতে উদ্ভূত হয়ে সমস্ত হিন্দু
এবারে বলক হয়ে বাবা দেবার জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি।
এই রায়ট লাগার প্রায় মাস দেড় দুই আগে খ্রীষ্টাব্দে নিজের
ভেতর থেকে একটি বাণী পান—এবার মৃত্যু বিনাশ হবে
গলাতাই—খ্রীষ্টাব্দে তখন সিউড়িতে—এখনা কিছু তাড়া-
তাড়িই খ্রীষ্টাব্দে বয়ানগর চলে আসেন। বাইহোক উনিশশো
আটাল্লেশের এক সাধারণ বন্ধন রায়টের বিভাবিকা বয়ানগরে
ভাবমুখ্যে ছাড়িয়ে পড়ল তখন বয়ানগরবাসী মারেরা বানার
আশ্রয় চাইল দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বাঁচবার জন্য কিন্তু
বানার দুর্ভাগ্যও বোধী ছিল না—অতঃপর লোকের
সম্মুখীন হয়ে না ইত্যাদি অজ্ঞাত সৈন্যের দুর্ভাগ্য
প্রকাশ করল—তখন অর্জনানন্দ শ্যামা প্রতিষ্ঠানের ছেলেরা
এসে খ্রীষ্টাব্দে জানালে খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা, বৃন্দ, নারী ও
লিঙ্গদের আসতে বলা আশ্রমে, আর পরে সর্বত্র ছেলেরা
তোমরা সব নিজের নিজের বাড়ী ও রাজ্য পাহারা দাও।’

সম্মা হতেই ছোট ছোট বাগ, ছোট এ্যাটচী কেন বা
ছোট পুটলী হাতে করে টাকাকড়ি সোনাচানা হার বা
মূল্যবান জিনিস নিয়ে অসংখ্য মারেরা, বালক, বালিকা,
শিশু ও বৃদ্ধগণ আসতে লাগলেন—আশ্রমের সমস্ত
বাগান, উঠান, বাগান, রাজ্য ভরে উঠল শরণার্থীর ভীড়
—খ্রীষ্টাব্দের তারাইকেল ও হাজার বয়েসের বালি নিয়ে
পড়িয়ে রইলেন যে পাহারার আর সঙ্গে রইলেন তাঁর ভাণ্ডারী
সম্মানবল। এবার খ্রীষ্টাব্দের কুপার ও প্রেরণায় কানগর-
বাসী বেশ তৈরি হ্যাঁও বম্, মশাল, বন্দুক, পেটল এবং
নিয়ে পাঠা আক্রমণ বিশেষভাবে প্রস্তুত। কতবার দুর্ভ-
দুর্ভাগ্য থেকে আল্লাহ আকসর প্রতিধ্বনি ভেসে আসে—সমস্ত
কড় কড় রক্তের হিন্দু, ভগবদের সান্নিধ্যিত কঠোর কতবারই
পাঠা জ্বাবে ‘কলমাত্তম্’ লখনটি বেশ গুরুত্ব সঙ্গেই
ধনিত হতে থাকে আর কলক ও গুরুত্ব উঠে মাঝে মাঝে।
খ্রীষ্টাব্দে ও সাধুদের কঠোর ‘কালী কপালী’ ধনিত আশ্রম-
কৃত্রিম মাঝে মাঝে কঠোর উঠতে লাগল।

আর এদিক আশ্রমের আশ্রমের মধ্যে বাবা আশ্রম

নিরেছেন তাঁদের কেউ কাঁদে, ‘মা আমার ছেলের কত শিশু
পেরেছে, কেউ বলে, মা তাড়াতাড়ি কেঁকা বারাই আইসি,—
তৈরি রাজ্য খাওন বার নাই, মা নাতিনাতিনর কথা কুক
লাগলেন’ ইত্যাদি ইত্যাদি। বাইহোক আমরা আশ্রমিক
মারেরা ও মারেরা অত দুর্ভাগ্যের মাঝেও দুটি, গুড়,
জরকারী, দুর্ভ, চিড়ে, পাউরুটি, কিস্কুট যেমন যেমন
পারলুম আশ্রম-মুখে দিতে লাগলাম। আশ্রমবাহ্যারে
বাড়ীদুর্ভাগ্যে আগুন ধরালো দুর্ভাগ্য—সেই আগুনের
শেষাংশে শিখার আশ্রম আশ্রমের হার যেন কাঁদতে লাগল।
আর তার সঙ্গে অজ্ঞাতার পাঁড়িত জনগণের বৃদ্ধ ফাটা
আশ্রম-মুখে মন বিধা ভাড়াভাড়া হয়ে উঠল। সেই বড় কড়
আগুনের তুলকাঁ আশ্রমের পরাণ উড়ে এসে পড়তে লাগল
হাওয়ার ব্যাকার। তবে বয়ানগর এলাকার পা দিতে
দুর্ভাগ্যের আর সাহস হল না। বাইহোক খ্রীষ্টাব্দের কুপার
দুর্ভাগ্য সেই যে পেছা হটল—সে আজও হটলো—কালও
হটলো। অনেক তো চিরদিনের মত হিন্দুস্থান ছেড়ে
পালিয়ে বাঁচল। ভোর হতেই শরণার্থীরা নিজের নিজের
বাসস্থানে ফিরে গেল। যারা রায়টের স র ছায়ে লুকিয়ে
বসেছিল এবারে রায়টে তারা পাঠা জ্বাবে পুত্রো বন্দুর
তৈরি সেখে দুর্ভাগ্য পিছা হতে বাধ্য হল। কিন্তু এর
পেছনে খ্রীষ্টাব্দেরই উৎসাহমান; প্রেরণায় ও শান্তিনানেই
তা এত তাড়াতাড়ি সচিব হল।

উনিশশো বাট খৃষ্টাব্দে জুলাই মাস থেকে দুর্ভাগ্য
সম্মা বাপী আসামে বাঙ্গালীদের ওপর অসংখ্য অজ্ঞাতের
খ্রীষ্টাব্দের মন খুব বাঁধতে হয়ে উঠল। আসামে বাঙ্গালী
জাতির ওপর নৃশংস অজ্ঞাতের কঠোর চলল মানব দরবা
খ্রীষ্টাব্দের প্রেমময় প্রদায় এই সংবাদে দুর্ভাগ্যের বেদনার
ভরস সৃষ্টি হল। এখন এসময় প্রতিদিনই নিজে উপস্থিত
থেকে সঙ্গকে কল্যাণ প্রার্থনা করাতেন ও বলতেন,
‘এস আমরা সান্নিধ্যভাবে তাদের কল্যাণ প্রার্থনা করি।
সাধুদের তো ঠাকুরকে জাকা হাড়া আর উপার নেই।’
প্রার্থনা শেষে প্রতিদিন ঐতিহাসিক নিজে ও বলতেন,
‘আমরা নিজেদের কিছু পোড়ালে তাদের দুর্ভাগ্য কিছু
কমে ইত্যাদি।

শ্রীঠাকুরের এই প্রার্থনা কখনো যখন ফলপ্রসূ হইয়াছিল—
—শ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে কোন ব্যক্তি কলকাতা ও আশপাশ
জল থেকে বহু পরিমাণে স্নেহের নিচে গিয়ে পাল্টা
আত্মক চালায়ে আঁচিয়েই হৈসে। অতঃপর যখন করেন।
শ্রীঠাকুরের সেই কীর্তি মনের স্নেহপ্রসার 'ভাইব্রহ্মান'
এখনিকাবেই অপরাধের মনকেও অভিভূত করত।

সেই দেশ স্বাধীন হওয়ার সুখ থেকেই প্রতিবন্ধক পনেরই
আগন্ত শ্রীঠাকুর নিজে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতেন
তাপসার্থী, জাতীয়স্বপ্নীত গাওরা এসবই অনুভবিত হত।
শ্রীঠাকুর এই অনুভবনে ছাত্রের উপস্থিতি দেশ স্বাধীন হওয়ার
পূর্ণাঙ্গের কথা কিছু বলতেন, বারি শহীদ হইলে মৃত্যুবরণ
করত, বারি দেশের মানবের উন্নতির জন্য, পৃথক পৃথক
করার জন্য অনেক কিছু করেছেন তাঁদের কথাও বলতেন,
শ্রীঠাকুর বালক-বালিকাদের স্নেহপ্রতিমক হবার জন্য,
জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য সব ও দিয়া হবার জন্য
সম্পদ প্রেরণা দিতেন। বলতেন, 'তোমরা স্বাধীন দেশের
ছাত্রের— তোমাদের ওপর অনেক দায়িত্ব দেশের
উন্নতি ও স্বাধীনতা ওকার। তোমরা সব হও, পণ্ডিত হও,
জীবনে উন্নতি কর, সাহসী হও, পড়াশুনা পড়িয়ে করে
বাও—নিজের পায়ে দাঁড়াও—দেশ মাতৃকর মুখ উন্মল

কর! পড়াশুনা না করলে জীবনে উন্নতি হয় না।
বেশে। অতঃপর বাক্য প্রবর্তন। বহু বড় বড় দেশনেতা নেতাজী,
গান্ধীজী, বামজাহান, বাসাবহারী, চিত্তরঞ্জন, শ্রীঅরবিন্দ
এ'রা সকলেই বাক্য পড়াশুনা করে তবে দেশের কাজে
নেতাজী। তোমরাও তেমনি সব দিক দিয়েই নিজেকে
যোগ্য করে তোলে। দেশের ভবিষ্যতের শ্রুতি অশ্রুতি সব
নির্ভর করছে তোমাদের যোগ্যতার ওপর।' এইভাবে
শ্রীঠাকুর শ্রুতি-বলেনের ছাত্রদের কত যে কথা বলতেন—
ছাত্রেরা সব ক্ষণ-মুহুর্তের মত শুনতো শ্রীঠাকুরের সেই জাতীয়
চৈতন্য জ্ঞানো প্রেমাবাণী। সব শেষে শ্রীঠাকুর
বলতেন—'শ্রীঠাকুর তোমাদের কল্যাণ করুন। তোমরা
ভক্ত ছেলে হবে—দার আমার শুন শুন তোমরা
জিনবার বল :

শ্রীঠাকুর—আমরা জীবনে বড় হব।

ছেলেরা—আমরা জীবনে বড় হব।

শ্রীঠাকুর—আমরা জীবনে বড় হব।

সকলে—আমরা জীবনে বড় হব।

শ্রীঠাকুর—আমরা জীবনে বড় হব।

সকলে—আমরা জীবনে বড় হব।

(ক্রমশঃ)

— ১০ —

তপো ব্রহ্ম

স্বামী শিবানন্দ

আমরা তৈত্তিরিয়াপনিষদের একটি মন্ত্র দেখিত পাই, "কৃষ্ণে বায়ুর্গিঃ । কৃষ্ণে পিতরম্পসনঃ । অর্থাৎ
ভস্মে ব্রহ্মত্ব । তৎ হোবাচ । তপস্য ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাস্থ । তপো ব্রহ্মত্ব ।" জৈ ডা ৩।১২

কৃষ্ণপত্র কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণের সমীপে বাইরা বলিলেন, "ভগবন্ ! আমাকে ব্রহ্ম সম্পর্কে শিক্ষা দিও । তিনি
তাহাকে বলিলেন—তপস্য। বারি ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা কর । তপস্যাই ব্রহ্ম ।

তপস্য। ব্রহ্মের ভার্য—ধর্মিত, তপস্যার ফলেই কামিন ব্রহ্মের লাভ করিয়া থাকেন । বিশ্বব্রহ্মত্ব সৃষ্টির মূলেও
গ্রহীত্বের তপ্য শক্তি । তপস্যার ফলে সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশ সব কার্যই সম্পন্ন হইয়া থাকে । ব্রহ্মত্ব সৃষ্টি করিতে
দ্বিতীয় স্বরূপ ব্রহ্ম। তপস্যানিহিত হইয়াছিলেন । সৃষ্টির মূল রহস্য এই তপস্যাত্মক বা তপস্য। কামিন কামিনী

কটিরের ব্রাহ্মণ লাভ তপস্যারই শক্তি। জপোৎসব বাষ্ঠীত মনুবাণ, মেঘব, ইন্দ্রব, ব্রহ্মব কিছুই লাভ হয় না। জাগতিক এবং পারমাণবিক অতীতের বিনা তপস্যায় হয় না। যেখানেই অতীত সেখানেই জপোৎসব।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একটিমাত্র উপদেশ—“তপসা ব্রহ্ম বিজ্ঞানাসম্ভব”। ব্রহ্মজ্ঞানী বরুণ পুত্র কৃষ্ণকে তপস্যায় ভিত্তর দিয়াই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপদেশ দিলেন। তপস্যা করিয়া কৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে অম্ব, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান এবং আনন্দই যে ব্রহ্ম—অম্বের অম্বের সেই অবিকল্প অনুভূতি লাভ করিলেন। তপস্যামধ্য জ্ঞানে কৃষ্ণ পূর্ণ শান্তি এবং পরিতৃপ্ত লাভ করিলেন।

তপস্যাধিকৃত জ্ঞানলাভে মানুষ নিঃসংশয় হয় ও আত্মিক শক্তি লাভ করে। অন্য কোন জ্ঞানে মানুষ তেমন নিঃসংশয় ও শক্তি লাভ করতে সক্ষম হয় না। সেজন্য চাই তপস্যা। সাধকমাত্রেরই অম্বের তপস্যার অগ্নি সর্বত্র প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে। বস্তু ও তপস্যার তাপে চিত্র মল বিদূষিত হয় তখন সাধকচিত্র নিষ্কলুষ হয় ও ব্রহ্মজ্ঞান আত্মনি আসিয়া অম্বেরক অধিকার করিয়া বসে।

মুন্ডকোপনিষদে আছে—‘তপসা চীকিতে ব্রহ্ম’। তপস্যা ব্যাধাই ব্রহ্ম বড় হইলেন, উপচিত হইলেন। তপস্যা অগ্নিগ্ন শক্তি প্রসূতি। ব্রহ্ম বস্তু তপস্যানিরত হইলেন, তখনই শক্তির আত্মকোষে তিনি সৃষ্টিকার্যের দরুন উন্মুখ হইয়া উঠিলেন। কাজেই জগৎ আর কিছুই নয়—ব্রহ্মেরই উপচিত শক্তির মূল বিকাশ মাত্র।

ব্যাপ্তির মূল কেন্দ্রই হইল তপস্যা। তপস্যা ব্যাধা মানুষের অনবদ্য শক্তি আনন্দ হয়। এই কথাটি সর্বদা মনে রাখা দরকার, বড় হইতে হইলে ভেতরে তাপ সঞ্চার করিতে হইবে। সেই তাপ ব্যাধাই, তপস্যার ব্যাধাই জীবনের ব্যাপ্তি (Expansion) ঘটে। ভিতরে তাপ সঞ্চার হইলেই বড় হইবার উপদ্র বাদনা দেবা দেয়। বৃদ্ধব বড় হইয়া ছিলেন অম্বের অসহা জ্ঞানায় বা তাপে, গোদার মহাপ্রভুর জীবনও এই তাপ শক্তির প্রভাবেরই ব্যাপ্তির হইয়াছিল, আর এই তাপ সঞ্চার হইয়াছিল পরমহংস ব্রাহ্মকৃষ্ণের বৃদ্ধে তাহার মূলে তাহার জগৎজননকে লাভ।

তপস্যাই শক্তিসঞ্চারের অম্বের অম্ব উপ। মানুষ যে মানুষকে স্পর্শ ব্যাধা জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়া দেয়, তাহার মূলেও রহিতছে এই তাপ—শক্তি অনুভূতির উদ্ভাপ। এই তাপে সাধাবোই মহাপ্রভুর সাধারণ মানুষের জীবনের ব্যাপ্তির ঘটাইয়াছেন।

জগতের মূলে আনন্দ যেমন সত্য, তেমন তপস্যা, তাপ বা দৃষ্ণও সত্য। এই তাপই আনন্দে রূপান্তরিত হয়। তখন দৃষ্ণের ভেতরে শক্তির অবধি থাকে না। আনন্দ আর কিছুই নয়—দৃষ্ণেরই রূপান্তর। দৃষ্ণই সত্য। আঘাত পেরেই মানুষ পরমের বিকে ফিরিয়াছে।

সৃষ্টিকর্তার মন অন্তর্দৃষ্টি না হইলে সৃষ্টি হয় না। এইজন্যই ব্রহ্ম জনসংস্টি করিতে গিয়া নিজের ধ্যানে ভূবিদ্যা গিয়াছিলেন। সৃষ্টি আগে নয় নিজের মন, তাহার পর তাহার রূপ কুটীরা উঠে বাহিরে। রূপ-সৃষ্টির আসল কেন্দ্রই হইল নিজের অন্তর। প্রত্যমাগেই ধ্যানে শুদ্ধ। সমাহিত হইতে না পারিলে শক্তি সঞ্চার হয় না, আর শক্তিসঞ্চার না হইলে উপচিত-শক্তির জন্ম হইবে কোথা হইতে?

নিজে পূর্ণ হইতে পারিলে শক্তি আপনি উপচিত হইবে। আর পূর্ণ হইবার একমাত্র উপায় তপস্যা। মানুষের অন্তরস্থ শক্তির ভাঙার তাহার ভিতরেই রহিয়াছে। সেই আত্মিক শক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে নিরলস তপস্যার ব্যাধা।

গ্রীক শাস্ত্রী সত্যানন্দমন্ডে একরূপ একজন ইন্দ্র-জ্ঞানিত মহাপ্রভুর বাহিরে সন্মত জীবনব্যাপী মহাসাধনায় দেবা যায় যে, বর্তমান ভোগ্যমন্ড পৃথিবীতে মহাকোলাহলম্বের নগরীর ও শহরের বৃদ্ধে সমাজ-সংসারের মধ্যে থাকিয়া অবালা অসাধ্য সাধনায় নিম্ন এক মহাজ্ঞানী মন ভোগ্যমন্ডী প্রকৃতির এক নিম্ন প্রতিক্রিয়ায় বহুপ। বাহিরে সন্মত

জীবনে যথারত্নরূপ ছিল এই ভগবতী। সর্ববিদ্যতে এই ভগবতীকে অংলম্বন করিয়া জীবনের পরমসত্যকে জানিবার জন্য অতঃপূঃ হইয়া চলিয়াছেন এই মহাযোগী—যেন উপনিষদবর্ণিত তপোব্রহ্মের মূর্তি কিংহু হইয়া।

ভগব্যা যেন তাঁহার জীবনের সর্ববিস্তারিত অঙ্গাঙ্গিভাবে মূর্তি। বাল্যকালে তাঁহাকে আকাশের দিকে তাকিলে ভাবলু হইয়া পড়িতে দেখা যায়। সন্ধ্যার সন্ধ্যা গান গান বেলায় তাঁহাকে আসনে বসিয়া গানে মগ্ন থাকিতে দেখা যায়। আবার ছাত্র জীবনের মূর্তি, হইতেই তিনি শংকরে থাকিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য রত সাধনার রত হন। ছাত্রের উপর ছিলেকাতার একাকী থাকিয়া সর্বদা ধ্যান-ধারণা ও পড়াশুনার মগ্ন থাকিতেন। মধ্যাহ্নে আহ্নার, বেশভূষা অতিসাধারণ, পারে কিছু পরিচয় কিরণ। সংসারের প্রাচুর্যের মধ্যে থাকিয়াও সমস্তকে তানিত্রাজানে তুলু করিয়া সदा-সর্বদা নিজের ভিতরে তুণ দিবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ দেখা যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার সময়ে মোটর গাড়ী থাকা মত্রেও তিনি বাসা হইতে সাইকেলে আরোহণ করিয়া ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে চলিয়াছেন—অনেকদিন বিপলও ঘটনায়ে—কেন মূৰ্খের নাই সৌন্দর্য, ধারভাষা কলিভা-এ গাড়াইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া জপব্রহ্ম হইয়া ছায়ে, বৎসরা কত যাব্যত সৃষ্টি করিয়াছে—কেন খেলাগ নাই তাঁহার, ক্রমে যা ভক্তভাবের গানে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। নোট নিতে নিতে হাত হইতে বাতা পেন্সিল নীচে পড়িয়া গিয়াছে। বেহ'ম অবস্থা তাঁহার। হিমালয় পাহাড় দিবার আকাশকা মন হওয়ার হিমালয়ের শীত ও গ্রীষ্মাধিকার প্রখরতার কিংহু মীর জীবনে বাতুল করিবার জন্য পৌষ মাঘ মাসের শীতের রাতে ভিজে কাপড় ছায়ে জপ গানে মগ্ন হন আবার ট্রে বৈশাখ মাসে খুব গরমে ছায়ে ভোট কমল মূর্তি গিয়া সাধনার রত হন। গুরুকরণের পূর্ব পর্বান্ত তিনি তাঁহার জন্ম-জন্মান্তরের দিব্যভগবত পুঙ্খভূত সন্ধ্যার নিরা সাধনে পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইহার পর তাঁহার জীবনের একমুহুরে মূর্তি আনুষ্ঠানিক ভাবে গুরুকরণের মাধ্যমে দীক্ষা কাৰ্য সম্পন্ন হয়। শাস্ত্রের মধ্যা দিচ্ছে 'ত' আধিকারিকগুরুকের মূর্তি আগমন। সাধনার আরো গভীরে তুণ দিবার জন্য এখন হইতে এক অভ্যাস জালা শব্দ, হয় তাঁহার জীবনে। এই জালাই 'ত' দেখা গিয়াছে বৃদ্ধদের জীবনে, মহাপ্রজ্ঞ জীবনে, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জীবনে আর স্বামীজীর জীবনে। শ্রীমদ্ভগবতের নির্দেশ জীয়া বীরভূমি নিউজীর জলাকাশ' পুত্রাংন পৈতৃক বাটীতে একাকী রহনিকৃত হইয়া জগজ্জননৈক পাওয়ার জন্য তিনি জীবন মগ্ন সাধনার রত হন। তাঁহার ইচ্ছাযেতা শ্রীশ্রীভাকুর পদভংগদেবের জীবনের সেই জালামহী উৎকর্ষা, কীরের সেই অশ্বা জালা, মিলনের সেই আনন্দ মাধ্য'লাভের আভ্যন্তিক আবৃত্তি নিরা তিনি দীর্ঘ ১৫ বৎসরকাল অতঃপ সাধনার মগ্ন ছিলেন। জগজ্জননীর কুপার তাঁহার দর্শন লাভে অমৃতারিত হয় এ মহাজীবন। মহাজীবন কেন? ভোগসম্বন্ধ পৃথিবীর কৃষ্ণ এক নিঃশল নিঃশব্দ অনববা ভগবতের অতঃপ মহাযোগী যে তিনি। দীর্ঘকাল নিরালার নিম্বনে কঠোর তপস্যার মগ্ন থাকার জন্য তিনি লোকচকুর অগ্রগালে ছিলেন। কথার কল তুল তুলিতে প্রমত্ত আপনি আসে, এখন তাঁহার প্রকট অবস্থা। দেখা যায় চারিধার হইতে জন্তরা তাঁহার কাছে ভিত্তি বহিতে লাগিল। তিনিও সত্যসম্বাদ ভগবতপ্রসন্ন করিয়া তাহাদের মনে আনন্দ ও উৎসাহ বহনের জন্য চেষ্টা হইলেন। এখানে একটা ঘটনা উল্লেখ করি যে আশ্রমের সত্যাসনদের অনেকেই তাহাদের ছোট কোলায়েই গ্রীষ্ম শ্রমাদী সত্যানন্দদেবের খেলার মাঝী ছিলেন এবং তাঁহার দিবা সপ্ণেশ' তাঁদের অনেকেই পদব্রজীকালে আশ্রমের সাধু হইয়া গিয়াছেন। আমরা শাস্ত্র পড়িয়াছি পরমহংসেরা বালক-ভান আশ্রমের জন্য কতকটা বালক সঙ্গ রাখেন কিন্তু একেঙ্গে দেখা যায় বালকরাই মত্রেই তাঁহার খেলার মাঝী।

ব্রহ্ম বহন তপস্যার মগ্ন থাকেন তখন 'ত' তাঁহার সৃষ্টি কাৰ্য সম্পন্ন নহে কিন্তু বহন সৃষ্টির জন্য উদ্ভব হন তখন হয় বিশ্বসৃষ্টি। গ্রীষ্ম শ্রমাদী সত্যানন্দদেবের ক্ষেত্রেও দেখা যায় কঠোর তপস্যারলে আভ্যন্তিক শক্তির ঐশ্বর্য পূর্ব হইয়াছেন তিনি। তিনি যে বিশ্ব কোটী, তাই জগৎ উচ্চায়ের রতে রতী হন তিনি স্বেচ্ছায়। তাই তাঁহার সৃষ্টি

কার্যে দেয়া যায় চারিবারে গ্রীষ্মমণ্ডল আশ্রয় স্থাপনের মাধ্যমে আপামর জনসাধারণের ভিতর গ্রীষ্মমণ্ডল স্থানান্তরে দীক্ষাদান, মানব নির্মাণ, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন—শুশ্রূষা, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি। দিবা সাহিত্য সম্প্রদায় রচনা। নিজে পূর্ণ হইয়াই তাহার উপচিত শক্তিতেই এদবই সম্ভব হইয়াছে। শান্তে আমরা শুধু ও প্রশংসিত বলা পড়ি। রাখামে তাহার কিছু অভাব পাই অগ্নির তপশ্বিত্ব জীবন্ত বিগ্রহ গ্রীষ্ম শ্রমী সত্যানন্দদেবকে দেখিয়া। সেইদিক দিয়া আমরা ভাগ্যবান।

অধ্যাত্মপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাতার তপস্বিত্বের ফল।

ধর্মগুরু বা আচার্য্যগণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই আত্মব্যাক্তি ঘটা ইচ্ছা করেন। ব্যাপ্তির মূলে রহিয়াছে সৎকর্ম বা তপস্যা। ব্যক্তি জীবনের উন্নতি যেমন তপস্যার উপর নির্ভরশীল, তেমন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের পরমার্হেও নির্ভর করে এই তপস্বিত্বের উপর। প্রতিষ্ঠাতার আদর্শ ফুলিয়া গিয়া যখন মানুষ লোভী উন্মত্ত হইয়া পড়ে, তখনই প্রতিষ্ঠানের অবনতি ঘটে। ধর্মপ্রতিষ্ঠানের গ্রানি উপস্থিত হইলে ত্যাগ-তপস্যা সর্বোচ্চ অভাবে। মানুষ যখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নিরমল্য হইতে পরিভাগ করিয়া ভোগপথেই প্রেরণা বিন্ধা মনে করে, তখনই অসম্মত হইয়া তাহার অংশগতন। বৃত্তাঙ্গোপসংস্কৃত হইয়া ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষ যখন লক্ষ্য পথে অগ্রসর হয়, উন্নতি তখন অনিবার্য। অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী এবং উন্নতি নির্ভর করে ত্যাগ তপস্যা সংকল্পের উপর। আদর্শভ্রষ্ট মানুষ দ্বারা কখনই আত্মোন্নতি বা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সম্ভব নহে। ভূমিকম্পে যেমন বড় বড় ইमारত ধসিয়া পড়ে, তেমন বড় বড় ধর্ম প্রতিষ্ঠানও ত্যাগ-তপস্যা সর্বোপহীন হইয়া অংশগতনের দিকে দ্রুত ধাবিত হয়। রোগ প্রতিভারের একমাত্র উপায় অব্যাহতির উচ্ছেদ। পরিশেষে আমরা গ্রীষ্ম শ্রমী সত্যানন্দদেবের একটি বাণী যাহা সাধু জীবনের পক্ষে বিশেষ কল্যাণপ্রদ—তাহা স্মরণ করি। তিনি বলিয়াছেন, “ভগবৎ নির্ভরতা ও তপস্যা সাধু জীবনের একমাত্র সম্পদ।”

স্বাধীন জীবনে ভগবান ছাড়া দ্বিতীয় আর কেহ নাই। সম্মিলিতভাবে ভগবানের উপর অটল অটল বিশ্বাস করিয়া তাহারে চর্চিতে হইবে। উপরে ভগবান নীচে সাধু ইহার মাকলানে তাহার তপস্বিত্ব বিরাজ করিবে। তাহার তপস্বিত্বের ভগবান তাহার কাছে সদা সাধু হইয়া থাকিবে। যেমন গ্রীষ্মমণ্ডলধেব বলিয়াছেন—বিশ্বাস কর, নির্ভর কর মা কালীই সব করিবেন, তোমার কিছুই করিতে হইবে না। ভগবান আমেনই আমেন এ বিশ্বাস নিরায় সাধুদের সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইবে তবেই প্রেমোলাভ হইবে, নচেৎ সমস্তই মহতী কিস্তি। আর সমস্ত প্রকম বাধা দিয়া তুচ্ছ করিয়া অটুট সংকল্পস্থল সাধন পথে চলিতে হইবে। তবেই মূলভ মানবজন্ম সার্থক হইবে তাহার কৃপায়।

“আত্মার আকর্ষণী শক্তি, Magnetic force আছে। এই আকর্ষণী শক্তি সহায়ের মনের মধ্যে ঠাকুরকে আকর্ষণ করার সাধনা রাখতে হবে। আর হরি বিমুখ বা বাসনা বুদ্ধিকারী যা কিছু মনের বিকর্ষণী শক্তি সহায়ের দূর করার চেষ্টা করতে হবে।”

—স্বামী সত্যানন্দদেব

শ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার

ঐশ্বর্যাপুরী

আমাদের ঠাকুর শ্রীসত্যানন্দদেবের চুলতলে বহু বিচিত্র ধরনের জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হয়েছিল। এদের মধ্যে থেকে ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের একদিনের সাক্ষাৎকারের কথা তুলে ধরিছি—

অনন্ত আকাশের তলার অপ্রতিভত কোথায় গভীর কূলে বসেই সপ্রভ প্রণামের পর দম্ভে উপবিত্ত শ্রীঠাকুরকে বিনীতভাবে বৃদ্ধ ডাঃ সরকার বললেন—আমায় একটি পরিপ্রস্তর আছে—

শ্রীঠাকুর একটু বন্দ হেসে বলেন, “কন্নে কি আপনার প্রস্তর”...

ডাঃ সরকার—এখান থেকে যেসব বই প্রকাশিত হচ্ছে যেমন সমস্পর্শী বর্নন বা Divine Flashes, তার মূল বিষয়বস্তু বা Direction তো আপনাই, ওই শব্দর বোঝাও খণ্ডন করে নতুন তত্ত্ব পরিবর্তিত হয়েছে; ওটি সম্বন্ধে একটু বলুন—শব্দর বোঝাওর নিগূণ রসের অচল, অটল সমরস সত্তা না মানলে মীমাংসার গোলামাল হক না কি?

শ্রীঠাকুর—আমি তো শব্দর বোঝা প্রতিপাদ্য অচল অটল সূক্ষ্মর রসতত্ত্ব অনুসীকার করিনি, আমি বলাছি ওই সত্তা ছাড়াও তাঁর অনন্ত বিভাব—ওই নিগূণ সত্তার ইতি না করে তাঁর বিলাস, তাঁর সৃষ্টি, তাঁর ইলান ভাইটাল সত্তার কথা—

ডাঃ সরকার—“ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম” জীবেসত্তা, সৃষ্টিসত্তা মানলে বহুত দোষ এসে যায়—অনন্ত হচ্ছে এক, অনন্ত কখনও বহু হয় না।

শ্রীঠাকুর—নিগূণ ব্রহ্ম অচল, অটল অমর ঠিকই জানলাম। কিন্তু ব্রহ্ম মানেই ‘বৎহতি অনন ইতি ব্রহ্ম’—কাজেই তাকে শব্দ মাত্র অচল অটল বলে ব্রহ্মন কি করে সম্ভব? তাছাড়া আচার্য্য শব্দর সৃষ্টির আত্মাত্মিক সত্তা মানেই নি? ব্যাবহারিক সত্তা অংশা মেনেছেন; কিন্তু ব্রহ্ম যদি নির্মিত্র হবে সত্তার সৃষ্টি কি করে সম্ভব? তার উত্তরে তিনি বলেছেন—সৃষ্টি মাত্রা বিজ্ঞপিত—অথচ নিগূণ ব্রহ্ম মাত্রা বিজ্ঞপিত। মাত্রা ব্রহ্মান্ত্রিত নহে, আচার্য্য শব্দর মহাপ্রলয়ও স্বীকার করেছেন—তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে—হোপ্রলয়ে ওই মাত্রার স্থান কোথায়? নিগূণ ব্রহ্ম তো তার স্থান নেই—মাত্রার অবিদ্যন বলতে না পেরে, মাত্রাকে অস্বীকার করে ছেড়ে দিয়েছেন—

শব্দর বোঝাওর এতো একটি fallacy বা বিরাট অনুপপত্তি—।

বোঝাওর নিগূণ ব্রহ্ম নির্মিত্র তত্ত্বের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শব্দর তো শব্দকে অনুসীকার করেছেন। এই মতবাদ সকলের বোধগম্য নহে—অর শব্দমাত্র এই মতবাদ প্রচারে জীবের মজল সর্বতোভাবে হবে না বলে মা তদ্রূপের স্বেই ঘটনাটি মনে আছে তো? শব্দর আচার্য্য একদিন গম্ভীরমানে বলেছেন, রাস্তার মধ্যে দেখে অশ্লীল মর্গিন বস্ত্র আবৃত্তা একটি মা জননী খুব কাঁদছেন, মৃত স্মারক কোলে নিয়ে।

শব্দর আচার্য্য ফেরলী রাস্তা শব্দিতা বোধ আচার্য্য বোধ রয়েছে মনে, অনেওক্ষণ অপেক্ষা করে বলেন—মা, তোমার স্মারক মৃতের পরিয়ে নিয়ে পথ ছেড়ে যাও আমি গম্ভীরমানে যাব

তখন মা জননীটি বলেন—‘যাবা, তুমি ঐ মৃতকে হল্য সরে যাবে’...

ঐ কথার শব্দর আচার্য্য বলেন—‘মা, তোমার কি দ্বিভাব হয়েছে? ঐ মৃত কি নিজে সরতে পারে? ওর কি কোন শক্তি আছে যে সরে যাবে?’

তখন যা'টি যন্ত্রে, 'কেন বাবা, তুমি তো শক্তি মান না, তোমার শক্তিহীন নিঃশব্দ ব্রহ্ম বাণি বিষমুদ্রিষ্ট করতে পারেন তাহ'লে ঐ মৃত্যুই বা সরে যেতে পারবে না কেন ?

উত্তর শুনে আচার্য্য শম্ভুর চমকে ওঠেন ! দীন মলিন বেশে যা জগদম্বাই যন্ত্রে এ কথা, তা ডিম্ব কে শম্ভুর বেদান্তের ভুল করেন ? এথিকে মৃত্যুদেহ সমস্ত মাতৃমুদ্রিষ্ট ও চোখের সামনে অন্তর্ধান করেন ।

আচার্য্য শম্ভুরের দেওয়া ব্রহ্মের Direction অনন্ত তত্ত্বটি নিয়ে আমি বর্দাষি, যেহেতু তিনি অনন্ত সেইহেতু তাকে শূন্যায় অর্থাৎ, নিষ্কিন, অচল, অটল বলাই শেষ বলা নয় । তিনি অনন্ত বলেই আরও কল তিনি অনন্ত, তিনি শক্তি, তিনি এক, তিনি বহু, তিনি অচল অটল ব্রহ্ম । আবার তিনি "Élan vital" বলেই স্যামুয়েল জ্যাককজা'ভারের ও গুয়েতে মরণ্যানের 'Emergent' evolution মানা সম্ভব । তাঁর অনন্ত সম্ভাবনা ! আচার্য্য শম্ভুরের definition অসামান্যসো গোচরম এটা মেনেই বলছি, তাই যদি সত্যি হয়—তাহ'লে আচার্য্য শম্ভুরের শূন্য এই আটটি Definition শেষ বলা হল না । পক্ষিগণের ঠাকুর তাই বলেছেন—তিনি আরো কত কি—"ভার ইতি করিস না" কি চমৎকার উপমা দিয়েছেন—ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, মণি আর মণির জ্যোতি, সাপ আর তার তির্যক গতি, অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি অভেদ ।

শ্রীমদ্ব্যাক্রমের আদ্যরাম শব্দে একবাটি প্রকার ব্যাখ্যাটি আমার বেশ ভালো লাগে । মহাপ্রভুর "অচিন্ত্য ভেদাভেদ" তত্ত্বটি মনে হয় ব্রহ্মের অনন্ত সত্ত্বা সম্বন্ধে সেরা তত্ত্ব ।

পীঠামুখে ভগবান ঐ অচিন্ত্য তত্ত্বটি বলেছেন—সবস্ত সৃষ্টি আমাতে অবস্থান করছে, কিন্তু আমি সৃষ্টিতে অবস্থিত নই, আবার বলেছেন সৃষ্টিও আমাতে অবস্থিত নয়, আমিও সৃষ্টিতে অবস্থিত নই, কাজেই অচিন্ত্য তত্ত্ব ।

পীঠামুখে ভগবান শম্ভুর বেদান্তের মতবাদ মেনেছেন, আবার বহু হয়ে বিলাসের কথাও মেনেছেন প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন—এই বহু পৃথক পৃথক সত্ত্বা তো নয়, তার অসংখ্য তিনি ছাড়া নয়, পীঠামুখে এইজন্য অসংখ্য বৃক্ষের সহস্র নিঃসৃত ভুলনা দিলেন । একটি অসংখ্য বীজের মণি থেকে যায় অনন্ত সম্ভাবনা—অসংখ্য বীজের একটি বীজ । তার মধ্যে রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা—সৃষ্টির সম্ভাবনা বীজাকারে তার মধ্যে থাকলেও তার অনন্তর অসীম কোন অংশে বন্দিভ হয় না । তার নির্লিপ্ত সত্ত্বার কোন ব্যতিক্রম হয় না । পক্ষিগণের ঠাকুর বলেছেন—শূন্যত্বা নির্লিপ্ত । বারু নির্লিপ্ত তাতে পৃথক স্বেদ্য সহই থাকে থাকে থাকে । সাপের মুখে কি থাকে দংশন করলে অপরের কর্ণত হয় । কিন্তু সাপের নিজের কোন কর্ণত তাতে হয় না, কি চমৎকার উপমা ।

তাই মনে হয় আচার্য্য শম্ভুরের শূন্য সেই দেশ-কাল-পাত্রের মধ্যে তার মতবাদের বর্ষাব্দ প্ররাজন ছিল, বা তার মতবাদের সত্ত্বতা আরো আছে, কিন্তু সেইটুকু সত্ত্বা আর সব মতবাদ মিথ্যা, বা ওই মতবাদের বাইরে নতুন কোনকিছু বলা যায় না এও ঠিক মনে হয় না ।

আর এটাও ঠিক যে আমাদের সব জানাই Relative জানা "অনন্ত অবাক কাণ্ড হিসাবের পার" মানুষ তাকে কতটুকু জানেব । একটা ভুলকেই সম্পূর্ণ মনেতে পারে না । তাকে জানবার বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও সেটা আবার প্রকাশ করার মত ভাষা সবই সীমাবদ্ধ বা Relative ।

শ্রীঠাকুরের মূর্খানিস্ত কথাগুলি শুনে জ্ঞান সরকার শূন্য আনন্দিত হলেন, মনে হয় এ কোন তাঁর মনের শিখা সম্প্রদর্শিত ভেটে গেল ।

কয়েকটি কথা

ভট্টর উমা রায়

শ্রীমতী সত্যানন্দ—ঐশ্বরজানিত ম্হাপদ্বয়। কিন্তু তিন হিমালয়ের গহন গহ্বর আত্মগোপন করে ভগবৎ সাক্ষ্য করেন নি। গঙ্গাঐর তুঁহন-শীতল গহ্বায় জেতে তাঁর সান্নাতির নিষ্ঠার নেমে এসেছে লোকালয়ের উপর সমতলে, শ্যামল করেছ সে মাটি। আর তাঁতে ফলন ফলছে সাধারণ মানুষের জন্য। এখনি ও'রই অসাধারণ সাধারণের কাছে নেমে আসেন—স্বাভাবিক যেমন সেম আসে ধর্মীর শূণ্য, পৃথিবীতে করে কর্মমাতা উজ্জ্বল ও বিচিত্র।

মহাপদ্বয় চিরই এই। জ্ঞান-প্রদ-সমের গ্রি-ধারা হৈকৌ তীর্থ সৃষ্টি করে যান ত্রাপিত লোকের অব্যাহনের জন্য—সমস্ত মানি মূখে আবার উজ্জ্বল করে তোলেবার জন্য। কর্ম তাঁর আভ্যন্তর জীবনধারা সৃষ্টিতে, জ্ঞান তাঁর বহুমুখী শাস্ত আলোচনার প্রণে, প্রেম তাঁর ঐশ্বর্য তথা মনেবে। ঐশ্বর পরম সূন্দর, তাঁর সৃষ্টিও পরম সূন্দর, সেই পরম সূন্দরের অনুভাবনা সাহিত্য-লিপ্তও পরম সূন্দর।

কবিতা রচিত হয় প্রাণের আনন্দে আপনাকে প্রকাশ করবার লীলার। সেই লীলার সৃষ্টি ভয় মনেও এসে লাগে—সেখানেও গুরুতর হয়ে ওঠে কবিতার লত নিষ্ঠুরের কলকলধ্বনি। শ্রীমতী সত্যানন্দের কবিতার কলকলধ্বনি ফুলে বসে শোনার নয়—ভরসে কাণ দিয়ে পড়ে শোনার। এই কবিতাগুলি পড়লে নিশ্চিতরূপেই অনুভব করা যায় যে সাধক কল্লরের কোমল ভগ্নীসুন্দরিত এই লক্ষণ-প্রকৃতি ও জীবনপ্রকৃতি কত সুকৃ অমূল্য চালনা করে তাম-ভাগিনী ব্যাজের গেছে। “চির সন্ধ্যার,” “প্রথম বৈশাখ,” “হাতের ছাচার,” “শরণে গাভে,” “আব্বা আলোর,” “বহু শেখ,” “কুহু আর কুসুটি,” “মেঘবাদলের সন্ধ্যা,” “চিঠী হাওয়ার বৃন্দ” প্রভৃতি কবিতা প্রাকৃতিক কবিতা ঠিক নয়—তবে এই প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত যে পরমপদ্বয় জাগ্রত আছেন—তাঁরই উদ্দেশ্য লক্ষ্য। অথচ কত সরল-সহজ তার আবেদন।

কবিতার আকর্ষণ বৃগে বৃগে বদলার না—কলার তার শূণ্য। আত্মনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই শূণ্যের ভঙ্গীটি বড় তাঁর, বিচিত্র। এমন কি কোন কোন কবির লেখার “স্বপ্নম্হ”। সাহিত্যের অভিব্যক্তি এই শূণ্যের উপরেই গড়িয়ে আছে—এমন মত্তও শোনা যায়। কোন আলোচনার ক্ষেত্রে—যাশন-বাহের অবকাশ সৃষ্টি বা প্রবণ করার প্রস্ন না ভুলেই কলা যায়—কলার উপলব্ধি যেখানে হৃদিত বাণীর মধ্যে প্রকাশ চায়—সেখানে কলার সৃষ্টি হয়েছে কিনা—সেইটাই দেখবার কথা। সে রস যদি গতানুগতিকতাকে প্রত্যাহার করে তবে নিশ্চিতরূপেই তা বিশেষ শ্রেণীর পাঠকের প্রত্যাশা করে। শ্রীমতী সত্যানন্দের কবিতার আবেদন এই অধিকারের দাবী করে।

এই কবিতাগুলি একটি বিশিষ্ট শ্রীমতী কবিতা। যে অধ্যাত্ম চৈতন্য বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে একটি আনন্দ চৈতন্য-সত্তাকে সাক্ষ্যকার করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সাক্ষ্যকার না ক'রত পারলে বিবর হয় সেই অধ্যাত্ম উপলব্ধির এই কবিতা-গুলির রসাম্বাদনে একটি বিশিষ্টা সন্দেহের অপেক্ষা রাখে।

ভট্টর—“বাইলের দল” কবিতার কয়েকটি পঙ্ক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

“ক'মিছে গোলাল

দ'রাস্তা পলধানি—

শাও স'বমার—

সরবর শ্যাম সরাপিতে

ধর্মীর চিত্র আঁখি পড়ে

শ্যাম দ'বাল

বসে বসে জেগেছিল দ'ব

শ্রেয়ছে কি সাড়া

চরশত ছুই

ভাবমুখে

[অষ্টাভিংশ বর্ষ : একাদশ সংখ্যা]

পেয়েছে কি পলাশিত নরনের শ্যাম রেহাঙ্কনে,
শ্যামারিত করেছ তি কিশোর কিংকদুকে—
কলঙ্কলিত বদনার কুলসম জেগেছে কি

শ্যাম মেহ কাঁতি
বেণুলেমে রক্তরাগা পদচিহ্ন
হুঁজুছে কি মেঘাশিশু বিধর পিঙ্গাসে ।”

মহাপুরুষ স্বামী সত্যানন্দ সাধক ও সিদ্ধ কবি। জীবনকে তিন গ্রন্থে ক’রেছেন সত্যানন্দরূপে। সেই সত্যের আলোক তাঁর কবিতার দ্বারা ছাড়ে। তাঁর পরিবেশিত ছন্দিত সত্যের আলো ভক্তজনের হৃদয় ও বসিকজনের অন্তর আলোকিত করার শক্তি রাখে।

—১০১—

যুগ-পুরুষ স্বামী সত্যানন্দ

(ত্রিশশতাব্দীর চক্রবর্তী কাব্যত্রি)

এসেছি, প্রথম বর্ষদিন
অনাদৃত পান্থ সম পরিভ্রমহীন—
তোমার চরণ-তীর্থে, সে স্মৃতি আমার মাঝে—
রসেছে ভান্ধের আঙো সুবর্ণ-অক্ষরে—

হর নাই কাল !

মনে নাই কোন তীর্থে, কোন লয়,
ছিল তাহা কোন সে দিক,

মনে নাই কোন হাস, কোন সে বস :

তবুও উজ্জ্বল হ’রে মোর মর্ম-বিন্দু-কোষে

সেই ‘বর্ণ জাগরু’ক আছে সর্বক্ষণ।

আনন্দ আশ্রুত হিয়া হর আঙো স্মারি’ ব্যয়ে ব্যয়ে,

জ্যোতির্ময় হ’রে গুঠে আমার জীবন !

সেদিন সে শূভ-ক্ষণে নর্তাশরের চরণে তোমার

জানালাম হৃদয়ের প্রথম প্রণাম।

কি এক মধুর শান্তি, কি এক মধুর মেহ—

অন্তরীন স্রোতে বেন প্রবাহিত হ’ল অবিদ্যায়।

পরিচয় হ’ল নাহো, তাই মূঢ় বাক্যল হৃদয়ে,

কি বেন অস্বাভি শূন্য লাভিলাম সুখ-বিনিময়ে !

নাই থাক’ পরিচয়, নাই থাক’ অন্তর-কাণ,

জাগিল অন্তরে মো’ বেন এক তাঁর আঁকবর্ষ—

যেন তব আমার প্রভাব !

আমার কবিতা দিয়ে দেখিলাম একদিন সংসা নহনে,
বাঁধা হ’রে গেছে সেতু তব সাথে মোর প্রাণে মনে !

দূরে ছিলে, কাছ এলে—এলে বন্ধ হৃদয়ে আমার,
মোর শূন্য রিত বীন এ জীবনখানি—

তোমার কন্যা-ধন আমার কৃপার মাঝে

লাভিল বিভার।

এত মেহ, এত কৃপা বন্ধে তব

দীক্ষাইন সন্তানের অরে।

ভাবিতে কিঙ্কর লাগে, অনুগ্রাণে প্রাণ ভরে,

দুই আঁধি পূর্ণ ক’রি শ্রাবণের ধারা সম

করে অবিলে

মোর অশ্রুজল।

মনে ভাবি—দিতে ত’ পারিন কিঙ্ক;

তবুও আগ্রহ দিলে—

তোমারি চরণজলে কৃপাধরা ক’রি মেয়ে

এ মহানিখিল !

একদিন আচম্ভিতে শুনিনু প্রবণে,

তুমি নাই—তুমি নাই—আর এই মাটির ভুবনে।

হ’লে সেই অজহিত, কোন সে অজানা লোকে

ক’রেছ প্রণাম।

আসিবে না ফিরে আর—শও কণ্ঠে করিলেও

কাজে-আহান।

অবিধাসা এ বারতা কেমনে মানিয়া গই,
ভাবিয়া নাই।
প্রথমে কেবলি বাজে বিভ্রান্তির স্রোত তুলি—
নাই তুমি নাই।
এ পৃথিবী হ'ল শূন্য! সমুদ্র পর্বত বত,
বত নন্দনী,
বত বন-উপকন—সব যেন শূন্যতায়
পূর্ণ নিরর্থক।

অন্তিমের মহামন্ত—যাহা তুমি ভ'রে দিলে
এই বিষয়,

নীরব কি হ'ল আশ? শূন্যতায় লভিল আশ্রয়?

কল কল ওগো প্রিয়, ওগো প্রিয়—প্রিয়তম মোর,
আমারে ঘেরিয়া নৃত্য করিতেছে কেন আশ
নিশ্চয়ের অপেক্ষার ঘোর?

পৃথিবীতে কত কি যে আগে আর চ'লে যায়,
তুমি কি তাগের বত অনিত্য নকর?

সত্য কি নাই এ বিষয়! হ'ল কি সর্বলি মিথ্যা?

ওগো মৌন মহাপ্রাণ, পাও পাও পাও গো উত্তর!

অজ্ঞান বিজ্ঞের বিরহ-বাখার,

প্রাণ-মোর শূন্য কাঁসে হ'লে অস্বারে।

জীবনের স্বপ্ন-সৌখ হ'লিগাং একটি নিষেধ,

কে সেধে সাধনা থাণী এ ঘোর দুর্দিন যাকে

চিরকণ্ডে বেধে?

নাই নাই কেহ নাই—তুমি ছাড়া এ জীবনে

সর্বলি বিফল,

চলার পথের মাকে কোথার হারারে গেল—

মোর বত সঁতিত সঞ্চল।

হ'লে আছি নদী-তেটে চলল উল্লস,

পাখি যে পাই না প্রাণে—নাই যেক আশার স্পন্দন!
সহসা কি শূনি যেন—যুঁকি কোন্ দূর সেপ হ'তে
ধীরে অতি ধীরে—
পরকণে উদাস গম্ভীরে;
সে ধনি আমার মাঝে—তুলিল স্পন্দন,
শত দুঃখ-বাধা হ'তে যেন মোরে তুলিল জাগারে!
সে ধনি নিখিল-বিশেষ দিক্ হতে দিগন্তের
পাড়িল চড়ায়!

সেই ধনি অবিভ্রান্ত বাজে আর বাজে—
স্বস্ত উৎসাহিত হ'য়ে সেই ধনি বেগে ওঠে
মোর হিয়া মাঝে!

শূনি আমি সে মহা আরাধ,
বত শূনি যেন গণি আর যেন নাই কোন
মোর রিত্ত জীবনের কিব'ই অভাব!
জীবনের সর্বদিক ভরি—যেন ঘিরে এল—
হারানো পাখের মোর—জীবনের অপার্জিত
হৃকের সঞ্চল!

কহিতেছ তুমি প্রিয়—“ভর কিবা—ভর কিবা—
সম্মুখে আগারে বাও—
হ'রো না কাতর আর—বেদনার বাহিত-বিহীন।”
সেই সূরে সেই ছন্দে
কি কেন বিমলানন্দে

গেয়ে ওঠে হিয়া মোর—

তুমি আছ, তুমি আছ—ভর কিবা আর?

গত, তুমি ইস্ট তুমি—আমার সর্বস্ব তুমি,

জীবনের সার তুমি—

তুমি আছ কৃপা-পারাবার!

“কোন বাসনাকেই গভীরভাবে মনে টাই দিও না। আর ইষ্টনাম বুঝ অভ্যাস
করবে, নাম ও নামী তো অস্তিত্ব; কাজেই তাঁর কৃপায় বাসনা ক্ষয় হবে। আর
শান্তিও মিলবে”।

কি সেই কথা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

■ The greatest perfection Seems imperfect ■

কোনও কিছুই শেষ কথা নেই। শেষ থেকে আবার শুরু হতে পারে। কর্মের শেষ নেই। ধর্মপুঙ্খের শেষ নেই। জ্ঞানের শেষ নেই। প্রবৃত্তি ক্রিয়ার শেষ নেই। অন্যতরূপে পৃথিবীর সীমানার কসম মনে হতে পারে, শেষের সীমানাটিই বৃষ্টি ঝঞ্জে পাতলা যায়। সে শেষ আমাদের কল্প মনে। অন্যন্তে শেষ কোথায়। নিখুঁতও খুঁত ছেঁক যায়।

জীবন সাধনার শেষ নেই। আমাদের জন্মান্তরে বিশ্বাসী। অর্থাৎ আধুনিক মানব অথবা এসব বিশ্বাস করে না। পশ্চিমী হাওয়া অন্য কোথাও না লাগলেও, আমাদের বিশ্বাস অবিশ্বাসে খুব সেরেছে। আর সেরেছে আমাদের মূল্যবোধে। হিন্দু ধরে = আমরা হিন্দু নই। আবার জীবিতানও নই। ফলে আর্থিক বিক ছেঁক আমরা সম্পূর্ণ মনো। খোল আছে মাল নেই। নির্পরিচয়ালি যারা ব্যান্ডকরাষ্ট, তারা মিশর পশু। খার দায়, মল হতে ত্যাগ করে, বসেখুঁতি করে। কপড়া, কাঁজরা, মামলা, মক্ষমা, শ্বেবে চিকিৎসাত অসম্মেব কল হরি।

হিন্দু, ধর্মমন্দিরে ঘণ্টা নাড়ায় ধর্ম নয়। জীবনচরিত্র প্রেষ্ঠ আগশের নাম হিন্দুধর্ম। একজন মানব জীবন সাধনার কঠো নিখুঁত হতে পারে, হিন্দুধর্মের শিক্ষা সেই শিক্ষা। যে কোনও ধর্মবিশ্বাসী মানব হিন্দু হতে পারে। আর্থিক বিকাশই হিন্দুধর্মের শেষ কথা। ঈশ্বর আছেন অথবা নেই এ তর্কের কোনও প্রয়োজন নেই। তর্ক বহু নয়। তর্ক হল পাল কাটিয়ে যাবার কুট কৌশল।

আমি, আমার পৃথিবী। আমি আমার সমাজ। আমি আমার পরিবার। সবশেষে আমি এবং আমি। নিজেকে নিজের সামনে ধাঁড় করাণের নাই সামনা। সে কাজ নিজের যারা সম্ভব না হলে, পুত্রের অন্তর। পুত্র একটি আরনা তুলে ধরবেন সামনে। যাতে প্রতিফলিত হবে আমার খাইরেটা নয় ভেতরটা। নিজেকে দেখতে না পেলে সশোচন

অসম্ভব। আমি নিজেকে কৌরবমন্দিরে হাকির করতে পারি। নরসম্বর হল ছোট্ট কেটে ঘুরিয়ে তিরিয়ে গোফের নকসার অবল কল ক'রে আমার শ্রী পাটে দিতে পারে। আমি কোনও সানোলের যেতে পারি। এক প্রস্থ সূক্ষ্ম পোশাকে অ্যাক্সর সেইর সমস্ত টুটি ঢাকা পড়ে যাবে। ইয়েরকরা হলেন, Tailor makes a man. আমি বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে এক পাছা ডিগ্রি-ডিপ্লোমা কলে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারি। নাকের পেছনে বেশ সুদৃশ্য খেলোয়াড়ী একটি গেলের বাহারে আমার অহং আরও স্পষ্ট হবে। কিন্তু কে আমাদের শেখাবে :

ঈশা বাসাদামং সর্বং ব্যবহৃত্ত্ব জগত্যা জগৎ।

তেন ত্যরেন কুঞ্জীবা মা পুং কসাম্বিক্ব কনঃ।

ইঃ উঃ।

পৃথিবীর যা কিছু নরর পদার্থ সবই পরমেশ্বরবৃত্ত। পৃথিবীকে ত্যাগের যারা ভোগ ক'রে আত্মোপলব্ধি কর। অনেকের ঈশ্বর্বে জ্বলিত হ্রো না।

এই সার কথাটি হিন্দু ধর্ম হাজার বছর আগে বলে গেছেন। আমরা জীবনের উত্তাপে, অহংকারের নির্মোকে নাও মনেতে পারি। তাতে সত্যের কিছু যায় আসে না। এই সত্যই জীবনের শেষ প্রান্তে ঘিরে আসবে। বন্ধন সত্যের পুঙ্খনা কণ্টকিক কণ্ঠতপ্তর্ভাত মাল হিসেবে আঁতাকুড়ে ঠেলে দেবে। কানে বাজতে থাকবে :

ভেবে যেব মন কেউ কারো নয়

মিছে প্রশ কুশাঙ্কলে।

মুঁচার দিনের জন্য ভবে

কর্ত্ত বলে সবাই মানে

সেই কর্ত্তের দেবে কেসে

কালাকালের কর্ত্ত এলে।

ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের হৃৎকেন কোনও আগজাক ছিল না। নবা বাঙলার জিলাসী বাবদের সুযোগ পেলেই কাটাগেটা করতেন। কবার কাটা। শ্রায়ই কলতেন, বাগের দানস

করতে করতে বাবুয়া সব হেঁদিয়ে পড়ল। মুখে বড় বড় কথা।
আবার কত বিচার, প্রশ্ন অস্তিত্ব, না প্রশ্ন নাশিত। নিরাট এক
নামী বাঙালী ঠাকুরকে বলেছিলেন, জীবনের তিনটি লক্ষ্য
আহার, নিদ্রা আর মৈথুন। ঠাকুর খুব কলশবুট হয়ে-
ছিলেন। আত্মবিশ্বাস, ভবিষ্যতের প্যাঁড়তাকে তিনি তাই
ঘণা করতেন। বলতেন পাঁজরিতে সাত আড়া জলের কথা
লোবা আছে। নিজেই এক কোঁটাও কেঁদে না। কামিনী
কান্তনের কষ্টসের তিনি করণা করতেন। প্রচ্ছন্ন ঘণাও
ছিল। জানতেন, এই সব বুদ্ধিজীবী, চাকুরিজীবী আসন্ন
মানুষদের কিছু হবেন না। তারা কৃপা চাইলে উদাস হয়ে
করতেন, যাও না যাও রাসমণির বিলিড দেবে এস।

রামপ্রসাদ গেরোছিলেন শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি।
ভবসাগর বাজার মাঝে। এই গানেরই একটি লাইন, লক্ষ
একটি দুটি কাটলে ঘুড়ি। হেসে পাও মা হাত চাপড়ি।

এই ঘুড়ি কাটার ব্যাপার এক জীবন হয় না। এস,
চলে যাও, আবার এস। পুনঃ পুনঃ গভাগ্য। তৈরি
হবে সংস্কার। কোন জীবনে হবে বিজ্ঞানীরা বলতে পারবেন
না। সেই সংস্কারে বৃত্ত হবে সাধনা। পিউরিফিকেশন
অফ সোল। তখন প্রকৃত গুরু উদ্ভিত হবেন জীবনে।
আগেও না, পরেও না।

বড় কষ্টের এই জীবন। ভেতরে সরেছে সব। নিশ্চিত
মৃত্যু। কিন্তু জানে না, ভেতরে মৃত্যু। মাগের দাপে।
জীবিকার দাপে। অন্ন চিন্তা চমৎকার। লোভ, পরগী-
কাতরতা, বামলা, রক্তমা, পরনিমা, পরচর্চা। এই নিয়ে
মশগুল। জীবন থেকে জীবনে একই ব্রহ্ম বাওয়া আসা।
অবশেষে কোনও একদিনের উপলক্ষ্য :

বেনাবৃত্ত নিতামিঃ হি সর্বং জ্ঞা
কালকারো গুণী সর্ববিদ্যা।
জেনোপিতঃ কর্ম বিকৃত্তে,
পৃথ্বাপ্রতঃজোহনিলখানি চিত্তাম ॥
যে: উঃ ৩২

এ জীবনেই কেউ একবার বলুক না :

Be humble, and you will remain entire
Be Bent, and you will remain straight
Be vacant, and you will remain full.
Be worn, and you will remain new.

কিন্তু হও তাহলে অখণ্ড রবে। নত হতে শেষ তাহলে
সোজা থাকবে। শূন্য হও তাহলে পূর্ণ থাকবে! অরাজর্জ
হও তবে নবীন হবে।

—৪০—

গান

নিবারণ চক্রবর্তী

'মাধু' সঙ্গে প্রেম-জরুরী ভাসিয়ে দেবে প্রেমের তরী
গানের সুরে বাধা তুলি, যা করেন তা করোক হরি।

পিষ্ট কত পাপের ছালা

হাড় মাথের কঠন অদ্বালা

ভিক্ষা পাও হাতে মালা গাছতলাতে বসত করি।

হুট কামেলা রাজস্বয়রে শিকপী গুণীর খেতাব মান
রাধাকৃষ্ণ নামে পাগল আত্মবুদ্ধিমান চায় না সে মান।

মাজেমাড়া আত্মমত্তে

কালী নামের প্রসাদ পেতে

রসে মত্তে মল্লয়াতে সন্ত করি চরণ ধরি।

—৪১—

শূর গুরু ঠাকুর শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেব

কণপ্রভা ভাট্ট

“সঙ্গীত যেন সখ্যার সুর—বরে ফেরার ডাক—নাকের কোলে মাগের চুম্বা—যমুনার কুলে অকুলের অভিসার...
অনন্ত অশ্রম সাগরের বুকেও যে সঙ্গীত সেও যে সব হারানোর ডাক আর সেই ভাবেই তো ছুটে আসে সাত সাগরের
সুরধ্বনী” স্বামী সত্যানন্দদেব।

সুরের গুরু আমাদের ঠাকুর সেকান্দার ধ্যান-তত্ত্বের মতো নিত্য নব নব সুর হৃদয় ও গানের সৃষ্টি করেছেন
অনবদ্য ও অসংখ্য। সেই সঙ্গীতজলীর আনন্দপূর্ণ রসধারার অভিসিক্ত মাটির প্রতিষ্ঠা তৃণ গুল্ম তন্তুব্রী কুসুমরাজি
কেবল সুর করে মানুষের মন-প্রাণ জাগতিক সমস্ত সত্তা। সে সৃষ্টির স্বরূপ ধারণা করা যে কোনও মানুষের
কল্পনাগত। একথাও অনুগাহ্যই তার সহায়ক।

আমাদের ঠাকুর পদম আনন্দময় দিব্যজ্যোতির্ময় বোণীশ্বর্য। অহরহ তাঁর চতুর্দিক কত রকম সমস্যা ও
নানাপ্রকার প্রতিকূলতার কড় বয়ে গেছে। তার মধ্যেও তিনি নিত্য ভাগ্যবত আনন্দ সাগরে নিমগ্ন থাকতেন। সর্বভাগী
সম্মানী হয়েও তিনি তাঁর শব্দ পূজা ও সামান্য বিশ্রামের সময়টুকু ভিন্ন দিব্যরাজির অবশিষ্ট সময় সবই অকাতরে বিলিয়ে
দিয়েছিলেন তাঁর ভক্ত সন্তান ও লগ্ন প্রার্থীর কাছে। গৃহীতের সংসারে তো সমস্যার শেষ নেই। নির্বিক্ত চিত্তে তাঁদের
সমস্যার কথা শুনেন তিনি তাঁর প্রতিবন্ধন করে দিয়েছেন। প্রার্থিতক শব্দ ও সং পুথের নিষেধ ও উপদেশ দিয়েছেন।
মানুষের দুঃখ কষ্টগার কথা শুনেন তাঁর দিব্য অন্তর বাধার ভরে উঠেছে। তিনি দ্বন্দ্ব দিয়ে সব গ্রহণ করেছেন। তব
সত্ত্বেও তাঁর ঐশ্বরিক মন সর্বদা অতি উচ্চলোকে বিচরণ করেছে। কল্যাঙ্কলা গঙ্গার পানে মেলে দেওয়া নিম্পলক
আস দট্টা শ্রীনন্দনের দিব্য দৃষ্টিপাতের মধ্যে তাঁর বোণসিক্ত মন ভেসে বেড়াতে দূর হতে দূরত্বের। যেখানে শব্দ
অখণ্ড আনন্দ আর অপার্থিব সৌন্দর্য ভেসে বেড়াচ্ছে অদৃশ্য অলঙ্কার কোনও রহস্য লোকে। সেখানে থেকেই তিনি
শুনতেন কোনও বাণীর সুর। সেই সুর দিয়েই তিনি আরাধনা করেছেন তাঁর কল্যাঙ্কমুখী।

একদিন আশ্রমে কথাপ্রসঙ্গে আমাদের সম্মানসিনী গঙ্গা মা বললেন, “আমাদের ঠাকুর মহাকবি। তাঁর
জন্মোৎসবে কবি সম্মেলন হয়ে না?”

কথাটী শুনেন আমার মন আনন্দে জ্বরে উঠছিল। আহা এমন কথা আর কে বলছে? আমাদের ঠাকুর কবি
কবি। পাথরের কামাও তিনি কান পেতে শুনছেন। কল্পনাঘন মনে তিনি হলছেন, “পাথরের চোখে জল কেন
জানো? মল্লারে সে কাঁসে—

সারা আকাশ ঘন হয়ে আসে

গুরু গুরু করে গুরুতে ওঠে তার সান্না দিরা

আর হঠাৎ ভাবনে গলে পড়ে তার বাধা—সে কাঁসে।

অজানা বাধার আমরা কাঁদি গভীরে জল করা রাতে

সেও কাঁসে অসহায়ের কার্ধিন

রাত জাগা পাখীর মত...হঠাৎ সে কাঁসে।

শ্রীঠাকুরের দিব্য সাধন পদ্ধতি, আমাদের বুজির অজানা। ধারণার অতীত। তবুও তাঁরই কৃপায় বহুটুকু উপলব্ধ

ভেসে পড়া রাতরাণীর দৃক নিমজ্জ

তিস্তার বঁধ ভাঙ্গা কামা সে কাঁসে

ঝড়ের রাজের কামা এ নর

এ কামা অনেক দিনের চেষ্টে রাখা বাধার।

চাপতে গিয়ে চুটে ওঠে মৃত্যুর কামো দট্টা চোখ।

(পাথর ভাঙ্গা কামা)

হয়েছে, সেই সত্যানুভূতিতেই মনে হয়েছে তাঁর পুণ্যের একটী অংশ ছিল সঙ্গীত । নিজে গান লিখে তাকে মধুর সুরে সংযোগ করে নিজ সৃষ্টিতে সে গান গেয়ে তিন পুণ্য করেছেন তাঁর আদরের গোপাল সোণার । মেয়ে আশ্বাসে গভীর ভালোবাসার বিভোর হয়ে সে গান শুনিয়েছেন তাঁর মা দেবী তিনরনী আর প্রভু খ্রীষ্টানন্দকৃষ্ণদেবকে । সে আনন্দভর ভাব সঙ্গীত যে শুনিয়ে সেই জানে যে কি শুনিয়ে ? সে সুর এ রাজ্যের নয় । শব্দ সব ভুলে যাওয়া মহা আনন্দ আর প্রাণ, প্রাণ আর আনন্দ । যা হওয়া হবে শুনিয়েছেন সে অপার্থিব গান । তারপর আনন্দে লিভোর হয়ে প্রেমভাবে রসে আদরের ছেলের মন পূর্ণতার ভরে দিয়েছেন । সে কি অপূর্ণ? অনিলামোহন ভাব—আকাশের মত উদার সৌন্দর্যে সন্নিবিষ্ট । খ্রীষ্টানত্যানন্দ দেবসেউল—কলমল ক'রে সেই মহাভাবের সুর হুঁশিয়ার । ঠাকুর গাইলেন—

‘তিনরনী বৌখস চেয়ে হিলোক আমার বাবে ভেসে
নীলকান্ত মন্দিরেতে কান্দিময়ী রইবি হেসে ।
সহস্রদল কমলকলি চরণ দুটী রাখিস যদি—

আমিও মা পাতকো হুল্লর হিলোক জরী চরণ দেশে ।
নিশীথ ছায়া থমকে যখন, ধ'রে কাঁপা গলাজলে ।
দলমলি রইবি চেয়ে বিজলী ঢালা হুঁপ রজসে ॥

আবার কৃষ্ণ সঙ্গীতী তিথির অকর্মণীতা চণ্ডা নামা দুলালী মা'কে অর্ঘ্য দিলেন আর এক ভাবে,—

‘জ্ঞান বিজ্ঞান দারিনী নয় সাঙ্কসে নম্র বরদে ; জগতে জাগ্রত জ্যোতি, অমৃত পুণ্ডর গতি, জর ভায়তী ।

নম্র হ্রদি শতল হাসিনী ।

স্মারতি তব বেগ বেগায়ে, দিগ দিকজ্ঞে, নিভা চেতনে অবগাহিনী ॥

কাণ্ড বা সঙ্গীত এখনই এক অনন্য সামগ্রী বার শব্দ বা গুণাবলী সম্পূর্ণ রূপে কোনও ভাব বা ভাব্যর বিস্তৃত করা পূর্ণ সাধনা সাপেক্ষ । আমাদের ঠাকুর সেই সুরের শ্রেষ্ঠ গুরু । স্ব-সৃষ্ট সুরের মতো অজ্ঞান ক'রে সঙ্গীতকে তিনি করেছেন নব নব রূপ ও সুরধারার স্বেতাংশারিত । গানটী গাওয়া শেষ হলে অতি সুন্দর ক'রে তার ভাবার্থ তিনি বুঝিয়ে দিতেন উপস্থিত শ্রোতাদের । প্রার্থনার মত সেই গান প্রাণে প্রাণে গুরুভরিত হয়ে উঠতো । মাটী আর আকাশ একাধ হতে বাঁধা পড়তো, এক অপার্থিব প্রেম কথনে । খ্রীষ্টান্দেবের দিবা লেখনীমুখে করে পড়লো এক অমৃততম রস মল্লিকা ।

‘পুণ্ডর ধূলে এলে ভুলে দরল ঠাকুর কে তুমি,
মউল হেসে, বাউল বেশে হঠাৎ জামা কে তুমি ॥
দুলায় ছায়ে ঢাকতে কি চাও রাজার অধিগ্রাম,

বাণায় গলে জুড়িয়ে দিলে বাণাহারী কে তুমি ॥
পাশেই এসে বসো তো নয় হিরাল নিলে ঠাই,
এমন ক'রে আপন করা কদিন গড়া কে তুমি ॥

আবার আত্মনিবেশনের ভাব নিরুত্তর উচ্ছল হয়ে বেজে উঠল তাঁর দরদী মনোজ্ঞাত গভীঃ সুরে সুরে ।

‘প্রভু তুমি আমার গানের মালা তুমি আমার গানের বালী,
আমার কাণের ভালো তোমার পায়েই দিলাম আনি ।
ফিরেছি হাটে হাটে, আমার এ গান যদি কাটে
অশ্রু এই কথাই নাটে শুনিতে কানা কানি ।

ফিরেছি ঘাটে ঘাটে—ফিরারে আপনারে,
আজি তাই একবারে—বিকতে এলাম আমি ।
যদি হয় কথার কথা, ভুলে হার বাবে কি তা
যদি হয় বাখার সোঁতা বৃকে কি লবে টানি ॥

খ্রীষ্টান্দেবাপালসাপাকে আদর করে কত যে অনবদ্য গান সুরে রসে ভরে দিয়েছেন তাঁর শেখ কোথায় ? রাজের নীল আকাশ ভরা সুন্দর তারার মত সেই গান সাত সাগরের মাণিক সোঁচা রামধন্য রঙে রঙ্গে মিটি মিটি করে জ্বলছে চোখে মনোনা ধানের শীষ আর মনের দেউলে । আহা কি মনোমর সুন্দর সে গান, সে সুর বৈভব, তাঁর তুলনা কোথায় ? কার বাণীর সুরের সঙ্গে হুল্লর দিল্লির ঠাকুর করেছেন এই গীতাঞ্জলীর সুর সৃষ্টি ? গোপালসোলা শোনে, আর মিটি

মিন্টি হাসেন, আশ্রয়ে আশ্রয়ে বিভ্রান্ত করে রাখেন আমাদের শিশু ভোলানাথ ঠাকুরকে। তাঁর দেহদেউলের প্রতিটী প্রাণ স্পন্দনের কণ্ঠ পরমাশ্রুতে জাঁকিয়ে থাকে সেই সুরের কিছুলতা। আনন্দ অনুরাগিত মনে ঠাকুর লিখলেন,—

ছোট বন, ছোট নাটো, গোপাল দিঘি এ ; কল্পলিত ছোট চোখে বিশ্ব বিহিত,
চর্চালিত চোখেই তো নৃপের ব্যঞ্জিত ; এরই পাড়ে গোপাল সোনা যায় যে নাচিতে ।
শাপলা ফোটে রক্ত রাসা জলটী রাসিরে ; মৃৎটী দ্বাথে সেই জলেতে ঘাড়টী বাঁড়িরে ।
গল্প শোনা কাব্য কথা চার খে নুনিতে ; রাসা দৃষ্টী চরণ রেখা পুথিই বৃণিতে ।
বাসুলা ভালো আপন ক'রে মের যে জানিরে ; আশ্রয় কাড়া ঠোঁটের কোণে জালিম বাঁহিরে ॥

প্রাণের ঠাকুর ব'লে আমরা যাকে অতি নিকটে পেয়েছিলাম তিনি ছিলেন মহাকাশের জ্যোতিষিক লোকের কোনও উপদ্রব নয়। মাটির কোনও কলু তাকে স্পর্শ করতে পারতো না। স্বীয় তপস্বী বিভার সকলের মধ্যে থেকেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যদিও তিনি সর্বভাষী বোম্বী সম্রাসী, পার্শ্ববর্ষ কলুয় সমস্ত ধরা ছোঁওয়ার বাইরেই তো তাঁর বিহার। তবু তিনি সকলের অত্যন্ত আপনজন ছিলেন। যানবাহন প্রতি কথার অজ্ঞের বাহার তাঁর দেব ক্রুর সাড়া দিয়েছে। দিবা হাসির প্রদমভার তিনি মছে দিয়েছেন সব বিষয়তা। তাই জনাই ব্যাকুল মন বলে, সৌমিনও তিনি যেমন আমাদের কাছে ছিলেন আজও তেমনি আছেন। আকাশের সূত্রজনা নীলে ভেসে ফেড়র তাঁর দেব দিগির আশীষ সূত্র। গানে সুরে জ্বলন্ত রসে অট্ট পটে হচ্ছে তাঁর মনলয়টি। পূজা পূষণ সৌভবে জেগে রয়েছে মৃৎ পিছরণ, প্রাণনার মূহুরণ। ধান নিষিক্ত অজ্ঞের লেন্দী হতে উৎসারিত হোলো তাঁর এক আকুল করা প্রেমের মধ্যাক্ষী ধারা”

যেহে ভারে বিজলী ছড়ে কি সুরে ওঠে বাজি,
সূত্রদ্বী লিখির নাচন নাচতে যেন রাজি ।
বাঁশীতে আজ জাগলো কেন সহসা কি রঙ,

যৌন অংগা কণ কণা কণে মল্লারেতে আজি ।
মাণিক হলে আজকে কেন সোলন চাঁপার সোল ;
হার অচিনে চিন্বেবা কি বার গোপন হওয়া কাজই ॥

মন ব্যাকুল প্রেমের কণ্ড ওঠে, পূণ্যবতী কাশীন্দ্রী মাতার কোল অরুণা ক'রে এই মাটির পৃথিবীতে কে এসেছিলেন? ভাবতও ভালো লাগে, আনন্দ মন ভরে ওঠে, তিনি কে? কোন কল্পলোকের যোগ সিদ্ধ কাঁচ? মহাসুখিত প্রথম ধ্বনি সন্নীতে প্রকাশ। সে সন্নীত প্রসন্ন গন্ধার অনাদি অনন্ত কাল হতে নিভা অনুরাগিত হচ্ছে স্মৃতি-ধর্মের ধারায়। বোম্বী সাবকরা নুনেতে পান সেই প্রসব ওজার। সেই ধ্বনি কলকরের মধ্যে মৃৎ সমীরণের মত ভেসে বেড়াতে আমাদের ঠাকুরের আনন্দ ভরা ভাগবতী মন। স্বপ্নের পুষ্পের মত সেই দিবা মনোজ্ঞাত অমৃত সিত কর্ণা রস ধারায় তিনি অভিনীত করেছেন তাঁর সমস্ত আশ্রিত সম্ভানদের। সেই তাঁর পরম আশীর্বাদ। অহৈতুকী কৃপা পরসাদ। সেই মেকল্লন্ত গ্রীচরণ কমল কুটৌ রইল অসংখ্য ভাতি নত অশ্রু সমল মনের সমস্ত সর্ভাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুর ভোমাকে প্রণাম।

—১৬—

“ঠাকুরের নামটী ভালভাবে ক'রে বাও। ভাল মন্দ সব তিনি জানিয়ে দেবেন”।

—স্বামী সত্যানন্দদেব

প্রেমের পথ

ঐক্যনামুদ্রা

খ্রীষ্টাকুর সজানন্দদেব বলেছেন—“প্রেম ভালবাসা কি অত সোজা জিনিস ! Love is death । সমস্ত কিছ্, খেঁচ ঘন হয়ে যাবে, তখনই হবে প্রেম ।” খ্রীষ্টাকুরের এই বেবান্দীর অজনিহিত ভাষাটি বৃক্কতে হলে প্রথমেই ঘন রাখতে হবে—এই প্রেম বলতে ঠাকুর বলেছেন ঈশ্বরপ্রেম, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা । মানুষের ভালবাসা সাধারণতঃ যে কোনও রকম স্থূলবস্তুকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে । আর ঈশ্বরতত্ত্বটি সমস্ত স্থূলবস্তুর প্রাণদত্তা হলেও, সেটা সুকৃষ্টি-সুক্ষ্ম তত্ত্ব । তাই সেই অদেবা ভাবদ্বারাটিকে ভালবাসা যে কত কঠিন, সেটা সকলেই বুঝতে পারে । অথচ সেই পরম তত্ত্বটিকে সম্পূর্ণরূপে বাণ দিয়েও আমরা চলেতে পারি না । অজ্ঞাতসারে তাঁর অভিস্রুকে আমরা প্রতিমূর্ত্তে স্বীকার করে নিই । কিন্তু শূদ্র স্বীকার করা আর ভালবাসা—এ দুটোর অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা । আমি ঈশ্বর বিশ্বাসী—অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন, তিনি বিশ্বনিরাক্তা, আমাদের জীবনমন্ত্র প্রতিটি মূর্ত্তে তাঁর ইচ্ছার নিরূপিত হচ্ছে—এই বিশ্বাস । এ বিশ্বাস আবার বিশেষে অস্পষ্টতার প্রায় সকলেরই আছে । অবশ্য ঈশ্বরের অভিস্রু সকলেরই বিশ্বাস আছে—এ কথা এ যুগে বলা একটু মূশ্কিল । কারণ আধুনিক যুগের আধুনিকতার খাঁটরে অনেকই নিজেকে ঈশ্বর অবিশ্বাসী বলেই প্রচার করতে ভালবাসেন । ভদ্ৰ আমরা একথা জোর করেই বলবো যে, ঈশ্বরে পুরোন্দুর অবিশ্বাস করা পূর্ব্বই কঠিন । ও কথাটা করার জন্য বলা—হয়তো বা ভতকমূলো নৈটিক শৃংখলাকে বাণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে । বাইহোক এখানে প্রসঙ্গ অন্য । এ প্রদেশে আমরা ঈশ্বর বিশ্বাসীদের নিয়েই আলোচনার অবতারণা করছি । পুণ্ডেই বলা হয়েছে, ঈশ্বর বিশ্বাসীর মধ্যেও আধারের প্রভু আসে । অর্থাৎ বিশ্বাসের গভীরতা যে আধারে বসে বেশী, সেখানে ঈশ্বর প্রীতি বা ভালবাসা ডতখানি জমাট । তবে এও ঠিক ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ ভালবাসা ধর্ম্মরাজ্যে উন্নীত অনেক সাক্ষ-সাক্ষ্যকারী হতে পারে, কিন্তু কথামতে বর্ণিত বা বৈকল্যময় বর্ণিত প্রেমতত্ত্বটি কয়েকটি চিহ্নিত আধারেই প্রকাশিত হয় । সেইজন্য ঈশ্বরপ্রেমের বিকাশের ক্ষেত্রেও আধারের প্রভটা বড় হয়ে ওঠে ।

ঠাকুর বলেন—“Love is death.” তবে কি প্রেমের মধ্যে আনন্দ বলে কিছুই নেই । প্রেম কি একটা ধ্বংসের প্রতীক, যার জন্য ঠাকুর প্রেম আর মৃত্যুকে একটি সম্মুখের রেখারিত করলেন ? না, তা নয় । প্রেমের অন্তর্ভুক্ত মৃত্যু কথাটি আত্মত্যাগের একটি পরম প্রতীক । এ মৃত্যু মানে সাময়িক উচ্ছ্বাসে আচ্ছন্নন নয়, নিজের সমস্ত স্থূল কামনা-বাসনা অহংকারকে বিলুপ্ত করে প্রেমাম্বুদেবের চরণে আত্মনিবেশন । ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রেমের কথা বলতে গিরে বলেছেন এই একই কথা—তোমরা প্যাম্ প্যাম্ করো গা, প্রেম কি সোজা জিনিস ! এই প্রেম বার হার তার জলম ভুল তো হবেনী, নিজের সেই যে এত প্রিয় তা পবীত্ৰ ভুল হয়ে যাবে । শ্রীরামকৃষ্ণের এই একটি উপমাতেই পরিমুগু হলে উঠেছে প্রেমের সঙ্গে যে মৃত্যুর সম্পর্ক, সে মৃত্যুর অর্থ কি ? সাধারণভাবে ভালবাসার সঙ্গে একটা দৈহিক সম্পর্কের কথা ম্যজাবিকভাবেই ওঠে । ঈশ্বর প্রেমের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হতে না । ভদ্ৰ এবং ভগবান—এই দুটি রূপ আলাদা হয়েই সেবা মের ভাঁড়র জগতের । তা না হলে প্রেম কথাটির অর্থই বোকা বার না—অর্থাৎ একজন প্রেমিক, অপরজন প্রেমাম্পদ এক এটিও লক্ষণীয় যে, ভদ্ৰ কোনাবিনই ভগবানের সঙ্গে এক হতে চায় না—বৈতভাবে রাখতেই চায় । কথামতেই ভাষায়—“চিনি হতে চায় না, চিনি খেতে চায় ।” কিন্তু এই যে বৈতভাবে আশ্রিত ভক্তের সেই, এটি কিন্তু জাগতিক দৃষ্টিতে রক্তমাংস গড়া স্থূল মানবীর সেই হলেও, সাধারণ মানুষের মত ভোগবাসনা-মোহে আড়িত স্থূল সেই

নয়। বৈকম শাস্ত্রের ভাষার এবং কথামৃতের ভাষার ভগবৎ প্রেমিকের স্থূল দেহও চিস্তার বেহরুপেই প্রকাশিত। লৈবভাব সেখানে কিস্ত্যাত্তও নাই। স্থূল জগতের যে ভালবাসা, সে ভালবাসার কারণ বৃদ্ধকেই সেবা বাৎ—যত গভীরই হোক, না সে ভালবাসা, তার মধ্যে স্বার্থপর কিছু না কিছু আছেই। শূন্য তাই নয়, তার সঙ্গে আছে মোহ এবং আত্মবৃত্ত। কঠি হতে মানুষ পর্যাণ্ড সগাই ভালবাসার বন্ধনে যেমন বাঁধা, তেমনি মোহবৃত্ত স্বার্থের বন্ধনেও বাঁধা।

সাধারণভাবে স্থূল দেহে বৃত্তক্ষণ থাকে, ততক্ষণ নিজেও সম্পূর্ণরূপে বাদ দিবে অপরকে ভালবাসা বৃৎই করিল। কারণ বর্তমান মানুষ বাঁচে ততদিন নিজের সূন্য, নিজের বেদের প্রয়োজন—এগুচ্ছিক তো অস্বীকার করতে পারে না। তাই ভালবাসার বস্তুসূচিও হয় স্থূল অর্থাৎ নিজের স্বকরম চাহিদা বা প্রয়োজন মেটাবার আধারস্বরূপ। তাই স্থূল ভালবাসার মধ্যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভালবাসা বিরল বলাই চলে। শূন্যরাজ্যও ঈশ্বর বিশ্বাসী ভক্তের মধ্যে ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভালবাসার দৃষ্টান্ত বৃৎই কম দেখা যায়। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে ভালওমানি কিছু প্রতিক্ষেপ্তে জাগতিক চাহিদার স্থিতি বাড়িরেই রাখি। তাও ভাল, কারণ কিছুটা আপন ভেবে পিতামাতা বোঝেই তাঁর কাছে হাত পাত। এটাও ভগবৎ প্রেমেই একটা ছোট স্থূল প্রকাশ—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রেমের পূর্ণ পরিণতি একে বলা চলে না। এই কারণেই কথামতে শ্রীমদ্ভক্তসেব ভক্তিরাজ্যে জীবের কোনও অবধি গতি সেটীর উপমা দিলেছেন। বলেছেন—নিষ্ঠার পর ভক্তি, ভক্তির পর ভাব, ভাবের পর মহাভাব বা প্রেম—এই ভাব অবধি জীবের গতি। মহাভাব বা প্রেম মানুষের হয় না। এই মহাভাব বা প্রেম হয়েছিল রামায়ণীর, এই প্রেম হয়েছিল শ্রীগোরাঙ্গের। বলেছেন, ঈশ্বরকোটির প্রেম হয়, জীবকোটির হয় না। জীবকোটির হয় না, এর কারণ আর কিছুই নয়—সম্পূর্ণরূপে স্থূল স্বর্জন না হলে সূক্ষ্মাত্মিক ভগবৎ-র চিস্তার রূপের প্রতি পূর্ণ প্রেম হয় না। ঈশ্বরকোটি অবতারসূত্রে বা মহাপুরুষ বলে বরা চিহ্নিত, তাঁরা আসনে ভক্তবৎসলকেই জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সাধারণ মানুষের স্থূল চাহিদাকে আবার নিশ্চয়ে ভগবৎবৃত্তী করতে। তাই তাঁরা প্রেমের পরাক্রান্ত রূপেই প্রকট হন। বন্দাবনলালার রাবণার প্রমুখ গোপিনীদের যে প্রেমের কথা আমরা শাস্ত্রমুখে পাই, সে ঈশ্বরপ্রেমের অনুভূতি সাধারণ মানুষ ধারণ করা তো পূরের কথা, ধারণাই করতে পারবে না। সেহেতুই উচ্ছন্ন না উঠলে এ প্রেমও আশ্বাসন করা যায় না। রাধারানী বা শ্রীগোরাঙ্গের সেহে যে সব প্রেমবিকার প্রকাশিত হ'ত, সেগুলি তাঁদের লীলার সাধারণ দর্শনমাত্র করেছে, উপলব্ধি করতে পারেন। সেহে অনুভূতির বাইরে এই প্রেম আশ্বাসন হয় বলাই এই প্রেমের আবেশ প্রেমিক তার প্রেমামৃতের সঙ্গে বিভি একাত্তার বেহ জ্ঞান বিরহিত হয়ে ভাবে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। শ্বেদ-পুলক-কম্প আদি ভট্ট সাত্ত্বিক বিভাবগুলি মাত্র তার মোহে প্রকাশিত হয়। এই পূণ্য প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হলে কোনও জাগতিক চাহিদা তো থাকেই না, কোন সৈহিক চাহিদাও থাকে না। বার জনা বন্দাবনে রাসলীলাটিকে বলা হয় অপ্রাকৃত লীলা। প্রাকৃত জগতের যে প্রেমানুভূতি, সে অনুভূতি এখানে নেই, অহে ভক্ত ভগবানের চিস্তার সেহে এবং জগতের মোহাতীত পরমাধিক অনুভূতি, যা মূখে বলা যায় না। শূন্য স্বক-আশ্বাসনই আশ্বাসন করা যায়। যে ভক্তসত্তা ঈশ্বরপ্রেমে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত তাঁর কাছে এই ভক্তবাসের সেহ অনেক সময় ভাসব মিলনের বাগানস্বরূপ মনে হয়। তাই নিম্ন সেহের প্রতি ভাসব কোন আশঙ্কই থাকে না। কখনও যদি যোগ—যে সেহের প্রতি আসক্তি নাই সেই সেহকেই কোনও সাংস্ক-সাত্ত্বিকা কোনও সমস্ত হয় কয়েন, সাজায়েন, তখন বৃদ্ধ হ'বে সেটোও দিব্যার্থিকা প্রেমেরই একটি প্রকাশ অর্থাৎ সে সেহেও তাঁরা তখন জড়সেহ বলে সেহেছেন না, সেহেই চিস্তার সেহরূপে, ভগবৎ বিলাসের ক্ষেতরূপে। তবে সাধারণ মানুষ এ প্রেম-বৈচিত্র্যের প্রকাশ বৃদ্ধতে পারে না। তাঁর সহানুভূতি এই প্রেমের কথাই বলেছেন। জড় সেহের মোহ আসক্তি, স্থূল চাহিদা, বান্দা কৃচ্ছা, এইগুলির মত্ভা না উঠলে পূর্ণ ঈশ্বরপ্রেম লাভ করা যায় না। কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এখন তার পূর্ণ বিদ্যমানস্বরূপ নয়, তখন তাকে সে আবেশ শেহিতে অজ্ঞতা কিছুটা স্বেতা করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ এই ঈশ্বরপ্রেম জাতির উপায় বলেছেন—“সিবারাতি ঈশ্বরচিন্তা কর, অন্য চিন্তা বতস্বর সম্ভব কোর না। মৈনশিন যে সব চিন্তার প্রয়োজন তা করবে তাঁরই মাধ্যমে।” বলেছেন—“সর্বশ সব কাজে তাঁকে দর্শন করবে, অপরাধে ভাবব কথা বলবে—এটা ধুই উপকারী! স্বপ্ন সবস্ত অস্ত্রকরণ অবিহিন্ন ধারার করে পড়ে ঈশ্বরে, স্বপ্ন অর্থ নাম বা বশ অশ্বকবের সমস্ত থাকে না, স্বপ্ন ঈশ্বর ছাড়া অন্য বস্তু চিন্তা করার সমস্ত থাকে না, তখন জোয়ার প্রবাহে আসবে সেই অসীম কিম্বদন্তি প্রেমের আনন্দ।” এই প্রেমানন্দের প্রাথমিক অবস্থা হচ্ছে ভক্তি বা সাধারণ মানবের পক্ষে লাভ করা কিছুটা সম্ভবসাধ্য। সেই ভক্তি লাভ হর প্রাণতত্ত্ব মহাপুরুষের সম্ভাব্যতা বা তাঁর কল্পণালাভে। নারদীয় ভক্তিসূত্রে আমরা পাই “মহাপুরুষস্য মহাব কৃপারৈব।” কিন্তু এই মহাপুরুষ-সঙ্গও তো দুর্লভ! নেকথাও নারদীয় ভক্তিসূত্রে আছে যে, মহাপুরুষসঙ্গ লাভ বা তাঁর কৃপালাভও হয় ভগবৎ কৃপার। তাই আমরাও কাছে সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে প্রার্থনা। ঠাকুর সত্যানন্দসেব তাঁর লেখনীতে একথা বারবার বলেছেন যে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে—“তুমি আমাকে তোমার দিকে এগিয়ে নিয়ে চল। সে পথে বাবার জন্য বা প্রয়োজন সব জুটিয়ে দাও, এমন কি যে তাঁর তুচ্ছ জোমাকে পাওয়া যায় সে কৃপাও তুমি জাগাও।”

—ঃঃ—

মহাভারতের জন্মকথা

[নৃত্যানাট্য]

১ স্বপ্ন বুড়ো ।

[রাজা জম্বেজয়ের রাজসভা ।

পার মি, অমাত্য ও সভাসদগণ নিজ নিজ স্থানে আসীন। বৈতালিক এসে সদরীতে রাজা জম্বেজয়ের প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন ।

[বৈতালিকের গান]

জর জর রাজা জম্বেজয় ।

পাণ্ডবের কুল ধনা, নাহি করু কর ।

অমাত্যের রাজা রাখিয়াছ দ্বন্দ্ব—

তব জর গান বাজে নব সুন্দর—

কৃষ্ণাঙ্কুর আশিশংখ্য সবা গৌরবম্বর

জর জর রাজা হিন্দুনাগর্ভ, জর হে জম্বেজয় ॥

[বৈতালিকের গান শেষ হলে পুরোাসনায়ের মঙ্গল লক্ষ্যে উঠল । সঙ্গে সঙ্গে নটকীবিশেষের নৃত্য গীত আরম্ভ হল]

[নটকীবিশেষের নৃত্য-গীত]

মঙ্গলকামের মধুর ধ্বনি ।

সেকতার শূভাশিষ্ট পরাণে গণি ।

হরষিত কিংগেরা কাননে গাহে,

এই নব মধুমাসে কাহারে চাহে ?

সদাশিব মন্দ মন্দ কোন্ কথা কর ?

মৃগয়ার কাল এলো ফাগুন বাসে

মন উৎসাহে আশ কাহারে আসে!

কে রূপসী দীপ জ্বালি অজানারে চায়

গুজনে নবদ্বারে নবগান গায় ।

শেষ রাতে স্বপ্নদেতে বেঁধে জেগে রয় ।

[নৃত্যের মধ্যে নটকীবিশেষের প্রস্থান । সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে তোরণ ধারে ভেরী বেজে উঠল ।

মৌসারিক প্রবেশ করে নত হয়ে রাজাকে প্রণাম জানাল]

সৌবারিক ॥ মহারাজ জ্যেষ্ঠর, মহার্কবি কৃষ্ণ বৈপারন ব্যাস হস্তিনাপুরীর রাজপুত্রীর তোরণ ঘারে সমুপস্থিত ।

জ্যেষ্ঠর ॥ মহার্কবি ও ঋষি কৃষ্ণ বৈপারন ব্যাস আমার পুত্রীর ঘারে উপস্থিত । আজ আমার কী সৌভাগ্য ! দাদার সন্তাষণ জ্ঞানিরে মহর্ষিকে রাজসভার নিরে এসে ।

[সৌবারিকের প্রস্থান]

জ্যেষ্ঠর ॥ মহামাতা, আমার পূর্বপুত্রবংশের পুণ্যফলেই আমরা প্রতাহ কৃত দেবর্ষি-মহর্ষিদের চরণ-বন্দনা করবার সুদুল্লভ সৌভাগ্য লাভ করছি । আজ হস্তিনাপুরে মহার্কবি ও ঋষি কৃষ্ণ বৈপারন ব্যাস পদখলি দান করেছেন । আজ আমার রাজ্য ও রাজধানী ধনা হল ।

মহামাতা ॥ সে কথা সত্য মহারাজ জ্যেষ্ঠর । মহার্কবি কৃষ্ণ বৈপারন ব্যাস সহসা কোনো লোকালয়ে গমন করেন না । তিনি নিজস্ব বসবাস করে সর্বদাই নব নব শ্রোতৃ আর কাব্য রচনার আশ্বিনায় থাকেন । আজ তিনি হস্তিনাপুরে সমুপস্থিত । আমাদের জীবন আজ ধনা । আমাদের রাজধানী এই হস্তিনাপুরে আজ সভাই পবিত্র হল ।

[সৌবারিকের সঙ্গে কৃষ্ণ বৈপারন ব্যাসের প্রবেশ । রাজা, অমাত্য, ও সভাসদগণ দণ্ডায়মান হয়ে মহর্ষিকে স্মরণ সন্তাষণ জানালেন]

ব্যাস ॥ হস্তিনাপুরের মহামাতা, আমি আসতে আসতে আপনার কথা শুনছি । শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি পান্ডবদের পুণ্যময় রাজ্য । সেই রাজ্যে আগমন করে আমিও নিজেকে ধনা মনে করছি । এই রাজ্যের প্রতিটি শ্রীলক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের পদযুগে পবিত্র । হস্তিনাপুর আর কুরুক্ষেত্র আজ মহা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে রাজ্য জ্যেষ্ঠর ।

জ্যেষ্ঠর ॥ হে মহর্ষি কৃষ্ণ বৈপারন ব্যাস, আপনার শ্রুত আগমনে আমরা সকলেই ধনা । হস্তিনাপুরের অমাত্য সীতা কথাই বলেছেন । আপনি আসন গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করুন ।

ব্যাস ॥ রাজ্য জ্যেষ্ঠর, তোমার বিনয়ের আমি পরম প্রীত হয়েছি । আমি হিমালয়ের তপস্যা করতে আর নব কাব্য রচনা করতে রওনা হয়েছি । ডাবলাম, একবার হস্তিনাপুরে পরিভ্রমণ করে তার নবীন রাজ্যকে দেখে যাই—

জ্যেষ্ঠর ॥ এত আমার পরম সৌভাগ্য মহার্কবি কৃষ্ণ বৈপারন ব্যাস । আমাকে আশীর্বাদ করে আপনি ধনা করুন । পশ্চিম অর্ধে আমি আপনাকে রাজপুত্রীতে অভ্যর্থনা করে নিই । আপনি আসন গ্রহণ করুন—

[মহর্ষি ব্যাস আসন গ্রহণ করলে একজন পরিচারিকা রাজ্যের দ্বারে পান্য-অর্থ তুলে দিল । রাজা সেই স্রণপালা মহর্ষির চরণতলে রাখা করলেন]

জ্যেষ্ঠর ॥ মহার্কবি ব্যাস, আপনার চরণতলে স্পর্শ করে আজ আমি ধনা আমি কৃত-কৃতার্থ । কিন্তু মহর্ষি, একটি প্রশ্ন সব সময়ে আমার মনে জাগ্রত হয় । আপনি যদি অস্তর দান করেন, তবে আপনার সমীপে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করে আমার কৌতূহল চরিতার্থ করি—

ব্যাস ॥ বেশ ত মহারাজ জ্যেষ্ঠর, আপনার মনে যদি কোনো প্রশ্ন জেগে থাকে, তা হলে আপনি অসম্বাদে সেই কথা উত্থাপন করুন । আমি সাধ্যানুসারে তার উত্তর প্রদান করার চেষ্টা করবো ।

জ্যেষ্ঠর ॥ আচ্ছা মহর্ষি, আপনি শুধু মহাভারতের বৃকে উপস্থিত থাকতে—কুরুক্ষেত্রের এই সব ধূসরী সমর কথ হল না কেন ? এই কথা চিন্তা করলে আমার কিষ্করের পরিশ্রমী থাকে না ; আপনার অলৌকিক প্রভাবে কি সেই ধূসরের গতি রুদ্ধ হতে পারত না ?

ব্যাস ॥ মহারাজ জ্যেষ্ঠর, ঠিক এই মন্তব্যই আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবো না । কিন্তু আর একটি মন্তব্যকে সংবাদ পরিলেখন করছি, আপনি মনোবেগ দিয়ে ভ্রমণ করুন ।

জ্যেষ্ঠর ॥ আদেশ করুন মহর্ষি ব্যাস—

ব্যাস ॥ শুনুন মহারাজ জ্যেষ্ঠর, আগামীকাল প্রভাতে

আপনার তোরণদ্বারে একটি সুসজ্জিত রথ আগমন করবে। কে সেই রথ প্রেরণ করেছে, তার কোনো স্থানান পাওয়া যাবে না। আপনাকে আমি অন্বেষণ করছি। আপনি সেই রথে আরোহণ করবেন না। যদিও বা সেই রথে সমাসীন হন,—অথ সেই রথে চড়ে কখনো মন্দির বহির্গত হবেন না। আমার নিষেধ না শুনেন যদি আপনি মন্দির বান, তবে অন্নপূর্ণার ভেতর কোনো রাজপুত্রীতে আসন্ন গ্রহণ করবেন না। আর যদিও সেই পুরীতে অবস্থান করেন, তা হলে কোনো সুন্দরী কন্যার মূখের দিকে তুলেও দৃষ্টিপাত করবেন না। কর্ণবক দৌর্ভাগ্যে যদি বা আপনি সেই কন্যার মূখের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, কিন্তু কখনই তাকে বিবাহ করবেন না। যদিও বা অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়, তা হলে কিম্বদেই সেই কন্যাকে রাজপুত্রীতে নিয়ে আসবেন না, আর তাকে প্রধানা মহিষীর স্থানান দিবেন না। আজ এই কথা হল বিদার গ্রহণ করছি। প্রসঙ্গের উত্তর যথাসময়ে পাবেন।

[ব্যাসদেবের প্রস্থান]

জন্মেজয় ॥ কি আশ্চর্য! ত্রিকালজ্ঞ কবি কৃষ্ণ বৈশ্যরূপে ব্যাস এখন কৃতকর্মে গটনার ভবিষ্যৎ সন্ভাবনার কথা এমনভাবে সাজিয়ে বলে গেলেন,—যার কিম্বদ-বিমর্শও আমি অবগত নই। সত্যি, কলকালের জন্যে আমরা পুরীতে পদার্পণ করে মহামায়া ব্যাসদেব এক প্রহেলিকার সৃষ্টি করে গেলেন। মহামায়া, সভাসপ-গণ, অমাত্যগণ, আজ আমার মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আজকের মতো সভার কার্য এইখানেই সমাপ্ত হোক।

[রাজা জন্মেজয়ের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যের মতো সভা ভঙ্গ হল। বাইরে সমাপ্তি ভেরী বেধে উঠল]

॥ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ॥

[পূর্বদিনের মতো সেই রাক্ষসতা। মহামায়া ও প্রধান সেনাপতি উত্তেজিত ভাবে কথাপন্থন করছেন।]

মহামায়া ॥ ত্রিকালজ্ঞ কবি একেই বলে—

সেনাপতি ॥ ব্যাপারটা কি খটখট—আমার খেলে বলুন ত' মহামায়া, আমি আর কিছতেই কৌতুকে নমন করতে পারছি না।

মহামায়া ॥ ত্রিকালজ্ঞ কবি ব্যাসদেব ত' ঘোষণা করেই চলে গেলেন। আমরা আগাগোড়াই কিছটাকে কবির পরিহাস বলে মনে করেছিলাম।

সেনাপতি ॥ তারপর ?

মহামায়া ॥ তারপর গতকাল প্রত্যুষে সভাই এক সজ্জিত রথ এসে উপস্থিত হল—রাজপুত্রীর যোগে যাবে। কে সেই রথ প্রেরণ করেছেন—সারথীর কাছ থেকে কোনো স্থানান পাওয়া গেল না! মন হল, সারথী মৃক ও বধির। তার কাছ থেকে রথের অভিযাত্রের কোনো সন্ধানই মিলল না। কিন্তু রাজা জন্মেজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই রথের ওপর উঠে বসলেন।

সেনাপতি ॥ আপনারা জেনে শুনতে মহারাজকে নিষেধ করলেন না ?

মহামায়া ॥ নিষেধ করি নি? পুনঃ পুনঃ তাঁকে বারণ করছি—সেই অজানা-অচেনা সারথীরা রথে আরোহন করতে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, আমার সেই নিষেধ বাক্য যেন মহারাজের কানেই প্রবেশ করল না!

সেনাপতি ॥ আশ্চর্য।

মহামায়া ॥ সভাই আশ্চর্য সেনাপতি!

মহামায়া ॥ মহারাজ জন্মেজয় আমাদের সকলের সমবেত অনুরোধকে অগ্রাহ্য করে দিয়ে সেই নির্ভর্য সারথীকে আদেশ করলেন দ্রুতবেগে রথ চালাতে! সারথী এদিকে কোনো কথা শুনতে পার না, কিন্তু মহারাজের আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রথ চালাতে শুরু করেছে অশ্রু হতে গেল।

সেনাপতি ॥ কি আশ্চর্য! আপনি মহারাজের সঙ্গে কোনো রকমী পাঠালেন না ?

মহামায়া ॥ রকমী পাঠাই নি? আপনি বলছেন কি সেনাপতি? দ্রুতসামী চারজন বিখ্যাত অস্ত্রায়েহী রাজরক্ষীকে আমি সঙ্গে সঙ্গে রাখাকে অনুসরণ

করতে বস্লাম । কিন্তু সেই প্রহেলিকাময় রথ ফেন রাজাকে নিয়ে ছোবার অশুশা হয়ে গেল । আর সেই রথের কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না । চতুর্দিকে আমি গুরুতর প্রেরণ করছি । কিন্তু আজও পর্বত কোনো সন্ধান পাইনি !

সেনাপতি ॥ দাঁড় মহামাতা—এ এক কিসের ব্যাপার ।
মহামাতা ॥ আত্মন সেনাপতি, আমরা পরামর্শ করি, এখন আমাদের কি করা প্রয়োজন ।

[একন সমস্ত নেতৃবৃন্দ তুরীভেরী বেজে উঠল । চারদিকে কোলাহল শোনা গেল,— “মহারাজ জন্মেজয় ফিরে এসেছেন ।” “জয় মহারাজ জন্মেজয়ের জয়”]

[নব বিবাহিতা পত্নীসহ রাজা জন্মেজয়ের প্রবেশ]
জন্মেজয় ॥ হাঁ মহামাতা, হ্যাঁ সেনাপতি, আমি আজ রাজধানীতে ফিরে এলাম ।

মহামাতা ॥ আপনি বিবাহ করেছেন মহারাজ ?
জন্মেজয় ॥ হ্যাঁ, মহামাতা, আমি বিবাহ করে সন্ধ্যাক ফিরে এসেছি—

মহামাতা ॥ এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করে আপনার বিবাহ সমাধা হল মহারাজ ?

জন্মেজয় ॥ কাঁচ বাতা কখনো নিষ্ফল হবার নয় । মনে করুন মহর্ষি বেদব্যাসের সেই ভবিষ্যৎবাণী । তিনি যা-যা বলেছিলেন একবারে অন্ধের অন্ধের মিলে গেছে । চেষ্টা দেখুন আমার নব পরিণীতা রাণীর দিকে । এর ভুল্য রূপসী নারী আপনি সমস্ত ভারতবর্ষ অনুসন্ধান করেও পাবেন না । আমি ঘোষণা করছি,—ইনি হবেন আমার প্রধানা মহিষী । প্রধানা মহিষী, তুমি আমার ব্যবসার্যে রাজসিংহাসনে আসন গ্রহণ করো ।

[সঙ্গে সঙ্গে প্রলম্ব গবেজে উঠল । পুরোজনারা এসে পেশোয়ারি করণ করল । তুরীভেরী দামামার শব্দে রাজসভা প্রকম্পিত হয়ে উঠল । একমল নর্তকী নৃত্য-পাতিত করতে করতে রাজসভার প্রবেশ করল]

[নর্তকীদের নৃত্য-পাতিত]

নব বধু এসো—নব আভরণে সজ্জায় ।

নব রূপে জাগে—নবরত্ন সম সজ্জায় ।

রত্নীল কুসুম শোভিত হোয়ার অন্ধক—
কল্লভুল-লোখা নরনে পরাণো কল কে ?
সুখান কুসুম আজি যে বড়ানো লগায় ।

এসো নববধু, এসো এই নব ভবনে —

আজি মনুকথা তাই বাকি মনু পয়নে !

আলতার রাঙা তোমার গু দুটি চরণে—

কত আলি কুল মার্গিছে আপন মরণে !

একী শিহরণ জাগিছে রক্তে—হৃৎকার ॥

[নৃত্যের তিসমার নর্তকীরা প্রস্থান করল]

মহামাতা ॥ জয় মহারাজের জয়,—জয় মহারানীর জয় ।

সকলে ॥ জয় মহারাজের জয়,—জয় মহারানীর জয় !

জন্মেজয় ॥ তোমাদের সকলের সাপক অভ্যর্থনা আমি আজ প্রীত । তোমাদের কলাগ হোক,—রাজের শ্রীর্ষি হোক ।

[সহসা নেতৃবৃন্দ ভূব নিবাল । দৌবারিকের প্রবেশ]
দৌবারিক ॥ মহারাজ জন্মেজয়, তোরগবারে মহর্ষি কবাস্ত্র সম্প্রদিত ।

জন্মেজয় ॥ মহর্ষি কবাস্ত্র হস্তিনাপুরে সমাপ্ত । আজ আমার কি সোভাশা । আজ এই শব্দ হৃৎকোঁ রাজ্যের প্রধানা মহিষী বৎস রাজসভায় শ্ৰুভাগমন করেছেন, সেই সমস্ত মহর্ষি কবাস্ত্রের আগমন,—রাজ্যের সর্ব প্রল সূচনা করছে । দৌবারিক, তুমি শাস্ত্র মহর্ষি কবাস্ত্রকে অভ্যর্থনা করে রাজসভার নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করো—

দৌবারিক ॥ বধা আজ্ঞা মহারাজ । [প্রস্থান]

জন্মেজয় ॥ অমাত্যগণ, সভাসদগণ, আমি আজ সভাই আনন্দিত । মহর্ষি কবাস্ত্র আমাদের আশীর্বাদ করবেন, আমরা উত্তরে সার্বক হয়ে উঠব । আমাদের উত্তরের মীন আজ ধনা হবে ।

[দৌবারিকের সঙ্গে মহর্ষি কবাস্ত্রের প্রবেশ ।
কবাস্ত্রের আকৃতি অতি কলাকায় । ভদ্রপরি
হরিরের অতো তাঁর দুটি শৃং ছিল । হান্দের

এই বীভৎস আকর্ষিত দেখে নতুন মহারাণী উচ্ছ্বাস
ক'রে উঠলেন ।

মহারাণী ॥ এই মহাবি' কবিশাস্ত্র ? এর লোকালয়ের মূখ
দর্শন না করিয়ে হারিণের মতো কনই বাস করা
উচিত ছিল ।

কবিশাস্ত্র ॥ [মহারাণীর পরিহাসে সহসা উত্তোষিত হয়ে ।
মহারাজ জন্মেজয়, আমার দেহ কলাকার স্থলে আমি
আপনার মহারাণীর উপহাসের পাথ নই । আর
আপনি পাণ্ডবদের বংশধর হয়েও মূর্খ কবির এই
অপমান নীরবে সহ্য করছেন । আমি আপনাকে
অভিশাপ দিচ্ছি মহারাাজ, এই মূর্খত্বে' আপনি
ব্যাপ্ত হতে পড়বেন । আপনার দেহ ঘন ঘন
কাম্পিত হতে থাকবে । যে যৌবনের উন্মাদনায়
আপনার মদ্রিষী আয়াকে উপহাস করতে সাহস পান,
সেই যৌবন-চাক্ষুস আপনাকে চিরন্তনে মূর্খ হয়ে বাবে ।
[সঙ্গে সঙ্গে কবি কবিশাস্ত্রের অভিশাপে মহারাাজ
জন্মেজয়ের দেহ ঘন ঘন কাম্পিত হতে থাকল ।
তিনি বালকুলে ন্যাস করণ করে উঠলেন ।]

জন্মেজয় ॥ মহাবি' কবিশাস্ত্র, আপনি ক্রোধ সম্পন্ন করুন ।
আমার নব পরিণীতা পত্নী গ্রামে পালিতা । সে
আপনা মতো কবির গৃহস্থ উপলক্ষ্য করতে পারেনি ।
এই চল্যা ব্যালিকা কে আপনি কমা করুন । মহাবি'
কবিশাস্ত্র, যদিও বলবায় মূখ নেই, তবু পাণ্ডবের
বংশধর আমি, এই নিবোধ রাজার নব' অপরাধ কমা
ক'রে আপনি তাকে নিজের চরণে বাস্তব দান করুন ।

কবিশাস্ত্র ॥ মহারাাজ জন্মেজয়, আপনার কবির কনই আমি
প্রথম পরিচয় লাভ করেছি । কিন্তু কবিশাস্ত্র ত'
বার্ষ' হবার নয় । কি ক'রে আপনি অভিশাপ
মুদ্র করেন ?

[সহসা মহাকবি কৃক বৈশ্যদন ব্যাসের প্রবেশ]

জন্মেজয় ॥ মহাবি' কৃক বৈশ্যদন, আপনি এ সময় এখানে ?
ব্যাস ॥ আমি ঠিক সময়ে ঠিক ব্যরণায় উপস্থিত মহারাাজ !
প্রথমেই আমার ভিজ্ঞান, আপনি আপনার প্রবের
উত্তর প্রেরছেন ? আপনার প্রশ্ন ছিল, আমার প্রত্যব

দিয়ে আমি কৃকক্ষেত্রের নব' ধ্বংসী সময় কথ করতে
পারলাম না কেন ? আমি আপনাকে অতি সাধারণ
একটি অনুরোধ করেছিলাম । সেই অনুরোধ
অবহেলা ক'রে আপনি বিবাহ করলেন । আর তাই
কলে আপনি' অভিশাপ গ্রস্ত হয়েছেন । তাহলে
আপনি অতি সহজেই অনুমান করতে পারেন যে,
কৃকক্ষেত্রের স্বত্বের পূর্বসূরী রাজনীতির জটিল
আবেগে আমার শান্তির বাণী কোন দূর গমনে বাপ
হয়ে মিলিয়ে গেছে ।

জন্মেজয় ॥ আমি আমার প্রম উপলক্ষ্য করতে পেরেছি
মহাকবি ব্যাস । আপনি আমাকে রক্ষা করুন ।
কবি কবিশাস্ত্রের অভিশাপ থেকে আপনি আমার
মুক্ত করুন—

ব্যাস ॥ মহারাাজ, কবিশাস্ত্র কখনো নিশ্চল হবার নয় ।
আপনি মহাবি' কবিশাস্ত্রের শরণাগত হোন । একবার
তিনিই তাঁর অভিশাপ থেকে আমাকে মুক্ত করতে
পারেন ।

জন্মেজয় ॥ মহাবি' কবিশাস্ত্র, কমা মতেই লক্ষণ । আপনি
আমার কমা করুন । এই অকাল ব্যাধির হাত থেকে
আপনি আমার বাচান—

কবিশাস্ত্র ॥ শুনুন মহারাাজ জন্মেজয়, আপনার কাতর
কন্দনে আমি অভিভূত হয়েছি । মহাকবি কৃক বৈশ্যদন
ব্যাসের নিকট মহাভারতের কাহিনী প্রবণ করলে
আপনি রোমান্টিক হবেন । আপনি তাঁর শরণাগত
হোন—

[প্রস্থান]

জন্মেজয় ॥ মহামতি ব্যাস, আপনি আমার মহাভারতের
পূণ্য কথা শুনিয়ে আমার আত্মপ্রাণে দানে সহায়তা
করুন । আপনি মহাভারতের মূর্তি আধা । আপনি
আমার পের কৃপাবারী সিদ্ধ করুন কবিশাস্ত্র—

ব্যাস ॥ মহারাাজ জন্মেজয়, তোমার আত্মলতার আমি সত্যই
অভিভূত হয়েছি । ভূমি দণ্ডাঙ্গ পর্ব' মহাভারত কি
সত্যই প্রবণ করতে চাও ? এই পূণ্য কাহিনী শুনতে

দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। আজ আমি শূন্য তোমার
মহাভারতের জন্মকথা শুনিয়ে রাখি।

[ব্যাসের কথার সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য ভালো নিতে গেল।
পিছনের পর্দার উপাসিত হয়ে উঠল, হিমালয়ের পিছনে
বৈষ্ণবের অপরিপূর্ণ দৃশ্য। মেঘদলের সেখানে অবাধ
কিছুই। দেখা গেল, মহাকবি ব্যাস সেখানে উপনীত হয়ে
মহাভারতের জন্মপট্টে সর্বসিদ্ধিযাত্রা গণেশের নাম ধরে
আহ্বান করছেন।]

ব্যাস ॥ গমগমিত গণেশ, কৈলাশবায়ে আছেন কি ?

গণেশ ॥ কে আমার আহ্বান করছেন ?

ব্যাস ॥ আমি মহাভারতের কবি ব্যাস। সর্বসিদ্ধিযাত্রা
গণেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি—

গণেশ ॥ মহাকবি কুমার ব্যাস! আসুন—আসুন
অর্থাৎ—আপনাকে পেয়ে আমি খুশি।

ব্যাস ॥ আমি মর্ত্যের কবি। আপনার সাধের আহ্বানের
যোগ্য নই।

গণেশ ॥ আপনি আপনার কৃষ্ণ ও কাব্য-প্রতিভার সবার
প্রশংসা। বন্দন মহাকবি ব্যাস, আমার কি করতে
হবে ?

ব্যাস ॥ আমি মহাভারত গ্রন্থ রচনা করতে মনস্থ করছি।
আপনি চারি হস্তে লেখনী চালনা করতে পারেন।
তৈব্রুনে এমন সর্ববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত আর সূক্ষ্ম
অনুশীলনকার আর কেউ নেই। তাই আমি আপনার
পরামর্শ গ্রহণ করছি। আপনি এই দারিদ্র্য পালন করলে
আমি মহাভারত রচনার প্রবর্তী হতে পারি।

গণেশ ॥ [এক মুহূর্তে চিন্তা করে]

মহাকবি ব্যাস, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হতে
পারি। তবে আমার একটা সর্ত্ত আছে—

ব্যাস ॥ সিদ্ধিযাত্রা গণেশ, আপনি মহাভারতের অনু-
শীলনকার হতে সম্মত হয়ে আমার কৃতজ্ঞতা করছেন।

এইবার বন্দন আপনার সর্ত্ত—

গণেশ ॥ দেখুন ব্যাসদেব, আমি লেখনী বাহ্যিক। লিখতে
লিখতে একবার লেখনী বন্ধ করলে—আবার আরম্ভ
করতে বেশ কষ্ট হয়। আমি চার হাতেই লেখনী
পরিচালনা করবো। কিন্তু বলতে বলতে আপনি
একবারও বামহস্তে পারবেন না। এই সর্ত্তে যদি
আপনি সম্মত হন, তবেই আমি আপনার মহাভারতের
অনুশীলনকার হতে পারি।

ব্যাস ॥ আমারও একটি সর্ত্ত আছে আপনার কাছে—

গণেশ ॥ খোলা মনে জানিয়ে দিন কি আপনার সর্ত্ত—

ব্যাস ॥ আপনি যা লিখছেন—তার অর্থ সমাজ কল্যাণ না
ক'রে লিখতে পারবেন না। আগে দ্রোণাচার্য্যকে
নেবেন, তারপর লিপিবদ্ধ করবেন—

গণেশ ॥ বেশ কথা ব্যাস দেব, আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত
হলাম—

ব্যাস ॥ তা হলে এই সর্ত্তে আরম্ভ হোক আমাদের এই
মহাভারত রচনা—

তৈব্রুনের লোকের জন্য আমরা সন্তুষ্ট করবো অমৃত
আমাদের কাব্য ভূমিতে—

গণেশ ॥ আমি প্রস্তুত ব্যাসদেব। আমার চার হাতে
লেখনীও প্রস্তুত। আপনি নিজ মূখে আবৃত্তি করে
করুন, আর আমি লেখনী পরিচালনা করি—
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
ব্যাস ভনে, ব্রীণেশ লিখে চলে যান ॥

॥ স্বকবিতা ॥

• মেঘের অভিনয়ের উপযোগী নৃত্য নাট্য।

“এ যুগের ঠাকুর বড় বেশী কৃপাময়। একই করলেই ঠাকুর কৃপা করবেন। এ যুগ
কৃপার যুগ; কারণ, এ যুগে বাইরের চান তিনিই বেশী করেছেন, তাই কৃপাও বেশী
করতে হবে।”

—ঐচ্ছিক সত্যজনক

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা অঙ্কনের ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ ভক্তিব্রত

যে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাপন করতে পারলে পরবর্তীকালে তার সমাদর হয় পরিপূর্ণভাবে। এখন থেকে শতবর্ষ পূর্বে ১৮৬০ সনে ভক্তব্রত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘন্টা তোলার ব্যবস্থাপনা হয়েছিল। শতবর্ষ পূর্বে কলকাতার গোবর্দনসোড়ার বিলাতী কোম্পানী নাম করা ঘন্টোগ্রাহকের ছিলেন। ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় সেই কোম্পানীর অধিনাশ চন্দ্র দাঁ মহাশয়কে সংগ্রহ করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ঘন্টা তোলার জন্য। বাক্ষ্যেশ্বর রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত বেবনেউলের গোবিন্দজীর মন্দিরের চত্বরে পশ্চিমোদ্যে হয়ে আদল গায়ে বসা অবস্থায় ঐ ঘন্টা তোলা হয়। ঐ সময় নিগোটিভ কাঁচখানি পড়ু গিয়ে খানিকটা ভেঙ্গেও গিয়েছিল। সে কারণে অতীতের উত্থানো ছবি সমূহে ঐ অর্ধ-চন্দ্রাকারের দাগ ছিল। ঐ ঘন্টা গ্রহণ উদ্যোগের জন্য ভবনাথ চিরবরণীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থে ভবনাথ অতি উজ্জ্বলভাবে বিবর্তিত। সর্বপ্রথম নরেশ্বর, রাখাল, ভবনাথ বিখ্যাত আছেন শ্রীম (মাতার মশায়)-এর দ্বারা বিবরণ প্রকাশনায়। কথামৃত ২য় ভাগ অষ্টম পরিচ্ছেদ হই ১৮৬৩ সন ১২ই মাঘ মাস স্থান বাক্ষ্যেশ্বর ক্রমে ভক্তেরা গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন! এক একে সকলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ভবনাথকে দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন "তুই আর আর বাস নেই। তোদের দেখেই উপান্ন।"

"ভবনাথ এখনও সন্মোহে প্রবেশ করেন নাই, বরস উনিশ হুড়ি গোরবর্ষ সূক্ষ্মর দেহ। ঈশ্বরের নামে তাহার চক্ষু জল আসে। ঠাকুর তাহারে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখেন।" (কথামৃত ২য় ভাগ পৃঃ ২৪)

এর পরবর্তী ১৮৬০, (৫ই এপ্রিল কথামৃত প্রথম ভাগ পৃঃ ১১১) "নরেশ্বর, ভবনাথ, রাখাল এরা সব নিতাসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি..."

কল্যাণ কদু গৃহে ঠাকুর বসিছিলেন--"নরেশ্বর ভবনাথ, রাখাল এদের খাইলো তাহা হইলে অনেক সাধুক খাওয়ানো হবে..."

কথামৃত বহুস্থানে বহুভাবে ভবনাথ চরিত্র অঙ্কিত আছে। তিনি সুদৃক্য তৌ ছিলেনই, সুগায়কও ছিলেন। নরেশ্বর ভবনাথ যেন এক বৃদ্ধে বৃদ্ধি কুসুম। ক্রমে নরেশ্বরের সঙ্গের ত্যাগী উজ্জ্বল সম্মানসী হয়ে যান কিন্তু ভবনাথ সঙ্গের ত্যাগ করতে পারেন নি। তিনি ছিলেন মাতৃভক্ত। সে কারণে মাতৃ আজ্ঞার তিনি বিরূপ ক'রে সঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন।

ভবনাথের পিতার নাম রাখাল চট্টোপাধ্যায়। ১৮৭৭ সনে ভবনাথের জন্ম হয়। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র সন্তান, এবং ভবনাথের এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল নাম কীরোরামসানী। তাঁদের আদি বাসস্থান ছিল ব্রাহ্মনগর কুঠিঘাট রোডে। পড়াশুনার ভাল ছাত্র। কলেজে পড়ার কালে নরেশ্বরের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় এবং ভবনাথও বি. এ. পাশ করেন। ঐ সময়ে ভবনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সমাবেশে যাত্রাভ্যাস করতেন, এবং গ্রাম সমাজের জ্যাতিভেদের বিরুদ্ধে মত দানে উপনীত জাগ করেন। আর সুদৃক্যের নরেশ্বরের নিকট শ্রীঠাকুরের সৎসংগে শ্রুত ১৮ বৎসর বয়সে ঠাকুরকে বর্ণন করেন বাক্ষ্যেশ্বরে। ভবনাথের অপর গুণ "দুঃসহন"। নিজের জল খাবারের পরসা জমিয়ে গরীব অনাথদের জন্য চাঁদা দিতেন।

তিনি অভাবের সংসারে বাধা হয়ে শিক্ষা বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন। সে সময়ে তাঁকে সাতকীরী অশ্বারহর খল্লাস প্রদত্ত স্থানে কাথোপলক্ষে বাসের কালে, ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হন। পরে অশুদ্ধতার জন্য কখনো মদ্যপন্থ বা কলকাতার ভয়ানকিত যোশাসীপ্ত চরতীর বাড়িতে রামকৃষ্ণ বাস লেনে বাস করতেন। তাঁর দেহতাপ হয় ১:০০ সনের গরু পুণিমার দিনে বাদুড় বাগান সেকেন্ড স্টেশনের বাড়ীতে। ভবনাথের শেষ কৃত্য হয় নিমতলার শশান ঘাটে। তাঁর পিতৃসেবাই মুখ্যায় ও পিতৃদান করেন, কারণ তাঁর এঃমাত্র বন্যায় প্রতিভার তখন বয়স ছিল ৬ বৎসর।

পরবর্তী অখ্যায়—ভক্কর ভবনাথের বিষয় জানবার জন্য অনেক উৎসাহ ক'রে তাঁর বন্যা শ্রীমুক্তা প্রতিভা দেবীকে দর্শনের জন্য চেষ্টা করি ৬২। ৬৮ ইং সনে কলকাতা ভবানীপুরে। তিনি তখন প্রায় আশি বৎসরের বৃদ্ধ। প্রথমদিন সেবা দিতে রাজী হন নি। পরে পরাধর আশ্রমের স্বামী শ্রীমদ্বজীর ব্যবস্থাপনার ১লা ফাল্গুনে তিনি আমাকে সেবা দিতে রাজী হন। সংখ্যা ৭৪ টার ১১ নং বিহারী ডাক্তার রোডস্থ বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা হয়। ঐ অসীতিপরা বৃদ্ধা তখনও বেশ সুস্বাসী সুমিষ্টভাষিনী। তাঁর কাছ থেকে জানলাম, ভবনাথ ১৮ বৎসর বয়সে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করে দর্শনেশ্বর। পারিবারিক বিবরণঃ— ভবনাথের পিতা রামদান চট্টোপাধ্যায়, মাতা ইন্দ্ৰাময়ী দেবী। ভবনাথের স্ত্রী কিংবদন্তী। তাঁর ছির হয় ১১ বৎসর বয়সে।

যে প্রকোষ্ঠে প্রতিভা দেবী আমার সেবা দিরাছিলেন, সেই প্রকোষ্ঠের পশ্চিম দেয়ালে একখানা বড় ছবি। ভবনাথ গড়ানো চোরে উপবিষ্ট। তাঁর পক্ষী কিংবদন্তী তাঁর সামনে ব্লকপরা বসা বালিকা (প্রতিভা)। তিনিই এখন বৃদ্ধা। অপর একখানি ছোট্ট ফটো দেখায়ে, যেখানে, ভবনাথের কাঁধে হাত দেওয়া ছিলো স্বামীজীর। ভবনাথের ঐ ছবিই বড় করে (enlarged) রাখা হয়েছে কাশীপুরে উদ্যান বাড়ীতে যার উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো তোলা হয়েছিল সেই ভবনাথের একমাত্র ছবি ঐ বান।

প্রতিভাদেবী স্বামীজীকে দর্শন করেছিলেন। তাঁদের স্মৃতিতে বেলুড়মঠ থেকে ৫০০ টাকা সাহায্য করা হয়েছিল। কিন্তু মঠের কোন সাহায্য আসেন নি। ভবনাথ ঠাকুরের দেহতাপের কিছু ছাই এনেছিলেন কিন্তু তাঁর মা সে জিনিষ নব কুরোতে নিক্ষেপ করেন। তাতে ভবনাথ মাকে বলছিলেন “আর তোমার মা বলে ডাকব না।” পরে মায়ে ছেলে মিলন ঘটে। প্রতিভাদেবী বেলুড়মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শংকরানন্দজীকে ভবনাথের গ্রুপ ফটো দিরাছিলেন। যা থেকে ভবনাথের ছবি জেরী হয়েছিল। ভবনাথ সম্বন্ধে এইটুকু সামান্য লিখন।

উপাধানঃ কথামত গ্রন্থ কুম্ভসম্বন্ধে সনের প্রথম অগ্রহারণ ১০৬৭ খ্রীমা সারদা এবং প্রথমকারের ডায়েরী।

“নাম ক'রে যাও, ঠাকুরকে ভেবে যাও, পরে দেখবে কৃপা কাকে বলে। বাবসা করতে হ'লে, চাকরি করতে হ'লে কিছুদিন এমনি ঘাটতে হয়, তারপর লাভের কথা—ঐঠাকুর বলেছেন—“নাম কর আর সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর যাতে ঈশ্বরেতে অম্লরাগ হয়।”

—ঐঠাকুর সত্যানন্দ

কথায়ূতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব চিত্র

রমা সুবোধাণাথায়

কথায়ূত প্রকৃত জন্মতেরই সাগর। এই জন্মত সাগরের মধ্যাধিগ হলেন পরম পুণ্যবী শ্রীঠাকুর। তাঁরই জন্মত কখনের মংকর্য বাণীহুপকার “শ্রীম” বা মাখ্যার মলাই। আবার অন্য দিকে চিত্রহুপকারও কটে। আজ থেকে প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে এই পরমভক্ত, একান্ত নিবেদিত প্রাণ “শ্রীম” তাঁর জন্মপদ রূপ মাখ্যারীতে ভক্তবৃন্দ কর্তৃক শ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব পালনের যে চিত্র কথায়ূত পাতায় অন্তর্ভুক্ত রূপে চিত্রিত করেছেন, তা পাঠ্যে পাঠক অন্তর সেই অগোখাকে দেখার রম্যাবলনে ডারিয়ে দেয়। এ যেন এক অনূপম চিত্রভাষা।

প্রভাতে ভক্ত সম্মে—

কালীবাড়ীতে আজ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব— ফাল্গুন শুক্লা ষষ্ঠীরা তিথি, বধবার, ১২ই মার্চ ১৮৮৩ সাল। আজ ঠাকুরের ভক্তগণ সাক্ষ্য তঁরাকে লইয়া জন্মোৎসব করিবেন।

“শ্রীম”র সন্মের ও অনূপম কর্ণনার প্রকৃতিও যেন এই শূভদিনটিতে পরমপুণ্যবীর শূভ আগমন বার্তা ঘোষিত করছে।

“প্রভাত হইতে ভক্তেরা একে একে আসিয়া জুটিতেছেন। সম্মুখে মা তবতাপিনী মন্দির। মন্দির আরতিয় গরই প্রভাতী রাগে নহবত খানার মধুর তানে রোমন্ব চৌকি বাজিতেছে। একে বসন্তকাল, বৃক্ষলতা সকলই নতুন বেশ পরিধান করিয়াছে, তাহাতে ভক্ত জন ঠাকুরের জন্মদিন স্মরণ করিয়া নৃত্য করিতেছে। চতুর্দিকে আনন্দের সমীকণ বহিতেছে। মাখ্যার গিয়া দেখিতেছেন, ভবনাথ, রাধাশ, ভবনাথের কথু কালীক উপস্থিত আছেন। তখন খুব সকাল। শ্রীঠাকুর ইহাদের সঙ্গে পূর্বদিকের বারান্দায় বসিয়া সহ্যাসে আলাপ করিতেছেন।”

শ্রীমক দেখিয়া শ্রীঠাকুরের আর আনন্দ ধরে না। তিনি বলিতেছেন, “লক্ষ্মী, ঘণা, ভর, তিন থাকতে নয়। আজ কত আনন্দ হবে। কিংতু যে শালারা হরি নামে মন্ত হরে নৃত্য-গীত করতে পারবে না, তাদের কোন কালে হবে না। ইচ্ছের কথা লক্ষ্মী কি, ভর কি?”

ভক্তদের গান গাহিত বলিলেন। ভবনাথ ও কালীক গান গাহিতেছেন—

ধো ধো আশি দিন আনন্দকারী

সবে মিলে তব সত্য ধর্ম ভারতে প্রচার।

হুসরে হুসরে তোমারি ধাম, দীর্ঘ দীর্ঘ তব পূজা নাম

তব পদ প্রকৃ লইনু শরণ, কি ভর বিপদ, কি ভর মরণ

জন্মের খনি পাইনু বন্ধ জর জর তোমারি।

ঠাকুর বড়াজাল হইয়া একমনে গান শুনিতেন। গান শুনিত শুনিত মন একবারে ভাব্যাবো চলিয়া গিয়াছে।”

‘কো প্রায় সাড়ে আটটা বা নয়টা। ঠাকুর আজ অক্লান্ত করিয়া গান শ্রবণ করিলেন না; শরীর তত ভাল নয়। তাহার দান করিয়াও জল কলসী করিয়া বারান্দায় আনা হইল।...মানায়ে মংক কণ্ঠে ভগবানের নাম করিতেছেন।” দেখিতে দেখিতে আরো ভক্ত সমাগণ হইল। রাম, নিত্যান্যাপাল, কোল চাটুজো ইত্যাদি অনেক গৃহী ভক্তও যেমন

আসিলেন, জেঠান ভাগ্যী ভক্তেরাও আসিয়াছেন। উত্তর-পূর্ব বারান্দার ঠাকুর ভক্ত সকলের সহিত জড় হইরাছেন এবং তাহাদের নিকট অবতার জন্মের বাখ্যা করিতেছেন অপূর্ব কথায় বামু ডাকিমার। কথামত কারের ভাষায় যেন তাঁরই অনুপম চিত্র অঙ্কন—“বিলতে বিলতেই একেবারে বাহা ভাঙা ছাড়িয়া ধন অকর্ম্ম হইল। “স্রম পশু প্রস্তুতি হইল।” এই কথাটি উচ্চারণ করিতে না করিতে ঠাকুর একেবারে সমাধিস্থ। দেখিতে দেখিতে কোমল হইতে ভক্তেরা খোল করতাল লইয়া সংকীর্তন করিতে করিতে বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনোমোহন, নবাই ও অন্যান্য অনেকে নামসংকীর্তন করিতে করিতে ঠাকুরের কাছে সেই উত্তর পূর্ব বারান্দার উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীসামক্কদের প্রেরামন্ত হইয়া তাহাদের সহিত সংকীর্তন করিতেছেন।

নৃত্য করিতে করিতে মাঝে মাঝে সমাধি। তখন আবার সংকীর্তনের মধ্যে চিত্রাংগিতের ন্যায় গাঁড়াইয়া আছেন। সেই অকস্মাত ভক্তেরা তাহাকে পুষ্পমালা দিয়া সাজাইলেন। কড় কড় গোড়ের মালা। ভক্তেরা দেখিতেছেন ফেন শ্রীশোভার সহস্র গাঁড়াইয়া। গভীর সমাধিস্থ। প্রভুর কখন অকর্ম্মশা তখন জড়ব চিত্রাংগিতের ন্যায় বাহ্যশূন্য হইয়া পড়ল। কখন বা অর্থবাহাদশ্য—তখন প্রেমাবিস্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। আবার কখন বা শ্রীশোভার ন্যায় বাহাদশ্য। তখন ভক্তদের সংকীর্তন করেন।

ঠাকুর সমাধিস্থ, গাঁড়াইয়া। গলায় মালা। পাছে পাড়িয়া যান তাকিয়া একজন ভক্ত তাহাকে ধরিয়া আছেন; চতুর্দিকের ভক্তেরা গাঁড়াইয়া খোপকরতাল লইয়া কীর্তন করিতেছেন। ঠাকুরের দর্শন দ্বিধ। চন্দ্রবন প্রদান, রাজত।

এই আনন্দমর্তি ভক্তেরা অনবচ্ছিন্ন ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। লোলা হইরাছে। কিম্ব পত্র কীর্তনও থাকিল। ভক্তেরা ঠাকুরকে আহা হুয়াইবার জন্য বাস্ত হইলেন।

ঠাকুর কিম্বদন্তি বিগ্রাম করিয়া, সবস্তু পীতাম্বর পরিধান করিয়া ছোট খাটটিতে বসিলেন। পীতাম্বরধারী সেই আনন্দময় মহাপুরুষের জ্যোতির্বিম্ব ভরাচিত বিনোদন অপূর্ণ রূপ ভক্তেরা দর্শন করিতেছেন। সেই মেঘদল, পবিত্র, মোহন মর্তি দর্শন করিয়া নয়নের তৃপ্তি হইল না। ইচ্ছা, আরও দেখি, আরও দেখি; সেই রূপদগর নয় হই।

ঠাকুর আহা বসিলেন। ভক্তেরা আনন্দে প্রসাদ পাইলেন।”

—:—:—

যুগপুরুষ স্বামী সত্যানন্দদেব

থরা বস্তু

শ্রীঠাকুর সম্পর্ক কিছুর বলতে খেল বস্তু সংকেত হয়। তিনি এক বিরাট ও সন্ত সন্তোষের অতীত যে তাঁকে ব্যাকের আধারে ধরে চন্দ্রী করা বস্তু। আবার সাহস পাই ব্রাহ্মণের বাল্যকালিক নবীর দেখে। শ্রীঠাকুরও আমাদের জ্ঞানিয়েছেন মহাপুরুষদের জ্ঞানীপাঠ ও আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরাও মহৎ হতে পারি। ‘আচাৰ্য’ দেবো ভব’।

এই শতাব্দীর অবতার পুরুষ স্বামী সত্যানন্দদেব। ধর্ম সংস্থাপনের জন্য, অর্থ ও অন্যায়ের গ্রানি মোচন করার জন্য, মর্ত্য ভূমিতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য, ভারত ভূমিতে বাহ্যিক অবতারগণ আবির্ভূত হয়েছে। বৃদ্ধ, চৈতন্য, নানক ও অবতারবিরত শ্রীসামক্কদের আকর্ষণ ভারতের ধার্মিক পণ্ডিত করেছে। তিনি শতক শ্রীসামক্কদের হিন্দু-ধর্মকে শূন্যে ও ব্রাহ্মধর্মের নীরাকরতা থেকে মুক্ত করলেন। ধর্মক্ষেত্রে সমগ্র দেশে দর্শন দেব হন। শ্রীসামক্কদের প্রভাব আমাদের সমাজজীবনের ও সাংস্কৃতিক জীবনের দান অনেক উন্নত করেছে। শ্রীসামক্কদের বাণী আজ বিশ্ব-

ব্যবহৃত পরিণত। ঠাকুরও বলেছেন—এ দুগের অবতার বিশ্বের জনতার। তবুও মানুষের হীনতা ও ক্লান্তি বোঝে না। বিশ্বের আদর্শিক শক্তি স্বেচ্ছক হনন করার জন্য উদ্ভাত হৈ বারবার। বিশেষ শতাব্দীতে পরপর দুটি মহাদ্ধ, হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা, ভারতের স্বাধীনতা, এই সঙ্গে দেশ ভাগ, ভ্রাতাবৎ বন্ধ্যা ও মনস্তত্ত্ব মানুষের শৃঙ্খলিত হনন করেছিল। মানুষ আত্মশক্তি হারাতে ফেলোছিল। আশাহীন, বিশ্বাসহীন সর্বশূন্য এক মরুভূমির রক্ততা বখন আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করছিল, বাধা হননের পথে বখন আমরা আত্মশক্তির পথ খুঁজে ফেঁটাছিলাম তখনই আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেব আবির্ভূত হলেন। আশাহীন জীবনে আশার বাণী সত্তার করলেন—নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার জাগরণ ঘটালেন। মানুষকে ঋতপুত্রের সন্ধান দিলেন। তিনি বললেন, এ যুগের কথা পরিচিত। তার সঙ্গে মেশাতে হবে আকুলতা ও আত্মরিক্ততা।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দিওড়িতে প্রথম গ্রীষ্মকক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পূরে বগাইনগরে ও অন্যান্য বহু স্থানে এই আশ্রমের পুনর, যোগাট শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন উপাধানের আদর্শে তিনি এই আশ্রমকে গড়েছিলেন। সনাতন ধর্ম ও নৈতিক পন্থা অনুসরণ করে আশ্রমের নিত্য পূজা, হোম, ভবপাঠ ও ভজন গীতি হয়ে থাকে। আশ্রম কন্যাদেরও তিনি নৈতিক নারীর আদর্শে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। আধ্যাত্মিক শক্তির সঙ্গে আর্থিক শক্তির জাগরণ তো নিতাই আবশ্যিক। ঠাকুর তাতে আরও যোগ করলেন জীবন চর্যার বাস্তবতা। স্ব-লিপিকৃত হতে হবে—সৈনিক মান জামাতে হবে। আত্মশক্তির জাগরণ সম্ভব হবে আত্মবিস্মারির মাঝে। তাই আশ্রমস্থ সম্মানী ও মারেরা 'ভিক্ষাং সৌহ' বলেন না। এরা প্রত্যেকেই অসাধারণ প্রতিভা ও কর্মক্ষমতার অধিকারী। আশ্রম ও আশ্রমস্থ শিক্ষালয়ের বিভিন্ন বিভাগে এরা সবলে মানুষ গড়ার কারিগর। তিনি জানতেন গীতার জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এ যুগে সম্ভব নয়। বিশেষ করে সংস্কারের পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্য ঠাকুর কর্মযোগের কথা সহজ করে বলেছেন। সেজন্য অহংকার, গোলাম এই সমস্ত ছেড়ে দিয়ে গুরুভাগত বলে, তাঁর নাম করে কাজ করে বাওরা ভাল। সংসারে মোটামুটি সমভাবে চলা, ঠাকুরের নাম করা, গুরুর নিষেধে চলা—এটাই উচিত। পারতপক্ষে জাল, ছোকা, লোকের অনিষ্ট ইত্যাদি না করা।"

গৃহীদের জন্য তিনি সহজভাবে বলেছেন,—'পুরুষোত্তম সর্বত্র বিরাগ করছেন। ইট, কাঠ, মাটী, পাথর আবার মানুষ সবেরই মধ্যে তিনি আছেন। এইটুকু মনে রেখে অস্তিত্ব আমরা যেন কারো কোন অনিষ্ট না করি। গ্রীষ্টাকুর সর্বদাই সর্বভূতের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করছেন, কলহন সকলকে 'বান্ধনা মোক্ষার্থে প্রণীত'—জীবনের মস্ত করত হবে। ধর্মব্রাহ্মে সেইজন্য আমাদের বা বৃন্দী প্রাণের কথা চলে না। সমস্তের প্রতি কল্যাণ দৃষ্টি প্রত্যাজন। এইজন্যই তিনি আশ্রম গুলিতে বিদ্যালয়, হাসপাতাল তৈরী করলেন। বিনামূল্যে ওষুধ, কবল, কপড়ানের ব্যবস্থা, নিত্য দিননারায়ণের সেবারও ব্যবস্থা হল আশ্রমগুলিতে। শিব জ্ঞানে জীব সেবার মধ্যে ঈশ্বর পূজা : কিন্তু শৃঙ্খলিত ও বস্ত দিয়ে মানুষের কল্যাণ ও কুশল আনা যায় না। তারজন্য প্রত্যাজন আর্থিক উন্নতি।

আত্মবিকাগ ও আত্ম উপলব্ধির প্রয়োজনে এগিয়ে যেতে হবে। উপনিষদের মস্ত আছে—“চরৈবেতি।” জীব নিরতই এগিয়ে চলেছে এবং প্রত্যেক বিনি এক বৃহত্তে সমস্ত দৃষ্টি ধারণ করে আছেন তিনিও এগিয়ে চলেছেন। গ্রীষ্মকক-নেকও এগিয়ে পড়ার উপদেশ দিয়েছেন গল্পচ্ছলে। সেই কাহিনে কাঠ কাঠতে গিয়ে যে পেল চন্দনের বন আরও এগিয়ে রূপার খনি—আরও এগিয়ে সোনার—তারপর হীরের। আমাদের ঠাকুর ছড়ার ছন্দে বললেন,—

“এগিয়ে পড়ো এগিয়ে পড়ো

সে আরও কিছু দিনের পুরে

আরো এগিয়ে নবীর ধরে

মেখে খনির হীরে মানিক

নিরে কন কুণ্ডের হল

তাইত' বলি এগিয়ে পড়ো।"

আমাদের সকলকে আঁচিক ধনে ফুঁবের হতে হবে। বড় হবার ক্ষমতা আমাদের সকলের হৃদয়েই গাঁথা আছে। সেই নগ্নকে উজ্জীবন করতে হবে। তিনি গৃহী ও সন্ন্যাসী সকলের মধ্যেই দীপাবর্তিকা জেলেছেন। সেটিকে যেন আমরা অন্ধান রাখতে পারি। জীবনকে যেন ফুলের মত সুন্দর আর সংসারকে যেন পুষ্প উদ্যানে পরিণত করতে পারি। আমাদের জীবন যেন সত্যানন্দ হৃৎপের সত্য ও আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—এই প্রার্থনা রাখি।

—:~:—

মানব দরদী গ্রীষ্মকৃষ্ণ

প্রীতিসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রীষ্মের উদ্দেশ্য কি? —এ কথাই উত্তরে গ্রীষ্মকৃষ্ণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভক্তকে একই কথা বলেছেন— জীবনের উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরলাভ। তিনি বলেছেন—ব্রহ্ম সত্য—জগৎ মিথ্যা। বলেছেন ঈশ্বরই কল্লু আর সব অবল্লু। কত মিথি করে বললেন ঈশ্বরলাভ না হলে কিছুই হলো না বাবু! ঈশ্বরলাভকে আম খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করে বললেন—কেউ কেউ বাগানে টুঞ্জে-আম খেয়ে ম্খ ম্খ খেয়ে বোরিয়ে আসে; কেউ কেউ আবার নিজে খেয়ে গোরুকে খেয়ে আম নিয়ে এসে পাড়া প্রতিবেশী পাঁচজনকে খেতে দেয়। গ্রীষ্মকৃষ্ণ এই বিতর্ক প্রণয়ন মানুষ্য যিনি সেখাে যেতে বিলম্বের বাঞ্ছন—যে চাচ্ছে, তাকে তো নিষ্করই; আর যে চাচ্ছে না—তাকেও নিষ্কর। এ যেন উত্তম বৈদ্যের হৃদে হাঁটু দিয়ে ঔষধ খায়ে দেওয়া। দাঁকনেশ্বর কুঠীবাড়ীর ছাদে উঠে সে কি আকুল কামা! চাঁৎকার করে ডাকছেন—“ওরে ভক্তসল—তারা কে কোথায় আঁচিস—হুটে আর।” তাঁর আর সবু সইছে না। তিনি দিতে এসেছেন—ভক্তদের নিঃশেষে সব বিলির দিয়ে তবে তাঁর স্বাভি, তবে তাঁর নিশ্চিন্ততা। তিনি প্রত্যেক দর্শন করেছেন—ইশা বাসামিগে সন্ধ্যা বরফিত জগত্যাং জগৎ—তাঁর চোখের সামনে কোলাহলি, দরজা, চৌকাঠ সর্বকিছু চিন্মন স্বাভাৱপে বরা দিয়েছে। তিনি দেখলেন ভবচারিণী মা, গড়ংচারিণী মা আর পদসেবারতা লীলাসজিনী সায়রা মা এক। পতিতাদের মধ্যেও জগৎজননীর আবির্ভাব স্পষ্ট লক্ষ্য করেই তিনি বললেন—“প্রতিমাতে তাঁর আবির্ভাব হয় আর মানুষে হবে না? তিনি তো সকল কুণ্ডেই আসেন, জব মানুষের ভিতর তাঁর বেশী প্রকাশ।”

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কাশীপুরে উদ্যানবাটীতে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও পার্শ্বচারী করার সময় তিনি গিরীশবাৎসকে জিজ্ঞাসা করলেন—“গিরীশ, তুমি এর মধ্যে কি দেখো যাতে লোকের কাছে এত বল বেড়াও?” তাঁর উত্তরে গিরীশবাৎস নতজানু হয়ে বললেন—“প্রভু, ব্যান্ড-বান্ধিকী বীর কথা বলতে পারেন নাই, তাঁর কথা আমি কি বলবো?” এই কথা শুনেই অজ্ঞ বাহাদুর প্রাপ্ত হয়ে উপাধিত সকলকে স্পন্দ করে “তোমাদের চৈতন্য হোক” বলে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। তাঁর সেই কৃপা হতে নিরক্ষর পাঠকও বাদ পড়লো না। আবার নিজের হৃদে হাত রেখে বলেছেন মা একে আর বেশীদিন রাখবেন না। মৃৎ সগল গ্রামকে লোকে ধরে বসে আর পাথে সকলকেই দিয়ে ফেলেন—তাই মা ভবতান্ধিনী তাকে আর বেশীদিন নয়সেইে রাখবেন না। মানুষের প্রতি গ্রীষ্মকৃষ্ণের ভালবাসা ও দরদ যে কত সুন্দর প্রসারী ছিল সেই বিষয়ে এখন আমরা কিছু অলোচনা করব।

বালক গদাধর তাঁর বাটারাতা বনি কাম্যারিন্ধক কথা দিয়ারাছিলেন যে, উপনয়নের সময় প্রথম ভিক্ষা তিনি ধনীমার হাত হতেই গ্রহণ করলেন। কিন্তু দেশাতার অনুযায়ী শূদ্রদেখ প্রথমে দেখা নিবেদ থাকার সকল ভীকে সে কাষী হতে ক্রিত বাসতে অনুব্রোহ করলেন। কিন্তু সত্যানিষ্ঠ গদাধর নিজ সঙ্কল্পে অটল রইলেন। ফলে টলে ফেল

দেশাচারের গভী । খনীমারের অঙ্কের বৈদ্যার তিন অত্যন্ত দুঃখমান হয়ে পড়ছিলেন । পরবর্তীকালে তিনি ঘোষণা করেছিলেন—“ভক্তের কোন জাত নেই ।”

গ্রাম্মনৈতা কেশবচন্দ্র সেন গুরুতর অসুস্থ হয়ে শয্যা গ্রহণ করলে তিনি মাকের কাছে কোঁদে কোঁদে ডাঙো করে দিও প্রার্থনা জানিয়েছিলেন । ঠনঠনের মা কালীকে একবার কেশববাবুর আরোগ্য কামনা করে ডাব-তিনি মানত করেছিলেন ও মাস্টারমশায়কে পুঁজা দিয়ে আসতে বলেছিলেন । অথচ কেশববাবু তাঁর শিষ্য ছিলেন না, গুরুমুখ্য তত্ত্ব অবশ্যই ছিলেন ।

ভাইপো অঙ্কর অল্প বয়সে পরলোক গমন করলে গ্রীষ্মকক বেশ চেয়ে চেয়ে দেখলেন যে বাপ হতে জরামালা বেরিয়ে গেল । তখন তিনি আনন্দে ‘জরকালী জরকালী’ বলে হাততালি দিয়ে নৃত্য করলেন । কিন্তু পরে বুকের ভেতরে বেন গাম্ভা নিজেছোঁদে বলে মনে হল বলেছেন । মানব দরলী গ্রীষ্মকক অঙ্করের শোক খুব খানিকটা কেঁদে আমাদের মতো অন্ধ ভক্তদের সামন্য দিয়ে গেলেন যে, প্রিয়জন বিরামে শোক হওয়াটা খুব বিচিত্র কিছুর মতো নয়, বরং খুবই স্বাভাবিক । কাশীতে তিনি পাকাপাকিভাবে বাস করার কথা ভাবছিলেন, এমন সময় মনে পড় গেল তাঁর গভীখারিনী মা বাল্মীকির নহবতের দ্বিতলে ভোগশয্যার শায়িত আছেন । খাস্, আর তাঁকে রোষে কে ? মাকের সেবা পরিচর্যার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ কাশী ত্যাগ করে বাল্মীকির ঘরে এলেন ।

গ্রীষ্মা বলেছেন যে, যদিও প্রায় সমগ্রই সমাধিতে মর থাকতেন, তথাপি স্বামীর কষ্টবা হাতে এতটুকুও কিছাতি ছিলো না গ্রীষ্মককের । পঞ্চদশোত্তে সীতার দর্শন পেয়ে তাঁর হাতে ভারমণ্ড কাটা বালা দেখে অনুকূপ বালা তিনি গ্রীষ্মাকে গাড়িয়ে দিয়েছিলেন । তাঁর অবশ্যমানে মাকের কিতাবে লেবে এই কথা ভেবে কোঠারের জমিদারীতে লম্বী করার জন্য বলরাম বন্দুর কাছে কিছু টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন । গ্রীষ্মাকে তিনি সম্ব্যপ্রকার শিক্ষা দিয়েছেন যে কথাপ্রদসে মা খুব আনন্দের সাথে বলছেন যে “তিনি আমাকে সবচেঁটি কি করে পাকাতো হয় তা-ও শিখিয়ে দিয়েছেন ।” বার যে তাঁর কি না—তাই কোলকাতার বিভিন্ন অলিগলি পরিক্রমা করে মানব-দরলী গ্রীষ্মকক সেখানকার মানুষদের আলোর পথে নিয়ে যাবার আশার বার বার এসেছেন । মাকে বললেন—“আমি আর কি করলাম, তোমাতে আরও বেশী করতে হবে ।”

মায়ামলারকে গ্রাম্মনৈতা প্রত্যাপ মজুমদার বললেন, গ্রীষ্মককের অনেক গুণ ছিল সন্দেহ নেই—এবে কিছু ঘোষণা ছিল—যেমন নট-নটীরের খুব বেশী প্রশরদান । গিরীশ ঘোষ, নটী বিনোদিনী প্রভৃতির প্রতি তাঁর অনুকূপ্য প্রদর্শন করাটা উচিত কাজ হয়নি বলে মন্তব্য করার মায়ামলার বলেছিলেন যে, এখানেই তো তাঁর অবতারের প্রমাণিত হয়ে যায় । বাঁশ, বৃক্ষ, গ্রীষ্টিন্য প্রমুখ অবতারই পতিত, অত্যন্তদের চরণে ঠাই দিয়েছেন বলেই তো তাঁরা পতিতপাবন । গ্রীষ্মকক যেমন বলেছিলেন—কা এর পর আবার একটা আকার (I) বসালে কি হবে ? যেখানে আকার নেই সেখানেই তো বসাতে হবে । জগাই-মাদাইকে কৃপা করে উদ্ধার করেছিলেন বলেই তো মহাপ্রভুর কৃপা ও করুণার কথা ইতিহাসের পাতার স্মারকরে লেখা আছে ।

ভাববতী কি প্রথম বৌদেন স্বভাব চরিত্র খুব একটা ভাল না থাকার গ্রীষ্মককের পায়ে হাত দিয়ে অর্থাৎ স্পর্শ করে প্রলায় করার তিনি বাল্মীকি দশানের জন্মলা অনুভব করে লাফ দিয়ে গল্লাজলের জালা হতে জল নিয়ে গায়ে-পায়ে ছিটোতে লাগলেন । ভাববতীকে বললেন—তোরা অতনি দূর থেকে প্রশাম করবি । একথা বলার পর পায়ে সে মনে খুঁখ পায় বলে পাট কথার তাকে কুলোতে লাগলেন—এ অপদৃশ্য প্রেম ডাবা বার না ।

কাশী বাস্তবায় পথ সেওথরে বীন-বীরপ্রসন্ন মাকে তিনি খসে পড়ে মনুত্রবাবুকে আশ্রয় দিলেন—সকলকে পেতে জুরে খেতে দিতে হবে আর তাদের মনুত্র বাবার দিতে হবে জেল, অন্যায় তিনি তাদের মেড়ে কাশী যাবেন না ।

অন্যোপায় মথুরাবাদ্ধ অতিরিক্ত টাকার ব্যবস্থা করে তাদের পেট ভরে খাইয়ে তবে তাঁর 'বাবাকে' নিয়ে তাঁর বাড়ীতে পেরেছিলেন। কল্যাণবাটার মথুরার জমিদারী দেখতে গিয়ে সেবানকার দরিদ্র প্রজাদের কাছে তাদের আর্থিক অনটনের কথা শুনে তাদের খাজনা মকুব করে দিতে বলেছিলেন এবং মথুরাবাদ্ধ কিনা কিবার 'বাবার' আদেশ যেনে নিয়েছিলেন। সম্বৎসরান্তের প্রতি এত গভীর সমবেদনা ছুরে পোকান করতেন দীনবন্ধু গ্রীষ্মাক্ষক ! কাঙালী ভোজনের পর দীপপেখর কালীবাড়ীতে তাদের উদ্ভিষ্ট তিনি নিজ হাতে পরিষ্কার করেছেন। সকলের অলক্ষ্যে অজ্ঞানদের পারখানা পরিষ্কার করে স্বীয় বেশের ঘাটা মুছে দিয়েছেন।

মা ভগ্নাধিকারকে বলেছিলেন রসে-রসে রাখতে। শূন্যের সাধ হতে তিনি কখনোই চান নি। গ্রীষ্মাক্ষক ছিলেন সাধুর রাজা। তথাপি এতটুকু অহং-এর লেশ ছিল না তাঁর মধ্যে। সাধুর গাছা যোগাড় করে দিচ্ছেন এবং উঠে গাঁজুর হাতজোড় করে গাছাখোর সাধুর সঙ্গে কথা কয়েছেন। ভক্তের সাক্ষাতক প্রদত্ত উত্তরে বলেছেন—“ওরে এ যে শুভমুখ নারায়ণ।”

ভক্তবাড়ীর মারোয়া শিকারিগির উপবাস করে এসেছেন রাম্বর ও গ্রীষ্মাক্ষককে দর্শন করতে। উপবাসের কথা শুনে তিনি জড়াজড়ি তাদের কিছু খাইয়ে তবে শান্তি প্ৰদান। কলেন—মারোয়ের উপবাস করে থাকে তিনি সইতে পারেন না। জ্ঞানীজন সমাধে নারী ছিলেন অবহেলিতা; গ্রীষ্মাক্ষকের কাছে নারী মারোই মা। তাই মাতৃভক্ত সম্ভান গ্রীষ্মাক্ষক নারীজাতির নিরন্ধ উপবাস করে থাকে সহ্য করতে পারতেন না।

গলার কত বন্দন শব্দ বেড়ে গেছে—কত হতে পুঙ্খ, রক্ত বাহির হচ্ছে, পারেন ছাড়া আর কিছু খেতে পারছেন না—ওজনও তিনি অকাতরে কথামত বিতরণ করে চলেছেন। নিদারুণ অসুস্থতা ও রোগ বশত সন্তোষ বলেছেন—“লক্ষ লক্ষ কথো পেয়েও যদি এক্ষণ মঙ্গল হয় তো করবে।” জীবিত মৃত্তির পথ-নির্দেশ দিতে, জন্মের সম্ভান দিতে মানব-দয়নী গ্রীষ্মাক্ষক তিল তিল করে নিজেকে নিঃশব্দে আহুতি দিলেন। আমরা সেই মানব প্রেমিক গ্রীষ্মাক্ষকের চরণে কোটি কোটি কৃতজ্ঞতা প্রদান জানাই।

—গ্রীষ্মাক্ষকপূর্ণিমন্তু ॥

—১০১—

প্রতিষ্ঠা করে থাকি

শান্তশীল দাঁশ

মাঝে মাঝে বাই আমি সেই সেশে, সেই জপাখনে;
বেশানে শান্তির রাজা, পরিপূর্ণ জীবনের দিন
আনন্দে পরমানন্দে চিন্তাহীন কর্মের মাঝারে—
অজ্ঞে কী পরিতৃপ্ত; সর্ব কর্মে তাঁর উপস্থিতি।

উপরে আকাশ মত, বৃক্ষলতা নানা ফল ফুলে,
প্রোজাশ্বিনী জল ধারা—তাঁর পতঙ্গল গরিবাসে।
কর্ম সব পূজা যেন, ছন্দে গাথা সরস সরল—
জীবনের দিনগুলি কী প্রসন্ন উজ্জ্বল সুন্দর।

সকলের মাঝে তুমি, তাইতো অজান কিছ, নাই;
পরিভূত এই মন, সব পাওয়া সে মনের মাঝে।

সেই মন নিয়ে চলা, কাজ করা, কিংবা অকসর
লটাটের পুরে নেই অতৃপ্ত কোনও কৃন্দ।

সে দেশ হারিয়ে যায়, ফিরে আসি এই কোলাহলে,
কী বিজ্ঞ হয় মন অগাধ এ বিস্তার জীবনে।
এটুকু তৃপ্তি নেই, মালিনা কিংবা চারিধার—
হাসরোষ হয়ে আসে; বাঁচা শব্দে অভিভব কেল।

এ জীবন কোনদিন সে জীবন হবে নাকি আর?
বেশনার চরে মন; তবুও প্রতীকা করে থাকি।

কে এই পুরুষ প্রধান

স্বামী অরুণানন্দ

ধর্ম স্বপ্ন খুব গ্রানিভূত হয়—অশেষই কিতার লাভ করে। তখন সব-এর রসার্থে এবং অসং কিনাশ করতে তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। গীতার একথা পাই—লীলা আশ্বাসনের জন্যও তিনি আসেন, লোককল্যাণে মানবের হুণ পরিগ্রহ করেন।

যে যুগের যেমন প্রয়োজন হয়েছে—তেনেই তাঁকে আসতে হয়েছে, না এসে পারেন না। কারণ প্রভু তিনি—এ সৃষ্টি তাঁরই অতএব রচনা করবার দায়িত্বও তাঁর। কিন্তু লীলা আশ্বাসনের জন্য যে আসা তার ধারণা সাধারণ করতে পারে না। কয়েকজনকে তিনি চিনির সেন নিজেই স্বরূপ—তিনিও আগে থেকে তাঁদের চিনে রাখেন। “কৃষ্ণতু ভগবান স্বরূপ”—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পুত্রোত্তম এলেন মানবের নাকে মানব হয়ে। তাঁরই হলানিনী শক্তি রাধাধারীণী। সেই লীলা আশ্বাসনে রাধাভাক্ষের বনীভূত হৃদিত নবীয়ার গ্রীষ্মায়াত্র। কৃষ্ণ ভাব—কৃষ্ণ নামের বান ধরে গেল। আশ পৃথিবী ব্যাপ্ত সে নাম।

গ্রীষ্মমকুটবন বহুলেন—“দেখলাম সচিনানন্দ সমুদ্রে রাম, কৃষ্ণ সব অবতার ধলো ধলো ফলে রয়েছে। অসংখ্য অবতার। তার ইতি নেই, বসন্তের ফুলী আসতে পারেন। আবার বহুলেন—“অন্যান্যাবার নামের গোমস্তা আসে—এবার বোধ এসেছে” “যে একবার নমস্কার করবে সে উদ্ধার হয়ে যাবে”। দিব সত্তার উদ্ভাসিত নরেন্দ্র—বিবেকানন্দ হয়ে নিজেই অনুভূত্বতে বর্ণন করে প্রণাম মধ্যে লিখলেন— অবতার বরিত্তার রামকৃষ্ণ নাম”। এলেন গ্রীষ্মায়াত্রা, গ্রীষ্মমকুটের শক্তি হয়ে। এক নতুনরূপ উন্মোচিত হলো যা পৃথিবীর ধর্মত্বিহাসে এর জ্যোতিষ্মত্ব হয়ে থাকবে। ঘরলী এবাঃ মাতুরূপে অর্ধাধিত্য। বিবেক পূজা নিলেন গ্রীষ্মমকুটে কাছে। অবতার বরিত্ত ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন ‘আবার আসার’। “জানি কিনা আবার আসতে হবে”। “বারকোণে আবার দেহ হবে”। “কে জানে তোমার গাই গুই, বীরভূমের বামুন বুই”। আরও বহুলেন—“এবারে আসের হল না পূরের বারে আসের হবে—পূরের বারে আসের হবে না আসের বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে।” শ্রবণ ভগবান নিজ মূখে কেয়লি বল গেলেন এ নিরু কি আমরা কিছু চিন্তা করি—বোধ হয় না।

তিনি নিজ মূখে পঞ্চবটীর বৃটী ডাল দোখিয়ে বলেছিলেন, বখন দেখবে এই বৃটী ডাল যোগ হয়ে যাবে তখন জানবে আমি আবার এসেছি।”

শ্রবণ ভগবান যে বাণীমূলি বলে পূর্বরায় আসার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তা নিয়ে চিন্তা করা, আলোচনা করা, যা জিজ্ঞাস্য মন দিয়ে অনুসন্ধান করা এখনও দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে সভ্য উন্মোচনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ভাবাক্ষর দেখেছিলেন—গ্রীষ্টাকুর উত্তর পশ্চিমাঞ্চল আবার আসবেন।

গ্রীষ্টায়া ভাবনামাধি অবস্থার বর্ণন করে বলেছিলেন—“দেখলুম—গ্রীষ্টাষ্টাকুর বাউল বেশ চলেছেন বর্ডমানের পথে—হাতে একটি ভাস্ক্রা একত্রায়। আমিও আমি পেছনে, আমার হাতে একটা হুকো।” কিছুদিন গিয়ে আমি হুকোটি ভেঙ্গে দিয়ে বললুম—এই হুকো তোমার হুকো—আমার মাছকোটা করলেও আমি আর আর্দ্রাছি নি।”

ভক্ত পাঠকদের কাছে নিলেন—উত্ত ইঙ্গিতগুলির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পূর্বরায় ভগবানের বিষয়—আমরা অনুসন্ধান করব কিনা। সরোবা রামকৃষ্ণ ভাববিদ্যে এমন একজন কেউ এসেছিলেন কিনা? যদি এসে থাকেন তাহলে

জন্ম কল্যাণকল্পে সেটী প্রকাশ হওয়ারও প্রয়োজন আছে কিনা ? তিনি কি করে গেলেন—কি তার অবশান—তার জীবন ও সম্বন্ধের ব্যাপ্তি কিরূপ ছিল এম্বলির মূল্যায়ন যদি না হয়—একটি বিরাট আবির্ভাবের মধ্যস্থত মধ্যমা দেওয়ার চেষ্টা না করলে চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় বহন করতে হবে। পূর্না আবির্ভাবের বিষয়ে তার নিঃশব্দই দেওয়া ইঙ্গিতগুলি এবং রাখাল মহারাজ, শ্রীমার উপাধিভাজিত কথাগুলির বিবরণ করে দেখা যায় কোনও মূল্যপ্ৰদান অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে আধিকারিক পূর্ববঙ্গের আবির্ভূত হয়েছেন, বা হয়েছিলেন একান্ত গোপনে। যদি দেখা যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহু আরম্ভ কাজ তিনি সমাপন করেছেন নিম্নরূপে, নীরবে। যদি দেখা যায় তার মূল্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘনীভূত মূর্তি—চলেন, বসেন, কখন সেই ভাব। ভাগবতী গুঢ় ইঙ্গিত রয়েছে তাঁর আবির্ভাব রহস্যে। বাউল হলে সন্ন্যাসী হার সাধারণ মূল সূত্র। হাজার হাজার দিগা সন্ন্যাসী রচনা করেন—সব শোক, তাপ, জ্বালা জ্বলন্ত দেওয়ার জন্য জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ যিনি স্বয়ং মা ভবতারিণীর নিম্নেই নিয়ে চলেছেন এক বার জীবনে ঘটেছে এক দিব্যাত্মিকতা ঘটনা—স্বয়ং মা ভবতারিণী নিজ হাতে দিয়েছেন সম্যাস, অবতারের সমস্ত লক্ষণ যাতে রয়েছে বিদ্যমান, আরও বহু বহু ঘটনা বা সাক্ষ্যপুত্র লিপিবদ্ধ করা যায় না। তাহলেও কি অব্যাহত পিপাসা ভক্তবর্ষণ উচিত নয় এই মহাদিব্য জীবনের রহস্য উন্মোচন করা ? যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন ও বাণীর জগৎ মূর্তি যিনি তাঁর উপদেশ ও বাণীর তাৎপর্য ব্যক্ত করে রূপান্তর করে দেখালেন, যিনি বিজ্ঞানকে বিভাবের ধর্মাত্মকতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, তা বিভিন্ন ধর্মের প্রয়োগ সাহায্যে দেখালেন, মানুষ ও সমাজ জীবনের চিন্তাধারাকে বিভাবের উন্নত করা যায়—দিব্যাত্মিকতা করা যায় তার জন্য আজীবন দিগা সাহিত্য রচনা করে সন্ন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে নব জাগরণ এনেছিলেন কে সেই মূল্যপ্ৰদান, তার প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন আর।

স্বামিজী হুগোছিলেন—ভারতবর্ষের নারীজাতির সর্বমুখে উন্নতি না হলে তাঁরা সঠিক মধ্যমা না পেলে এ দেশের উন্নতি কোনও দিনই হবে না। পাণ্ডুর ডানা যেমন একটি ডানার ভর করে উড়তে পারে না—কোনও ভিত্তিক ও দাঁড়াতে হলে পূর্ব ও নারীর সমতাযেই জাগরণ দরকার। সেজন্য মাতৃজাতির জন্য আলোচনা মঠও করতে চেয়েছিলেন। আমরা দেখতে পাই—আজ থেকে প্রায় ৪৫ বছর আগে যিনি স্বয়ং মা ভবতারিণীর নিম্নেই মাতৃজাতির শাসনিক উন্নতিকল্পে করেছিলেন কুমারী মাল্লিকের স্থান দিয়েছিলেন সর্বভাষা সন্ন্যাসিনীরূপে গণ্য তোলার জন্য এক তাঁদের মহামাতৃভাবের আবির্ভাব রূপে ধ্যান জ্ঞান, শাস্ত্রচর্চা, সন্ন্যাস, অনুভূতি ও উপলব্ধিতে অধ্যাস জীবনের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন দেশ ও দেশের কল্যাণে কে তিনি ? সংগ্রহই সমাজ জীবনের মূর্তি। এক একটি গোটা পরিবারকে যিনি ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত করে আশ্রমে স্থান দিয়েছেন। লত সহস্র পরিবারকে দিগা জীবনের আশ্বাসনে অমৃত্যুরিত করেছেন—কে সেই অমৃত্যুর পূর্ব ? কে সেই সুন্দরতম পূর্ব বার পবিত্রতা-উপমাই ছিল প্রাণ। বার জ্ঞানের পার্থক্য ছিল অসীম বার কাজে বিশ্বের জ্ঞান, গুণী দার্শনিক দিশারী সন্ন্যাসিনীরূপে মত বসে শুনতে তার অমৃত নিবাসী বাণী—কে তিনি ? বার উপাস্য, সাধনা, সমাধি—সোপানকে নিয়ে জীবন্ত লীলা ও অধ্যাত্মস পিপাসারূপের পদ্ম সপন বার দিক ও উপদেশ প্রাণে প্রাণে অমৃত সিকন করে শান্তি এনে দিল—বার আবির্ভাব স্বয়ংরাজ্যের সর্বস্বত্ব উন্মোচন করেছে। বার দর্শনময় মানব আনন্দময় কিন্তু অতিক্রান্ত হতো কে তিনি ? গানে, জ্ঞানে, সোপান, হার্মস্বশীতে শিশুরের নিয়ে যিনি যেতে উঠতে, শিশুরের মাঝে শিশুর রাজা হয়ে বসে কুলে যেতেন সব। পদ্ম রাজ্যের এ শিল্পী কে ?

নিজানন্দ বলে বীরভূমের বাসন হয়ে বাউল হলে, একতারা নিয়ে হাজার হাজার গানে ভুবন দুলিয়ে এ কোন গোটা গ্রাম লীলা করে গেলেন ? কাম্বুজের মূর্তি বার শ্রীঅঙ্গের আবরণহীন আভরণ শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে ভাবে একাকার হয়ে তবাক্যকীর্তিত-দিব্যজ্যোতি দিগা অঙ্গ, স্তম্ভ কোমল চরণে স্বর্গীয় শোভা, অহমর্ষি কিংবা জেন নটন ভঙ্গী এ কে ? এ কি সেই যিনি হুগোছিলেন “বারকেলে অব্যবসেই হবে,” “কে জ্ঞানে তোরা গাই গুই বীরভূমের

বাস্যে মূর্খ, বীর সম্বন্ধে সত্যতা মা কল্যাণিলেন “কল্যাণের পথে বাটল বেশে হাতে একটি ভাঙ্গা একতারা নিয়ে চলেছেন”—এক সিন্ধু ভৈরবী হঠাৎ এসে ঘট্টে দর্শন ক’রে কল্যাণিলেন—এ যে সেই—তোমরা দেখনি “পল্লবটীর সেই ভাল মূর্টি যোগ দেখে গেছে” । ঠাকুর বে কল্যাণিলেন, “বন্ধন দেখে এই ভাল মূর্টি যোগ হ’লে গেছে তখন জানবে আমি এসেছি” । বাও বাও দেখে এসো গে। সত্যই দেখা গেল ঐ ভাল মূর্টি যোগ হয়ে আছে । এছাড়া বীর মহাদেবাজীও এমনি অসংখ্য প্রমাণ এবং বহু দিবালীলার পরিচয় আছে যা অবতারত্বেরই পরিচয় বহন করে । ‘যে বোম্ব হাড়ির গ্যাছ’ বীর উপলক্ষ্য, সেই অবতার বীরের শ্রীচামকরণে বলায়িলেন—“সেকল্যাম সচ্চিদানন্দ সমগ্রে রাম কৃষ্ণ সব থলো থলো ফলে রয়েছে ।” “অসংখ্য অবতার—তিনি বতবার মূর্খী আসতে পারেন”—এই পদ্য বাণীইই অলঙ্ঘন ক’রে আমরা কি ভাবব না—ঐ পুরুষপ্রধান শিবসম্বাদের জীবনকে কেন্দ্র ক’রে কি গভীর গহীন রহস্য লুকিয়ে আছে ?

—২০১—

দীনের ঠাকুর আমার ঠাকুর

স্বামী হীরানন্দ

ঈশ্বর মন দেখেন । তিনি ভাবগ্রাহী অনাস্পদ । ভক্তের অন্তরের আকৃতিতে তাঁর বড় প্রিয় । সেটি তাঁর চরণে ঠিক মত সর্পাশিত হলে, তা সে যত দূরই হোক না কেন, তিনি প্রসন্ন হয়ে সে দীন নিবেদন গ্রহণ ক’রে ভক্তকে থাণ করেন । আর তাঁর সেই প্রথমতাই ভক্তের অন্তরে সত্যার করে দিয়া আনন্দের স্পন্দন । ভক্ত স্বরূপ তখন অকল্পনীয় পাওয়ার আনন্দে ভগ্নপূর হয়ে ওঠে । আমরা কত সময় কত দান উপহার গ্রহণ করি । কিন্তু নিবেদনকারীর অন্তরকে এমন ‘সব পেরেছি’র স্বকায় আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারি কি ? তাই receive বা গ্রহণ করা কথাটা সহজ মনে হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বড় শক্ত কথা । গ্রহণের কথা দিবে শূন্য ঘণ্টে পূর্ণ করতে তিনিই পারেন । মানুষ্যের অসাধ্য । ভগবানের পক্ষেই তা সম্ভব । আর সেই অলৌকিক সম্ভবের কত না জটিল দৃষ্টান্ত দেখার ও অনুভব করার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল ভগবান সত্যানন্দের চরণতলে বসে তাঁর প্রকট লীলা বিলাস দর্শন কালে । অজ্ঞে তারই মূর্ একটি স্বীকৃতিস্বরূপ ক’রে মনটাকে আবার সেই পরম পাওয়ার অনিন্দ্য আনন্দে ডুবে তোলায়ই এখানে কিন্নর প্রয়াস ।

করানন্দ প্রাপ্ত । রাগের আরতিতে পর গঙ্গার ধারের বারান্দায় বসে সেদিন ঠাকুর কথামত পাঠ ও আলোচনার অবসরে ডেস্কের ওপর প্যাডের কায়দে কিছু লিখছেন একটি মোটো কর্তা কলম দিয়ে । ডেস্কের পাশে রাখা আছে একটি কলমের বড় বাস । লেখার শেষে কলমের ঠাকুর, কলমের ওপর আঘাত খুব সং ছিল ছোটবেলায় । তেঁা দেখে, এখন কত রকমের দামী দামী সব কলম এসে গেছে । সবই ভক্তরা present করেছে । শূন্য এবেশের নয়, বিশেষেরও কত দামী দামী সব সুন্দর সুন্দর কলম । এই দ্যাখ, বলে আনন্দ ক’রে এক একটা তুলে তুলে দেখাচ্ছেন ভক্তদের । একটা কলমের ডগার একটা মোটো ঘড়ি ফিট করা । ওটা যেখানে কলমের, ‘দৈনন্দ, কেমন ঘড়ি ফিট’ করা হয়েছে । কলমটাতে ছিল না । আলাদা ভাবে কলমের নিরেছি সাক্ষ্যকে দিয়ে । একদিন ভাবলাম কলমের সঙ্গে যদি একটা ঘড়ি থাকে তো লেখার সময়, সময় দেখার জন্য ঘড়ির খোঁজ করতে হয় না । তাই এরকম একটা করিয়ে নিলাম । এ ধরনের কলম আবিষ্কার হলে কত সুবিধা বল তো ?” এর বহু বছর পরে প্রবাসী এক ভক্ত বাসবপুত্র দেবারতনে এসে শ্রীজর্জনা মাঝে ইলেকট্রনিক ঘড়ি ফিট করা সুন্দর একটি কলম উপহার দিয়ে গেলেন । কলমটি দেখা মাত্র ঠাকুরের এদিনের স্মৃতিটি

মনে ভেসে উঠল। আর ভেবে অবাক হলাম যে, সত্যানন্দ গ্রন্থ মনে কত বছর আগে ঠিক এখনি একটি কলম রূপে নির্যেছিল বা বাস্তবায়িত হল এতদিনে! 'বাক্' যে কথা বলছিলাম। এইসব নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর কলাম দেবাবার পর ঠাকুর বে ছোট্ট কলমটি দিয়ে লিখছিলেন সেটী এবার হাতে নিয়ে খুব আনন্দ ক'রে বলছেন, "আর এই ছোট্ট কলমটা দেখে, এটা খুব সুন্দর। সিগা কলম। আমি এখন এটা দিয়েই লিখি। কয়েকদিন আগে সুধীর আমার বিরোধে। সাড়ে ছ' আনা দাম। এতে লিখতে বেশ ভাল লাগছে।" দামী দামী অত কলম থাকতেও আগেরদিনও ঠাকুরকে আমরা এই কলমই লিখতে দেখেছি। সুধীর কাশীপুরে বাড়ির সেবক। রত্নচ্যারীর মত থাকে। রোজ রাতে ঠাকুরের পাঠের আগের এসে বসে। সুধীরের চেয়ে বেশি তখন আনন্দধারা বইছে আর চিপ চিপ ক'রে মাদিতে মাথা ঠুকে ঠাকুরের চরণে প্রণাম জানাচ্ছে। অনেকদিন থেকেই ঠাকুরকে কিছু একটা দেবার বড় ইচ্ছা ছিল সুধীরের। কিন্তু পরমা কড়ি নেই, কোথায় বা কি পাবে? খুব চিন্তা। একদিন কলকাতার রাস্তার দেখে এক ফেরিওয়ালা হাঁকছে "বা লিবি তা সাড়ে ছ' আনা, চুনা বাছো সাড়ে ছ' আনা।" সুধীর তখন ঠাকুরের জন্য এই কলমটা বেছেছিল। কিন্তু শাধা ছিল—এ কি ঠাকুরকে দেওয়া যায়? ঠাকুর কি ব্যবহার করবেন এ রকম একটা সামান্য কলম? সুধীরের মন প্রাণ আজ ভরে গেল আনন্দে। ভগবান গ্রন্থ করছেন তার সামান্য নিবেদন।

আর একদিনের কথা। সকাল হতে না হতেই গ্যামান্য অর্তিধি ও ভক্ত সমাগমে আশ্রম সন্ধ্যা হয়ে উঠেছে। তনানীচন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমণী অক্ষুন্নচন্দ্র ঘোষ বললল নিয়ে ঠাকুরকে দর্শন করতে এসেছেন। আশ্রমে তাই এত ভিড়। গঙ্গার ধারের বায়ান্দার বসে তঁরা অনেকক্ষণ ঠাকুরকে দর্শন করছেন, অনেক কথাও হেরেছে তাঁর মনে। এবার সকলে বিয়ার ন্যেদন। ঠাকুরও নিজের আসনে উঠে গাঁড়িয়েছেন। ঠাকুরকে ঘিরে সকলে ভিড় করেছে। মণিমান্দির আশ্রমে ও নাট্যমন্দিরেও লোকের ভিড়। অনেকেই উঠানে গাঁড়িয়ে লোকের মাথার ওপর দিয়ে ঠাকুরকে দর্শন করার বার্ষ চেষ্টা করছে। নাট্যমন্দিরে এক প্রান্তে বসে লক্ষ্য করছিলাম কুচ্ছত্রা গায়েই গোড়ার অনেকক্ষণ ধরে একটি লোক তাঁরে গাঁড়িয়ে আছে। খুবই মগ্ন ও ছিন্ন বেশ। অস্ত্রাজ প্রেমীর পরিচিনারায়ল। এখানে কেউ কিছু তাকে বলছে না, বলতে নি, নিজে থেকেই সে সকলের থেকে তফাতে অতি সন্তোষে গাঁড়িয়ে আছে। ব্যাকুল দৃষ্টি তার প্রসারিত বায়ান্দার দিকে, যেখানে ভক্ত ও অর্তিধির মাঝে ঠাকুর আছেন গাঁড়িয়ে। জানি না ঠাকুরকে দর্শন করতে পেরেছে কিনা। ইতিমধ্যে ঠাকুর আপন হৃদয়ে কখন লুকে গেছেন তাঁর পাইনি। সেটা বৃহতে পারলাম ভক্তদের সব এক এক ক'রে উঠানে নেমে আসতে দেখে। কুচ্ছত্রার ভক্তের পরিচিনারায়লটিও এবার চলে যাচ্ছে। বড় কৌতুহল হ'ল তার সম্বন্ধে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "হা ভাই, তুমি ঠাকুরের দর্শন পেরেছ? সঙ্গে সঙ্গে সরল হাসির আলো মুটে উঠলো তার মুখে। বললো, "হ্যাঁ।" ঠাকুর দূর থেকে বন্ধন কাউকে কদম হস্তে আশীর্বাদ করেন, সেইরকম হাতের ভাঁজ দেখিয়ে বলল, "ঠাকুর আমার আশীর্বাদ করেছেন।" তখন তার মুখমণ্ডল দেখি অপূর্ব দিবা আলোকে উজ্জ্বল। বৃহতে বাকি থাকে না—সে পেরেছে। আশ্চর্য হলাম এত ভক্ত অর্তিধি নিয়ে ঠাকুর বাস্ত। কত লোক তাঁকে দর্শন করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। আর এই ভাগ্যানান ধরিনারায়লটি সকলের আড়ালে কত দূরে গাঁড়িয়ে তাঁর দর্শনের ব্যাকুল আকৃতি নিবেদন করেছে তাঁর চরণে। হৃদয়ের ঠাকুর সকলের অলক্ষ্যে শত বাস্ততার মাঝেও কোনাে ব্যর্থ যে দীননারায়ণের অন্তরের ভাঁজ অর্থাটি গ্রহণ ক'রে প্রসন্নপ্রসাদে ভরে দিয়েছেন তার বৃক, কেউ জানল না।

তখনও পুরোপুরি আশ্রমবাসী হইনি। নৈহাটী থেকে ঠাকুরের কাছে বাতায়াত করি। বলকাতার বায়নেশল ছিল কর্মস্থল। একদিন অধিন থেকে বাড়ী দিয়ে রাস্তাে ঠাকুর ঘরে বসে একটু জপ ঘ্যান করছি। ঠাকুরের জন্য হঠাৎ দ্রুত খুব ব্যাকুল হয়ে উঠল। আর কতদিন ঠাকুর। কবে তুমি কাছে টেনে নেবে? আর যে পারছি না সইতে। বৃকটা কেনম হাফাকর ক'রে উঠল। খুব কাঁদলাম ঠাকুরের দৃষ্টির সামনে। তখন একই হাল্কা হল মনটা। পরদিন

ভোরে স্নানকার মত খোঁছ ঠাকুরের কাছে । ঠাকুরকে দর্শন ক'রে প্রণাম করলাম । কপালে ✓ ভবভাষিণীর সি'দ্বয়ের টিপ দিলেন । জিজ্ঞাসা করলেন, “কুল তো ?” “হা ঠাকুর !” বলে প্রণাম ক'রে এসে বসলাম ভক্তদের মধ্যে । ঠাকুরের মণ্ডিরে আরতি তখন সূর্য্য হরে গেছে । শ্রীঅর্চনা যা ভজন গান নিকেন করলেন । শ্রীঠাকুর ও ভক্তরা শুনছেন তখন হরে । শ্রীঠাকুরের অশ্ব' জ্যোতির্ষ' হুণ দ' নরন ভরে দর্শন করছি আর শুনছি শ্রীঅর্চনা মার দিবাক'ে সূর্য্যের গান । গজকাল রাত্রের কোন স্মৃতি আর মনে ওঠেনি ঠাকুরকে দর্শন করার পর থেকে । ইতিমধ্যে আরতি শেষ হয়ে গেল । ঠাকুর বার্মাপেলের ভক্তদের হলবারে নিয়ে গেলেন দেখানকার নিতা দ্বিজিত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ মাকে দর্শন ও প্রণাম করার জন্য । আমাদের প্রশ্নের পর ঠাকুর আমাদের সতীর্ষ'ের দ' একজনের সঙ্গে দ' একটি কথা বলেই আমার দিকে অপর মেহমাখা কৃপা ভরা দৃষ্টি মেলে মধুর কণ্ঠে বললেন, “ভক্তের চোখের জল ডগবানের কণ্ঠের মণিমালা ।” শ্রীমুখে এই অশ্ব' বাণী শোনা মাত্র মনে পড়ে গেল গজরাত ঠাকুরের মন্দির সামনে কাহার কথা । আবার চোখ ভরে উঠল জলে । ভাবতেই পারিনি কালেকের অশ্ব'বাকুল দীন আকৃতিটিকে এমন ভাবে স্থান দেবেন গুরুদাসতার তাঁর চরণে ।

আমি তখন ব্রহ্মচারী । আশ্রমে থাকি । একদিন সকালে কথাহৃত পাঠ ও আলোচনার পর শ্রীশ্রীসারনা মার প্রসঙ্গ কিছু হ'ল । তারপর দীর্ঘ ভক্তরা, বিশেষ কি কারণে ঠিক মনে পড়ছে না, গোপালগের ভোগের জন্য ঠাকুরের চরণে প্রণামী নিবেদন করছে । একে একে ঘোঁষ উপস্থিত সকলেই নিবেদন করলো । আমারও ঠাকুরের চরণে কিছু নিবেদন করার জন্য খুব ইচ্ছে হ'ল । কিন্তু আমি যে কি করে ? আমার কাছে তো টাকা পরসা কিছু নেই । সব তো ঠাকুরের চরণে স'পে দিগেছি । অচ্ছ দেখার জন্য মন খুব ব্যাকুল হয়ে উঠল । কিছুতেই স্থির থাকতে পারছি না । সবাই দিল আর আমি কিছু দিতে পারলাম না । এই ভাবনার অস্থির হয়ে শেষে পাশের দ' একটি ভক্তের কানে কানে বললাম, “আমাকে দ' চার আনা ভিক্ষে দেবেন ?” কেউ চার আনা, কেউ আট আনা দিল । এইভাবে কিছু খুচরো পরসা সংগ্রহ ক'রে ঠাকুরের কাছে এসে তাঁর সামনে পরসাদ্যুঁলি মাটিতে নামিয়ে দিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করলেই ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি দিচ্ছ ? তুমি কোবার শ্বেলে ? তোমার কাছে তো কিছু থাকে না ।” বললাম, “ঠাকুর, এইমাত্র এখানেই ভক্তদের কাছে ভিক্ষা করেছি ।” আমার উত্তর শুনে ঠাকুরের পে কি আনন্দ ! প্রসন্ন হাসির দ্ব্যাজিত শ্রীআনন জ্যোতির্ষ' । বললেন “তুমি ভিক্ষে করেছ । বাঃ বাঃ ।” কয়েক শ্রুণামাী ঠাকুর স্পর্শ করলেন না । সেগুলো মাটিতে বেধনকার তেরনি পড়ে আছে । ভিক্ষা করেছি শুনেন সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহস্ত প্রসারিত ক'রে মাটি থেকে খুচরা পরসা কটি কুড়িয়ে নিয়ে নিজের কপালে ঠোকিরে বললেন, “এটিই আজকের শ্রেষ্ঠ দান । শ্রেষ্ঠ নিবেদন ।” তখনই একটি ব্রহ্মচারীকে ডেকে বললেন, “হ্যাঁয়ে এতে কি জিনিষ পাওয়া বাবে বলতো ? এক কাজ কর, সারসা মা খেলেভাজা খুব ভালবাসতেন । এতে ছেলে ভাজা বা পানি এনে ভেতরে দিয়ে সারসা মাগের ভোগ দিতে বল ।” আনন্দে আর চোখের জলে আমি তখন অভিভূত । “দুর্বেগ্যতনর ঐশ্বর্য' জাগে না চরণের কমল বিলাস— বেথানে দীনের আতিথি সম্বল, সেখানে বিদুরের ল'কালে বাখাভেই পড়ে দৃষ্টি প্রসাদ”—“যেগে যুগে যার আদা'র হুকে যার উদ্দেশ্য তোমারই শ্রীহস্তের লেখনী নিলু'ত এ শাস্ত্র বাণী, সে যে তুমিই প্রভু । কেন ভুলে যাই, যুগে যুগে এসে তুমিই কল্পছো লীলা অপরূপ রূপে !

স্বপ্ন বাস্তবে মিলে গেল

স্বামী পূর্ণানন্দ

শ্রীঠাকুর রোজ ভোর চুটী থেকে ভীষণ পৰ্বাঙ্ক ধ্যান করতেন গরুর খারের বারান্দায়। ধ্যান শেষে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতেন। পরে ঘান্নে যেতেন। ঘান্নের পর বারান্দার বাসে নাম পাঠ হত ও মাকে মাকে ভক্তদের কথাবার্তা বলতেন, উত্তর দিতেন। ঐ সময় সিঁদুরের টিপ দিতেন। পরে সকালে আর্যাত ও ভজন হত। আর্যাত শেষে ভক্তরা হোমের ভঙ্গ ও প্রসাদ নিয়ে যে দ্বার বাড়ী চলে যেতেন। ঠাকুরও মন্দিরে ঢুকে যেতেন।

শ্রীঠাকুরের দেহান্তের দিন চারেক পর একদিন রাতে স্বপ্ন দেখাচ্ছিল—ঠাকুর ধ্যান শেষে গান করতে বাগানের দিকের পুষ্ক বারিছিলেন। আমরা ছোটদের করেকজন শ্রীঠাকুরের চরণে রোজই ঐ সময়ে তুল দিয়ে পূজা করি। আমনও পূজা করার সময়ে শ্রীঠাকুর বলতেন, সিঁদুরের কোটোটা নিয়ে আম, সিঁদুর দেবো। আমি উত্তরে বললাম, 'ঠাকুর, কোটো তো হারিয়ে গেছে।' শ্রীঠাকুর বলতেন, না, কোটো হারাননি, ঘরেই কোথাও রয়েছে, খুঁজে দাখ।

ঠাকুরের কথা—তখন কিন্তু আমি খুঁজে পাই নি ঠিকই। কিন্তু ঐ স্বপ্নের কয়েক বছর বাদে অল্পকর আলমারিতে হঠাৎ সেই সিঁদুরের কোটোটি খুঁজে পেলাম। অলঙ্ককে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এটা কোথা পেলি? অণোর বলল—কীট দিয়ে গরুর ঘারে ফেলে দিচ্ছিলাম, আমি কুড়িরে পেরেছি। আমি বললাম, কীটি, কোটো এক সঙ্গে কি কখনও কুড়িরে এক জায়গায় পাওয়া যায়? তুই নিশ্চয়ই লুকিয়ে এনে রেখেছিলি।

কোটোটি আমি গুর কাছ থেকে নিয়ে নিলাম। সবাইকে গুটা সোঁখরে ঠাকুরের আলমারিতে জমা করে দিলাম। শ্রীঠাকুর স্বপ্নে আমাকে নির্দেশ দিয়ে পাওয়া করিয়ে দিয়ে দিলেন। আর আমার স্বপ্নও সফল হল পরোপদ্র।

শ্রীঠাকুর এই সিঁদুর ভক্তদের ও মেলেরদের দ্বি'কেলাই দিতেন, আর বলতেন, 'তোমরা সব একটা ক'রে ঠাকুরের মায়ের লুকটে সঙ্গে অবশ্য অবশ্য রাখবে আর কপালে সিঁদুরের টিপ দিলে তোমাদের অপসংভার হাত থেকে রক্ষা করবে ও বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাবে। প্রথমদিকে নিজের নাখে করেই এই সিঁদুর দিতেন। সেজন্য পরে হু'পার কাঠি দিয়ে ঐ কোটোর থেকে সিঁদুর দিতেন কপালে। আমরা ছোট থেকে শ্রীঠাকুরের এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লাভ করেছিলাম যে, ঠাকুরের দেহান্তের পরও বহুবার শ্রীঠাকুরকে স্বপ্নে নশন করেছি ও অনেকবার সিঁদুর পেরেছি। এত কূল হোত দেহান্তের পরও এক একদিন কূলরনে কপালে হাত দিয়ে দেখতাম সিঁদুর আছে কিনা। এও স্বপ্নে অনেকদিন দেখাচ্ছিল—ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে আলোচনা করতেন বা আমাকে কোন কাজের জন্য বলতেন আমি কাজে চলে গেছি ও সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে গেছে। তারপর ঘন খুঁকই খরাপ হোত। বন্দ স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে দেখত পোতাম কোথায় ঠাকুর? অল্প স্বপ্ন দেখার সময় ঘন হোত ঠাকুরের কাছেই কসে আছি।

ফুলের কবি সত্যানন্দদেব

ঐত্রাঙ্গনারায়ণ যুগোপাধ্যায়

মেজিষ্টেশন্‌ ছাড়া সত্যিকার ভাল ও গভীর কবিতার সম্ভাবনা নেই। মনে পড়ে এক স্মরণীয় সন্ধ্যার কথা ;—
বার বার কৃষ্ণচূড়ার ডাঙের দিকে চোখ পড়ে। বিবীকশপী কল্লনার রাজ্যে জাগরে রেখেছেন স্বপ্ন। শব্দকে নিয়ে
গাঁথা হবে দেবার্ণিক ফুলের মালা ; আবেগ কল্পিত দেবতনু—তা কবিতা ছাড়া আর কি ? এ বেন—দেখলাম দৃ-তক্
ভরে হে প্রভু, ঈশ্বর চৈতন্যের প্রথম সূত্র।

হেমন্তের সন্ধ্যা বাঁধা ছায়া-মেঘ খেলা করছে গম্ভীর বকে। কিস্কি সন্ধ্যার সাগরের গুব—সাদাশ স্বাক্ষর
কাব্যের ধ্যান।

এরিস্টটল বলেছিলেন ‘কবিতা দর্শনের চেয়ে বেশী, ইতিহাসের চেয়ে বড়।’ এই সেই বাস্তব ভূমালোক, যার
যাচা আশ্বাস অমলিন প্রতীপালোকে। মাল্লিকের পর্বত ফুলের নকশা। সের্বশকপী সুকুমার তনু ধ্যানলীন। বৌদ্ধিক
রূপান্তরে শান্ত শতঙ্গের নির্বেদিত মহিমা। এক গভীর ‘কমল’ বা ধ্যানসায়ের অঙ্গোচ্চরে আছে ফটে। ঘাসের বকেও
বৃক নিভারী শিশির কথা।

সারিতোর আকাশে আলোর ফুলকি, আর অমুগ্ধ ফুল কবির কাব্য মালিকার। আলোর রাজ্যে আছে
রূপের গভীরে। ধ্যান-গভীরতার আলোর কুঁড়ি উঠছে ফুটে। চেতনা কীর রূপের ডালায় সাঙাতে। বড় অসম্ভব
যাত্রী। ফুলের রূপে ঘেঁষে বার বার মূখ্য বিশ্বের দাঁড়িয়ে থাকার শব্দ আনন্দ অনুভবী চরিত্রের কথা মনে পড়ে যায়।
ফুলের জলসার সবাই এসেছে চরিত্রিকের চারপাশে আলো ছড়াতে। এর জন্যই তো চিরন্তন অভিনয়—বা ব্যাপ্ত ব্রহ্মের
সোনার মিস্টিক। এ বেন অপূর্ণ আনন্দাভিসার তথা পরম পূর্ণতার পূজার নির্বেদিত হওঁতার কেনবন্দন ; যা উৎসর্গের
দেয় সৃষ্টির মধ্যে। স্বামী সত্যানন্দদেবের কবিতার নিদর্শ আনন্দে নদীর পরেই আসে ফুল, চাঁদ পাখির কথা।

‘ফুল সূর্যের হও—’ এ শব্দে জীবন গড়ার বাণী নহ, কবিতার মাল্যেও সৃষ্টিচর্চার শিল্পভবন। কবিতার
ভিন্ন কুমুদলে প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা কবিতার তিন সূতোর মালা।

স্বামী সত্যানন্দর কবিতার ‘ফুল’ বা ফুলে আনি তা কবিতার অনেক কিছু, হয়ত বা সব কিছু। সেই ফুল
বা শব্দেই অন্য এক নাম ছুঁয়ে থাকে কবিতার অবলম্ব প্রতীকার লাভে। ফুল ছড়াতে ছড়াতে কণ্ঠ ঘিরে পার
সাম্প্রতিক মাধুর্য।

‘স্বামী সত্যানন্দ হত বড় কবি তত বড়ই সুর সাক্ষর’। তাঁর কবিতা অনর্জিত গম্ভীর নিভৃততার আভুর।
সম্মতিতে ‘ফুল’ শব্দই অন্য নাম—বা কেবল স্পর্শ করে থাকে কবিতার ভাব থেকে। এর কোন প্রতিশব্দ হয় না।
প্রতীকী কন্যাতার পাহাড়ী বাড়ি পথে শৈল পুষ্পের সাথে করণার অলাপ গাঁপসায়েই সেয়ে নিতে হয়।

বাস্তবিক থেকে স্বপ্নপ্রদাতা পর্বত যে কোন কবির কাব্যের পাতা খুললেই দেখা যায় ফুলের অঙ্গুর সমাবেশ।
যা আঙ্গুর রূপকী কবিতার চরণেও নিঃশেষিত হয় নি। অনভিজাত ফুলের শিখ হাতখানিতে কবিতার সাদা জিলেছে।
ফুলের রং-এর প্রতিও কবিতার ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ দেখা যায়। সামাজিক দৃষ্টির নগ্নিত মানবতা ও ফুল সাদে আধুনিকতা
সম্মার সমর্থ। স্বপ্নপ্রদাতা এ সম্পর্কেও বস্তুকি বলেছেন ‘ফুল ফোটে গারুর ডালে, সেই তার আশ্রয় ; কিন্তু মানব
তাকে আপনায় মনে স্থান দেয় নাম দিয়ে।’

ফুলের কবি নামে খ্যাত গোকুলনাথ থেকে শ্রুত্ব ক'রে আধুনিক বাংলা কাব্যের ফুলের বিচিত্র সমাবেশ অবিস্মরণীয়। ফুল পুঞ্জার সামগ্রী এ ভাবনামণ্ডে কবিচিত্র বার বার সমীর্ণিত হয়েছে। ফুল অনেকক্ষেত্রে কবিচিত্র শব্দভাণ্ডারের প্রতীক পবিত্রতার বিশেষ চূড়িকা গ্রহণ করেছে। বীক্ষাক্ষেত্রের সেই কবি বাণী—‘পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না আপনার হৃদয় কুসুমকে প্রস্তুতিত করিও’—এরই স্বার্থে পরিণতিত ‘ফুল সুন্দর হও’ দিব্যবাণীতে।

ফুল পরম সুন্দর স্বাক্ষরের বার্তাকে বহন করে চলে—সরসী কবি চিত্রে দার্শনিক দৃষ্টির উন্মোচন ঘটায়। ফুল মানুষকে “এমন এক নতুন বিজ্ঞানের স্থানে লইয়া যায়, যেখানে এত বেশী স্বাধীনতা যে এক প্রকার অনিশ্চয়তা অনির্বাচনীয়তার মধ্যে হারা হইয়া রাইতে হয়”, অলংকার নির্মাণের সজ্জাকে অতিক্রম করে ধ্যানের জগতে পুষ্প প্রসানে সুসম্পন্ন হয়। এই সত্যকে স্মেনে নিরেই স্বামী সত্যানন্দের কবিতার প্রবেশ করা যায়।

বাংলা কাব্যে গান্ধী ফুলের পুঞ্জারিনী মূর্তি, স্বেচ্ছাপ্রিয়নী বিভা গিরিপুত্রে পাবনীর শিবসাহসার তম্বা পুঞ্জার ধালিত আলো ফেলেছে। আকুল ফুল নীল হয়ে গ্যাছে নীলকমলটির কণ্ঠ আলিঙ্গনে। চম্পা হয়েছে সুবর্ণের বিকীর্ণিত—দিনেবৎক জানিরেছে নরমকার। প্রাচীন ভারতের পুঞ্জা অচনা ঐতিহ্যের স্মারক হিসাবে—

অকস্মে ফুটেছে জবা বিহারি কুঁপিত প্রভা

শ্যামা মা'র চরণ স্মরণ

সেখার কদম্ব ফুটেছে গ্যাছে মোরি পানে চেয়ে আছে

মন মোর বৃন্দাবন ধার।

পার্বত্যের মানস সরোবরে সত্যানন্দের সত্যসুন্দরের অকিনয়র প্রতীক হিসাবে নীলকমলটিকে করে গ্যাছেন বিকীর্ণিত। এ ছাড়া বাংলা কাব্যের কমল বিভাবনা তে নিঃস্বপ্ন। আমাদের লক্ষী পদ্মাসনা, সরস্বতী, দুর্গা পদ্ম লঙ্ঘনা। ব্রহ্মা পদ্মদীন। সত্যকে সুন্দর রূপে গ্রহণ করার জন্য একটি বৃত্তে এক গভীর দর্শনকে ভারতীয় কবিতার প্রকৃতি ভাবুকতার গ্রহণ করেছেন।

সাধক কবি সত্যানন্দ ফুল সুন্দরের কবি রূপে স্বার্থে স্রমসীরা দৃষ্টির অধিকারী। জীবন গড়ার সহজিয়া প্রকাশে কবি জানান—বড় হবার ক্ষণ তোমার বুকেই আছে বাবা। “...রকুন হব হব হুটব আমি / ছড়িয়ে দেব সুখ / ভারি দেব সবার মনে আবুল হুত কুখ।”

সত্যানন্দ কাব্যজননী জগন্মাতা সারসার রূপ বর্ণনায় ফুলেরই রিপুতা :—

সাতটি চাঁদের কুঁড়ি / চেরকা কাটে বৃড়ি

চেরকা সূতো ছিঁড়ে / স্রার এল ঘিরে

ছড়িয়ে পড়ে বল / সারসা কমল ॥

পরম পুরুষের জন্মদিনের প্রার্থনার কবির বাণী—তোমার জন্মদিনে / একটি কবাই নিও / ফুলের মত চরণভঙ্গে থাকতে আমার দিও। আবার ফোটা ফুলের গন্ধ বিব্রততার কবির মনে পড়ে বীজের মাঝে কলপিতার বিঘাট হওয়ার কথা।

‘অচিন দেশের বাঁশ’র ১৯ সংখ্যক গীত কুসুমের হরি স্মরণের অপরাধ চিত্র : প্রকাশ মাধব’ নন্দিত।

ফুলের বৃকে কুসুম সম প্রকাশ তোমার অনুপম

অন্তরে অন্। ছড়িয়ে আছে তবু কেন কুলাও হে ॥

কবি গভীর অজ্ঞপ্রকাশের জাননে ‘ফুল হয়েছে নাগরিক’ সে কারণে প্রকৃতির ফুল রাসিকও বড় পড়তে চায়।

২০ সংখ্যক কবিতার কবির রোয়াক্টিক মনের অভিমাত্রী স্মৃতি আবুহুতা ফুলের গুহ্ম আবহা হাসির আলো ফেলে। এ কাব্যে ফুলেরই জলসা হাদ্‌হানা, হুখী, কুশ, কেরা, কুন্ডুড়া, কদম এক এক ভাব নিরে আসে।

ক) চুপেই বন্ধন স্বপন আঁকা হৃদীর হৃৎক চঞ্চল লাগে

গ) কদম্ব ফেরার ছায়ার আলো / মাথের গম্ব উতল

খ) কন বনে কুল কোরা গম্ব গম্ব অন্ধকারে

ঘ) কুচ্ছাড়ার হৃদয় করা পঁখিয়ার কুল।

ফুলের রূপ সম্ভার অলংকার সমাবেশ দ্বিভাব্য সত্তারীত্যর অনুপম : কুচ্ছাড়ার রঙিন আঁখি বাদল ব্যথার ডাকলো নাকি লারলো ফুলের নর এ মালো / রোমন ফুলের গৃহি / চোখের ছেলের মন্ত্রিকা এ 'প্রাণ কখন শূঁচি ॥ ১২৪

সংযুক্ত কবিতার ফুলের মালার কথা বলছেন প্রভু গদ্যরত্নের ভাবনার। শিউলীর কথা কহোকাতে রূপের রসরসীলা অভিসার করেছে পরম পবিত্রতার। রবীন্দ্র কাব্যের মত স্বামী সত্যানন্দদেবের কবিতার গোলাপী বিলাসের ছবি আঁকা হয়েছে সেবতার অঙ্গ সম্ভার। কবি এখানেই আবার পাতাকরা দিনের বেশে শ্রীঠাকুরের আশ্রয় প্রতীক্ষার তাকিয়ে আছেন। হিমকরা মোর এই মনে ছিলে বল কোনখানে / হৃদয় গগনে তাকাই শূঁচি ফুটে গোলাপ প্ৰবপানে।

আবার এই গোলাপের গরবী হারিষ রূপ ভাঙতে কবির অরোজন—জনা মাত্রা যোগ ক'রে বা আত্মাঙ্কিত হলেও অমূলক। 'গোলাপের ভাঙবে পরব রক্তা মূখে হাসি মেলে / আরো তাই হাসল নাকি রূপ পিরালের চমক এ'কে।' বাল্যাপ্রবীর হৃদয় দিউলির আলিঙ্গন। হরি বিরহ কবির চিরকন রজন্য খ্যা পড়ে—

‘হৃদয় আঁকা ঘাসের ফুলে লামল স্বপন যদি সেলে

হৃদয় না হর বিগ্নে সেব আঘার সারা তন ॥’

ঘানের শাখা প্ৰপ্পাতে ফুলের প্রদান তেজ্জ্বলি পড়ে। বিশ্বপ্রকৃতিতে তিনি গ্রহণ করেছেন সত্যস্বরূপে। এই সত্যের আলো তার প্ৰপ্প জ্যোতি মিশ্র নিসর্গ তাকার গভীর ভাবে পড়েছে। চন্দ্রাবল্লভ মণ্ডপ কবির অরোধ্যা জননির সারদাশ্রী কিতার, প্ৰপ্পলের বিস্তারে বনলতীর অবিলাস পবিত্রীতে সূক্ষ্মর। অন্তঃগামী শিশির চৌয়া সন্ধ্যাকালে মধুর নপ্পের বন্ধন শোনা বার তখন নারিবেল বনে নেবুলী হাওরা কবিতক বিংশর বেদনার বাধিত করে। কৃষারী প্রাণের ভুবায় কবির মন বার বার আবুল হয়। সমাসোত্তি অলংকারের নিস্প্র প্ররোলে চাঁপার গাছটার একটি ফুল নিয়ে প্রতীক্ষারত হৃদয়, নরম হাওয়ার স্বর্ষমুখীর জীপদী নাচ সুর সভার নন্দনের বিভা ছড়ায়। চৌরীমুখীর প্রোষিত ভক্ত্যরূপে কবির ‘প্রথম বর্ষা’ কবিতার পাঠক-স্নরক নাড়া দেয়। মেঘবান্ধলের সন্ধ্যার স্বপন দূর থেকে ভেসে আসে অনন্তের সুর তখন নৃত্য ভঙ্গিমুখে যে ছবি আঁকে তা ফুলেরই হৃৎক নিভরানো প্রণতি চির—

কৃষাকুর স্বর্ষমুখীরা তেমনি আঘড়ে পড়ে জানাই প্রণতি— একটি পাখীর কঁপ কণ্ঠ ভেসে আসে / ছেলেরা
কড়ের ফুল কুড়ায়।

হেমন্তের অলস মঞ্চর, দৃশ্যেরে বস বস হাওয়ার সেল / ‘গছো গছো বাগন ফুল’, হৃদয়ে ডালিয়া ফুল ফুটে থাকে। সন্ধ্যার সেবতাকতে কবি সাবাহন জানান এই মথ্যাহ জড়নো ফুলের বাসরে। মাকলী ফুলেরা বনে উদাস পাখা মেলে উড়ে যেতে চায়। কবির আকাশে বন্ধন ভাবের আকাশে জাগে, তখনই কহুক ফুলের ডালে লাগে আলোর ছোপ। কহু জড়নো চাঁদের মত কুচ্ছাড়ার ডালে বন্ধন মটৌ লাল ফুল ফোটে তখন নিসর্গ বিশ্বরতার ভরে বার। ‘ইতো এক স্বপ্নভাঙা সলীল’, তার ছোয়া লাগে অকস্মের হাতের দৃকনো ভালটায়। আর পাঠক অশ্রু ক্রিমের দেখে—‘বৈশাখীর আকাশটা ছেরে গাছে নীলকান্ত মেঘে।’ আর পরভের কান্না বামা সদা মেঘ যে কবির কাব্যে নীল আকাশের গারে ফুল কাটে এ কথা হুঁলি কি ক’রে? হুঁই, চামেলী, বেলি, গোলাপের গন্ধে কবির কাব্যের ভোর হয়।

শূঁচি বন প্রকৃতির রূপ সম্ভার নর, অটল গম্ভীর প্রশস্তরীকৃত সৌন্দর্যের স্বয় হৃৎক কবি—সেলী হিমশী ফুলের একর সমাবেশ ঘটান। এ এক নতুন ব্যাটা—

স্বয় দেখে হিমালয়—নীল আকাশে এককালি রূপের চাঁদ। কনক্কাঁমেতে তখন নরম রোদের আবেজ, পাহাড়ী

নদীতে স্নান-নিকের সাথ, টুকরো টুকরো পাখীগুহা লেগে উঠছে নানা রঙে। তুলুই ফুলের কবির কাব্যে নতুন আগমনী সুর রচিত হয়। গোঁরা ঘরে উপলব্ধি পেঁটা ভেঙে নেমে আসছেন, তাই তো গোলাপ, রোজন, আইরিশ ফুলের গৃহিতে আগমনীর রেখা-দাঁড়।

একটি কবিতা ইন্টারের মধ্যে ফুল ফোটে। এরই অন্তরতম উত্তর স্বামী সত্যানন্দসেব। জগতের ফুলদানিতে বিচিত্র পুষ্প-মঞ্জরী। পুষ্প বনের গম্বুজে কখন মোহনের মধুর প্রসঙ্গ। সাধা আকাশের হৃদয়ে গানের ব্যাঘ্রের রূপ প্রাপ্তিমা সার্থক চিত্রকল্পের জন্ম দেয়। বসন্তের বাসন্তী রঙের সুতো আর বিষমতার রঙের হৃৎসরতীর ফুলে কবি বনে দেন এক অপূর্ব মালা। শূন্য মৃৎলাই ফুল নয়, শূন্যতার ষাড়া স্মৃতি, পবিত্র এবং মমতা স্মৃতি তারাও কবির কাব্যে আলোর কুঁড়ি হয়ে ফুটেছে। কবির কবিগতা অর্ধমুখী। রূপ তাকে মৃৎ করেচে, রূপাতীতের ব্যঙ্গনা ধ্যান চেতনাকে উদ্ধৃত করেছে। অম্ল মোতির মালায় জীবনের গান ফুল হয়ে গ্যাছে। চাঁদের কুচি কুচি সৌন্দর্যের তরঙ্গ জীলার শিশির ফোটা কমল মহাকাশের হৃদয়ে গভীর ভাবে সাজানো থাকে। সব শেষে বালি কবির কাব্যের বাউল এক বিশেষ চরিত্রে মাঠে। বাউলের রূপ সন্মিলন বিশ্ব প্রকৃতির ফুল বাধ পড়েনি। —বাউলের একভাষাতে মউল ফুলের মালা আর ডালিম ফুলী পায়ে যে তার হৃদয়ের নুপুরে বাঁধা। ফুলের ছবি কবির কবিতায় শূন্য নিকা চিত্রায়ন নয়, আপাত ধ্যান লীন হৈম সম্মানসের গৌরব বিলাসেই নতুন মন্দির—বার চারপাশে কুমুদ আছে ফুটে ॥

—ঃঃ—

“দীন নিবেদন”

ত্র: পশুপতি

ভগবান কথা বলেন সাধু মহাশয়ের মধ্য দিয়ে। আর সাধু মহাশয়ের সঙ্গ করলে মেলে আশীর্বাদ। মিলেই। আমার জীবনে এইভাবে এসেছে এমন কৃপার ঢেউ, আশীর্বাদের কন্যা, যা ছাড়া আমার জীবনের কত মান হয়ে আছে প্রাপ্তি এবং নিশ্চিত অনাগত ভবিষ্যৎ হয়ে বাবে আলোকিত। যেহেতু হৃৎসরতীর ভগবান শ্রীশ্রীস্বামকৃষ্ণসেব ও ভগবতী শ্রীশ্রীসারদামণিকে দেবার সৌভাগ্য হয়নি, তেমনি সৌভাগ্য হয়নি তাঁদের অন্তরঙ্গ পার্শ্বদেব দেবার। কিন্তু সৌভাগ্য হয়েছে এমন একজনকে দেবার, তাঁর কাছে বাবার এবং তাঁর চরণ প্রসাদ পাবার, যা নিয়ে একান্ত গৌরব করতে নিশ্চয় পারি। তিনিই আমাদের প্রাপ্তবৃত্ত ঠাকুর সত্যানন্দসেব আনাদের ঠাকুর—আগামী মাঘী কৃষ্ণাষীত্তীর তার শূন্য জন্মোৎসব পালিত হবে এবং সেই জন্মোৎসবের এই দীন সত্যানের দিনলিপি থেকে শ্রীঠাকুরের কিছু আশীর্বাণী উদ্ধৃত করে পরাজল গম্বুজের মত নির্বোধত করছি তাঁর শ্রীচরণাঙ্ক এবং এই প্রার্থনা—“ঠাকুর, তোমার অমৃতকী কৃপা ও ভাসবাসার উচ্চতার আমার যে জীবনকে কৃতকৃতার্থ করে তুলেছে তার শেষ পরিণতিও যেন ঐ শ্রীচরণাঙ্কে পরিসমাপ্ত হয়।”

শ্রীঠাকুরের কাছে কৃপা প্রার্থনা করার পর তাঁর নির্দেশে গেলাম “পূজনীয়া দুর্গা মা’র কাছে আশীর্বাণী প্রার্থনা করতে এবং শ্রীঠাকুরের কৃপার, “পূজনীয়া দুর্গামা” আশীর্বাণী করলেন [আমি আশীর্বাণী করি বাবা তোমার গুরু চরণে রাত থাক’, বিশ্বাস থাক’ এবং গুরু তোমার কৃপা করুন, তুমি অমৃতারিত হও] শ্রীঠাকুরকে জানাবার বিষয়দিন পরই তিনি সন্মানরূপে কাছে টেনে দেন ?

স্বরণে আসে শ্রীদুর্গা নিসৃত প্রথম উপদেশ এই দাঁড়ের প্রাতি চরিত্রকতা, পবিত্রতা ও নিষ্ঠা হোচ্ছে জীবনের

প্রধান। এই তিনটি রাষ্ট্রই তখনই সোচ্চারে চলি বাবে রামকল্লোলকে জীবনান্তে। বিভিন্ন সময়ে প্রায় রাষ্ট্রই তখনই সন্তানদের সামনে “স্বপ্ন কি ? এতদ্বারা কি স্বপ্ন” এবং নানারকম উত্তরের পর মামালা ক’রে বললেন—“মানুষের লক্ষ্যমণ্ডলই স্বপ্ন।” প্রাথমিকী তাঁর স্বপ্ন রূপ সম্বন্ধে বলেছেন যে, আমি মামালাই হই আর বাই হই, আমি হিম্মতু সেই পঞ্চতী মূল ঠাকুরের কাছে সেই নগরই, সুতরাং স্বপ্ন হচ্ছে শৈশবস্থার “সুতন”। আবার কখনও প্রায় রাষ্ট্রই “সন্তান দর্শক কি ?” হিম্মতুই কি সন্তান দর্শক Philosophy এবং Religion কি এক ? সংজ্ঞাদান কি ? নানারকম উত্তরের পর মামালা ক’রে শ্রীঠাকুর বললেন—আন্তিকাবাদই সন্তান দর্শক, হিম্মতুই সন্তান দর্শকের একটি অংশ, Philosophy হচ্ছে ঈশ্বর আছেন কি—নেই তারতত্ত্ব অর্থাৎ Theory আর Religion হচ্ছে ঈশ্বরকে লাভ করার কার্য অর্থাৎ Practical। স্বপ্নরূপ, চৈশ্বর্যরূপ ও আনন্দ স্বপ্ন। যেসে ব্রহ্ম, পুত্রাণে কৃষ্ণ ও তন্ত্রে শ্যামারূপ। একদিন সকালে কথামত পাঠ্যে শ্রীঠাকুর প্রায় রাষ্ট্রই—জীবন সাধনের মূল সূত্র কি ? এবং পরে বললেন—“যে যেনা কিছু সূত্র আমি বৃষ্টি না বা জানি না, আমি একটি সূত্রই জানি,—নিজে যা করেছি বা জেনেছি সেটি হচ্ছে পবিত্রতা, হাড় শৃঙ্খল পবিত্রতা, যদি এটি থাকে তবে ভগবানই বল, ঈশ্বরই বল বা মাই বল সব তোমার কাছে অর্মান এনে পড়িয়ে। আর আমি যদি ঠিক ঠিক পবিত্রতা পালন ক’রে চলে থাকি তবে তোমরা অবশ্যই তার অংশ পাবে। যেমন পিতার সম্পত্তি পুত্রের অংশ।”

শ্রীঠাকুরের কৃপা কথা অমূল্য। আর দু’একটা কৃপা করার উদ্দেশ্য ক’রে আমার নিবেদন শেষ করছি। একবার শ্রীঠাকুরকে পরিপ্রশ্ন করেছিলাম “গুরুকৃপা কি।” উত্তরে বললেন “সেই গুরুকৃপার একটা অর্থ আছে—ভূমি গুরুকে ভূমি ক’রে আশীর্বাদ লাভ করলে। তাঁর আশ্রয় গুরু আছেন, সেই গুরুদেবেরও গুরুদেব আছেন, এইভাবে একটা একটা Link বা chain-এর সৃষ্টি হয়ে গেল। Chain-এর একটা প্রায়গার নাড়া দাও তাহলে দেখবে সমস্তটার একটা Vibration এর সৃষ্টি হয়। গুরুকে প্রার্থনা জানালে, তিনি তাঁর গুরুকে appeal করলেন, তিনি আবার তাঁর গুরুকে, এমনি ক’রে শেষ পর্যন্তের কাছে গিয়ে পৌঁছায়, একেই বলে গুরুকৃপা। কিন্তু যদি গুরুকৃপার মাঝে ছেদ পড়ে যায় তখন সেই প্রার্থনা, সেই appeal আর পরের পৌঁছায় না। প্রসঙ্গতঃ শ্রীঠাকুর তাঁর এই দীন সন্তানকে বিভিন্ন সময়ে কৃপা ক’রে বা আশীর্বাদ করেছেন, বা আমার ইহপরকালের পাঠ্যে, এখানে তুলে ধরে দ্রাব্য নিবেদনের সমাপ্তি টানছি।

(১) কল্যাণীনের ব্রহ্মপুত্র হঠাৎ বন্দন কল্যাণীবিদ্যাট ঘটে, তখন শ্রীঠাকুর বৃন্দ চিত্তিত ছিলেন পরে তাঁরই কৃপার পুত্র নিরোগ হয়, সেই সময়ে বলেছেন ‘মাতা’ তোমার কোনো চিন্তা নাই। ঠাকুর তোমার জন্য চিন্তা করছেন, বন্দন যে অবস্থায় আসুক সমভাবে ঠাকুরের গান বলে নেবে।

(২) ঐ বন্দনই দ্বন্দ্বাঙ্গের ব্যাঘ্র পূর্বদিন সকালে আমাকে বললেন “পদপাতি আমি খুব চিন্তা নিয়ে যাচ্ছি। ভয় কি ? ঠাকুরকে ভাক তাছাড়া ভূমি তো আমার স্বর্গভিত্ত আছে।

(৩) শ্রীঠাকুরের সিন্ধী বা দ্বন্দ্বাঙ্গের থাকাকালীন সময়ে আমি সপ্তাহান্তে একবার কখনও গুরুর পর্বান্ত শ্রীঠাকুর বন্দন মানসে যেতাম। সেই সময়ে আশীর্বাদ করেছিলেন “ভূমি তো রামকল্লোলকের Daily Passenger অর্থাৎ কিনা নিত্যযাত্রী”।

(৪) ব্রহ্মনগর আগ্রহবাসের সময়ে কোনো একটা ঘটনার পর আশীর্বাদ ক’রে বলেছিলেন “ভূমি অমরত্ব”। কখনও রক্ত ক’রে সহাস্যে বলতেন ‘পদপাতি’ অতঃ পরে কেন কাছে এসে বস’ আজ শ্রীঠাকুর লেগেই আমাদের মধ্যে নাই ঠিকই কিন্তু দুঃখমূলেই তিনি নিত্য বিরাজিত এবং আমাদের সমস্ত প্রার্থনা যদি ঠিকমত হয় তবে নিশ্চয় সেটি Chain System এ শ্রীঠাকুরের চরণাঙ্কে পৌঁছাবে এবং তাঁর কৃপা লাভ সম্ভব হবে।

প্রথম দর্শন

ঐশ্বর্যবোধপূরী

পাঁকপেছরে ভাবে তোলা বাড়লের সেই গান তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে গাই, সেই সঙ্গে আর এক ভাবুক চমকে প্রথম দেখা দিনের ছবি লীবনের পাতার রং তুলি দিয়ে আজো আঁকি। পল্লবের বাড়ল গাইতেন—

“এবার আমি ভাল ভেবেছি

যে দেশে রজনী নাই

ভাল ভাবীঃ কাছে ভাব লিখেছি।

সে দেশের এক লোক পেয়েছি।”

.....কেমন ক’রে কোথায় পেয়েছি সেই অপরূপ ভাবুককে— কতদিন কতখানি তৃপ্ত ছিল আমার এই মন—মনে কাঠামো আগে কেমনটি ছিল, সেই কথা একটু বলি—

ছোট থেকেই একটা স্বপ্ন গড়াইছিল মনে। বাড়ীর কড়ের গাছটার মাঝে সে স্বপ্ন কে’পে কে’পে ওঠে। দানা বাঁধে না। কিন্তু তেঁসেও যায় না ভীষু স্নানের মাঝে আলোছায়ার আল্পনা আঁকি। একদিনকে নতুন কিছ, অপরিদকে চির পুরাতন গতানুগতিক রীতি নীতি। তবু হল ফেলি মায়ের কাছে—বিরে করবো না। সকলের জন্যই থাকব, সেবা করব, ভাল মেরে হব। অপরিত কদম আর মন; ভাল কি—কিছারিত ব্যাখ্যা নেই। কি ভাল কেমন ভাল। তবে স্কুলে একটা ধারণা ভাসত যেন। একটু বড় হয়ে যা ভাবা দিতে পেয়েছি—ভাতে মনে হয় মৃত্যু স্বাধীন অন্তর। সংসারে সাধারণ মানুষের দিনগত গণ্ডাবদ্ধ ভাল ছিড়ে ফেলে সেই নিম্মল আনন্দ লাভ। যে আনন্দ কৃষ্ণকের নয়, চিরদিনের।

বাবা পুজার ছুটিতে পশ্চিমে তীরে কিংবা কোন জলহাওয়া পরিবর্তনে সন্ধ্যাকে নিয়ে যেতেন, সেবার মধ্যপরে গেছি আমরা। সেখানে দুটি কুমারী ব্রাহ্মণের মেরে বেশ অস্বাভাবিক বাড়ীর। তাঁরা দুই বোনো দুটি মন্দিরে শিম নিয়ে জ্বীন কাটিয়ে দিচ্ছেন—পুজা-অর্চনার, ধ্যান-ধারণায়।

আমার মা আমার বলতেন “তোকে অর্চনা ক’রে দেব”। মনে হ’ব আনন্দ হলেও মায়ের কথার তেমন ভরসা ছিল না। মা অত্যন্ত ভাল মানুষ নরম প্রকৃতির। বাবার কথা মনে করেই উৎসাহ মনে যেত।

বিরে যে করবো না একথা বলার সাহস ছিল ছোট থেকেই। পুর্নশ্রমের কড় জামাইবাণু আমাকে বিরের নামে চোতেন। একদিন হ’ব রেগে গিরে বলছি বিরেরে করবো না তো বির বির। তিনি বাল্লেন—আজ্ঞা লিখে দে তো কাগজে। উনি ছিলেন উকিল। আমার হ্যাণ্ডরাইটিং-এর মত বড় কড় হয়তো লেখা “আমি কখনও বিবাহ করিব না”। লেখা কাগজটি একটি বামে ভরে মন ক’রে রেখেছিলেন এই ভেবে যে সময়ে বার করে জন্ম করবো। কিন্তু বহুদিন পরে এতদিন তিনি শ্রেয়-অশ্রুতে আমার ঐ লেখাটি ফেরৎ দিয়ে ফেলেছিলেন—ইনস্পেক্ট্রেস, (উনি আমার ঐ বলে ডাকতেন) আমি তোমার কাছে পর্যাঁজত। এখন আমি আমার সাধুজীবনে।

বাড়ীর সঙ্গে একটু তালভঙ্গ ধরধারণ ছিল আমার। খুব খোশী থাকে বলে স্ট্রেট, কাট। মিস্টার, প্যান পেন্সন, ন্যাকামি ভাব ইত্যাদি স্বভাব্য ছোট না। ইস্কুলে কতরা ভালবাসত চিটাররাও কিন্তু বুকভের এর ধর আর এক ধরগে। খুব সামান্যই আর পল্লববাদীতার পক্ষপাতী যে সব বাছুরা আমার ঘাড়ে তারা হ’ব প্রিয় ছিল।

এত কথা যে বলছি এই জনোই যে অনেক ছোট থেকেই এমন একটা মন আমার মাথা খুঁড়তো। কি যেন খুঁজতো। বিশেষ একটা মন যেন তৈরী হাচ্ছিল কবে থেকেই। শ্রীঠাকুরের দর্শনের আগে থেকেই।

তাই মা হঠাৎ একদিন বল্লেন—এখানে একজন সাধু মহাপুরুষ আছেন তাঁকে আজ দর্শন করতে যাব—সঙ্গে সঙ্গে আমি বল্লাম “আমি যাব”। মা বল্লেন—ইস্কুল আছে না? আমি বল্লাম—ছুটি নিয়ে আসব। প্রতিমা বলে

ভাইকি সেও ছুটী নিরে এলো। বোড়ার গাড়ীতে মা, দ্বৈতসম্পর্কের একজন আশ্রিতা বিধবা তাঁকে মাসী বলি তিনি ও মেঠুত বৌদি বস্তুমানে তিনি আশ্রমের অঙ্গপর্ণমা। সকলে আশ্রমে রক্তা হল্যাম।

এখনি কখনো কখনো সাধুসম্পর্কনে গৌড়ি মায়ের সঙ্গে। মায়ের সাধুসম্পর্কনের আকৃতি প্রকল। গ্রামপুত্রে (বৌড়ভূমে) বনপুত্রের ভেগা আশ্রমে শঙ্করবাবা নামে এক সিদ্ধ বোগনী মহাপুত্রকে মার সঙ্গে দর্শন করতে বাই। চক পতির তখন। শঙ্করবাবার আশ্রমের ঘরে ঘরে রেডাঙ্কি—মা সাধুবাবাকে বলছেন “আহা এমন সুন্দর জায়গা ছেড়ে যেতে মন হয় না”। আবারের দু'বোনের দিকে আসল দোঁখের হেসে সাধুবাবা বলেন—এই যে বোগমারা, মহামারা এরা, বলে হাসলেন—আমি তখন বেশ ছোট হলেও তাঁর সেই শিশুর মত হাসি সারা অর ভয়ে ঢাকা আর মাথার জটা জাল; এখনও মনে পড়ে। আরও মনে পড়ে বাবার ও মায়ের সঙ্গে গিরে দেওঘরে বালানন্দ মহারাজের সেই শিশুর হাসি, বিগাট জটা। খড়ম পায়ে কৌপীন পরে শিকারা থেকে ছান ক'রে উঠে আসছেন। বাবা, মা হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বার বার বাবাকে বলছি—ঐ শিব আসছেন, ঐ শিব আসছেন, নয় বাবা? আমাদের কাছাকাছি আসামাও আমাও দিকে তাকিয়ে — “এ লালী” বলে সেই এক মূখ হাসি। এখনও ভুলিনি কিন্তু ভরে বাবার হাত চেপে রেছিলাম।

আর একজন সাধু তিনি প্রচণ্ড থেকে এসেছিলেন। আমাদের বাড়ীর পাশে খোলা প্রাঙ্গণে আমশাছ তলার ধনা জুড়িয়ে ভয় মেখে আসন করলেন। বাড়ীদেহ সকলেই তাঁর সেবার জন্যে আগ্রহী থাকত। ছোটদেরও আনা-গোনারও বিরাম ছিল না বিশেষ খোকনদার ও আমার। তিনি হাত দেখতেন আমার হাত দেখে বলছিলেন—একদিন “খোকী ভুঝো ভগবানমা দর্শন মিললো”। তখন আমার ধারণা আকাশের দিক থেকেই ভগবান নেমে আসেন। তাই উপরের দিকে তাকিয়ে আনন্দে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—“কোন দিকে দেখতে পাও?” সাধুবাবা তখন অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন বস্তুমানে যেখানে সিউড়ির আমাদের আশ্রমটি।

সাধু বলতে তখন এরূপ ধর্য্য ছিল সেই আশার সৈন্য বোড়ার গাড়ী থেকে আশ্রমের দরজার নামলায়। মা মাসী বৌদি কোনদিকে গেল মনে নেই। আমি আমার প্রতিমা আশ্রমে কুরোর পাড়ে বসলাম পশ্চিমদিকে মূখ করে। মনে কল্পনা বাসা বাঁকে ঘরের তিতর ভগ্নাবৃত জটাধারী সাধুবাবা আছেন। ধনা জুড়েছে। সাধু বলতে জটাধারী কমলীবাবা লাল চোখ গম্বিকা সেংনে। এসব ধারণায় হরত একই ভাঁটি তাঁতি আমার ছিল। তাই মায়ের আগে বাক' পরে প্রতিমা আর আমি যাব একই খেমে টেমে। সটান বাবার সাহসে তখন হরত ঘাটতই ছিল। হঠাৎ আশ্রমের প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে আমার চোখ আটকে গেল। সিঁড়ির নীচে ছোট ছোট ১০১২ জন ছেল-মেয়ে পাতার ক'রে খাচ্ছে “একজন দাঁড়িয়ে আছেন বাকি দেখেই আমি প্রতিমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম—“দেখ, দেখ, পতু কি আশ্চর্য”, কি সুন্দর কি অপূর্ণ মানুষ্য, ইস্ কি রকম দেখ। প্রতিমা বলে—“অঁথি বোধ হয়।” আমি বললাম—“অঁথি নয় তাহলে একটা হাত উপরে থাকত”। আমাদের এদর বলারবির মাকে, তিনি মায়েরের ঘর বলে বৌটিকে বস্তুমানে সৈদিক দিরে মান্দির হয়ে ইঙ্কল ঘরে চলে এসেছেন। ঐ ঘরেই মা, মাসী, অঙ্গপর্ণা মা স্থল আছেন।

ইতিমধ্যে আমি মান্দিরে চলে এলাম আর সাধুনেই বিবেকানন্দ শ্যামার একটি আঁত সুন্দর ছবি দেওরালে টাঙানো দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। সেই ছবি দেখাছি তো দেখছিই। পতু এর মাকে মায়েরের কাছে দিচ্চ ইঙ্কল ঘরে বসছে। হঠাৎ আমার মায়ের গলা ঐ ঘর থেকেই ভেসে এলো—“এটি আমার মেহে, ও বলে ঝির করব না।” আমি শ্রীটাকুরের বয়ের কাছাকাছি ঘাঁড়েরের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে ঐ দিকে তাকিয়েছি, হঠাৎ অমৃতকরা আঁত সাক্ষ্যের আপনকরা একটি গভীর ডাক—“আর”। যেন কত আপন হতেও আপন যেন কতকালের। এত চেনা ছান। এক মেহ মাথবেরের শিশুভায় বক যেন ভরে গেল। আমি কি রকম যেন হয়ে গেলাম। ভাল ক'রে তাকাতেই দেখি কলাপ দৃষ্টপাতের

প্রসন্নতা মাথা। শ্রীমদ্ভগবান এদিক পান। আমার পলকের দৃষ্টিতে নানা অনদ্ভূত। শরীর ও মনের। বা অন্ধভব করা আর তা ভাষায় দেওয়া আর না আলাও। অনদ্ভূত নিষ্কল দাঁড়িয়ে মন্দিরে। এত ভালাবাসা মাথা ডাক এ যেন নুভন নর। তাঁর দিকে অপলক চোরে আঁধি আচ্ছন্নের মত। আন্তে আন্তে এগিয়ে গিয়ে চৌকাঠের ওপাশে ঠাকুরের বদার পাটার কাছটিতেই বসে পড়লাম। সন্নিহিত ছিল না। একটু পরেই কোলাল হতে ত্যাগভাঙি প্রণাম করলাম। একটু পরে আমার মাথের দিকে তাকিয়ে আমাকে লুক ক'রে বলেন—“বুদ্ধিমত্তী মেয়ে।” আমাকে বলেন—“দেখি তোরা হাতটা।” আমি ডান হাত বাড়িয়ে দিতে বলেন—বা হাত দেখা। সেবে মায়ের দিকে ফিরে যেন—“সবাই কি আর এক কোট পরে।” আমার মনে হয় বোধ হয় তিনি বলতে চাইলেন (বিত্ত করা বা বাঁধাধরা জীবন সংস্কে) আরও বলেন—“হিঁদ্রতে তো কত মেরে কত কল্যাণ কাজ করেই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে।” আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা তোরা কোন মেয়েসেী ভাল লাগে বলত? আমি বললাম—কুক, কালী, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, শ্যামিজী সবাইকে। (তখন থেকেই রিপন কল্লের পড়ত কলিকাতার কোন বন্ধুর কাছ থেকে শ্যামিজীর বাণী দুটি চাটটি বই নিয়ে আমি তাই পড়ছি। তাই শ্যামিজীকে চিনতাম) ঠাকুর হেনে বলেন—“সবাইকে? আচ্ছা তোকে যদি কেউ ইতিহাসের কোন চরিত্র ভাল লাগে শুন। সবাইকে ভাল লাগে বশু? সবদিকে টিপে ছুঁড়ি? আমি বললাম—আমাদের চারিদিক ভাল লাগে বল। আর কোনদিকে টিপে ছুঁড়বে আপনাই বলে দেখেন।” এমন আর একটু কাছে থেকে শুনালেন—“বারও শব্দ দেখাছিন্ কখনো? আছে আছে বল।” আছে আছেই বললাম শব্দের কথা তখন শুনে বলেন—“হা, এ দর্শন ঠিক। এইরকম স্থানে, এই ভাবে থাকেন। স্থানটিই এই নাম।”

এরপর আরম্ভ হোল আমার প্রকৃতগত কল্যাণি ছেলেমানুষি শব্দভাবের মনোই। তাই নিয়ে রক কৌতুক। অনেকগুলি ভাষার কথাবলার পর এখন হালকা খেলার শিক্ষা—শ্রীম যেন ইতিহাসে কতকালের, কতদিনের কত চেনার মত কাছটিতে বসে আঁধি। কোন বিধা নাই। সংস্কাচ নাই, একবার মনে হচ্ছে না একটুই দেখলাম তাঁকে। ঠাকুর হানি আর কৌতুক ভরা চোখে হঠাৎ আমাকে বলে বসলেন—“তোদের গজলেন্ ইন্সকুল।” বৎস। ঠিক। মায়ের ঘা পড়েছে। ইন্সকুলকে আমি সত্যিই বুঝে ভালবাসতাম। বাড়ীতেই এই নিয়ে দাদারও ক্যাপাসত আমাকে। আমি কল্যাণ করতাম। আমি ছোর দিয়ে বললাম—“কখনো না, আমাদের ইন্সকুলে প্রতিদিন প্রার্থনা হয় প্রকমে। ঠাকুর বলেন—কি প্রার্থনা হয়, আমি বললাম—“রবীন্দ্রনাথের—তোমারি গ্রেহে পালিত মেয়ে, আর চির নবীন শিব সুন্দর হে” এই রকম আরও কত প্রার্থনা সঙ্গীত হয়। ঠাকুর বললেন—এ গান হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান ছাড়াই সকলে করে? আমি বললাম—হ্যাঁ। ঠাকুর বলেন—তবে বলত শিব মানে কি? আমি বললাম—“স্ক্রুট”। পড়বে শুনালেন, সে বলে—“সৃষ্টি কর্তা।” ঠাকুর আমাকে বলেন—ডিক্সেনারীর মানে কল্যাণ যে। আমার শব্দভাব মত বা মনে আসত সঙ্গে সঙ্গে বলতাম। কেউ শিখরে বা বলে দেয় নি। সাধুসকল সঙ্গে ইতিপূর্বে কবাব গুণিগি যে ভেবে চিন্তে গড় পিষ্টে বল। পড়াশুনা তো এখন নীচের দ্রাসে। বিদ্যা বুদ্ধি তেমন। কিন্তু কি ছিল অবতন মনে। বা নিজে থেকে বেরিয়ে এল। বললাম—“আমরা তো ডিক্সেনারীর মানেই বল। আপনাই বলে দিন কি মানে।” ঠাকুর প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে বলেন—“শিব মানে বার বা ইন্ট।” তারপর প্রতিমাকে ও আমাকে এক পাশে গাঁড়িতে বলেন, প্রতিমার পা কাঁপাছে? ঠাকুর বলেন—“কস তোর।” আমাকে বলেন—“মনের জোড় আছে।” একটু পরে বলেন—“দুখে পেয়েছে। টিঁকনে ছুটি নিয়ে এসেছে। কলা ও বাগাম ছুড়ে দিতে দিতে বলেন—“লুকে নে” আমাদের বুঝ মজা লাগছে। এখনটি ত' কখনও সোঁনিগি। জানি না, পাই না। সাধু দর্শন করতে এসে এত আনন্দ তা কি জানি। কোলে বাগাম কলা নিয়ে হাস আঁধি। খেতে লজ্জা লজ্জা করছে। ঠাকুর বলেন—‘হা খেতে নে।’ একটু পরে বলেন—গান জানিস? আমি প্রতিমাকে সোঁনিগি বললাম, আমার চোরে ও ভাল জানে। প্রতিমা “চিরনবীন” শিব সুন্দর এই গানটিই গাইল।

সারা দুপুর কোথা গিয়ে গড়িয়ে গেল। ঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—“চল্ বেলাইব”। আমি হাঁ করে চেয়ে আছি—ঠাকুর বলেন “কিহে চল”। এ মেনে প্রজ্ঞাবে আমি বিমূঢ়। ইক্ষুলে ঘাপসা, তিক্তকিট্‌ ব্যাভিমিত্ত, ভলিগল, শিক্‌পি, ক্যারাম, ওয়ার্ডমেকিং আমার কতই প্রিয় সব খেলা। আর এখানে আজ খেলা, গান, কলা, বাদ্যম আর এত মেহ, মিথি ভালবাসা। এত সুন্দর করে কথা কওয়া আর অন্য খানে দেখেছি সাধুসম্প্রদায় কাছে মা বা মাতৃভূলা বারা তাঁরা বেশী পাত্তা পান। আমায়ে চোখের ইস্যারায় মায়েরা বলেন—বাইরে গিয়ে বেড়াতে বা দুপটি করে বসে থাকতে। কিন্তু এ কি রকম? একেবারে জল ডিসাডিং বেলা একটি মুঠুমুঠে সুন্দর সাধু সঙ্গীকে নিয়ে। আমার খেলা প্রীতি ছিল খুঁই তাই খুঁই ভাল লাগছে। কিছুক্ষণ জলকুমার খেলার পর লুকোচুরি খেলা। তার মাঝে হরি রামকৃষ্ণ, হরি রামকৃষ্ণ কলা। সবাই বেন নৃতন। এ বেন নৃতন এক জগৎ। নৃতন আনন্দ। নৃতন মেহ ভালবাসা। এ শূভক্ষণ জির নৃতন।

গতানুগতিক সংসার সমাজ পরিবেশের বাইরের রাজা, তাই ছোট বলনের মনে অফুরন্ত উচ্ছ্বাসত আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রাণের এ উল্লাস; প্রাণের এ টানটুকু নিয়ে মন কেমন করে উল্লস বাড়ী ঘিরে যেতে। তিন চার ঘণ্টার কি হোল। কেমন করে কোথা হতে কি হয়ে গেল। সেই মেহমাখা দৃষ্টিতে, মেহমাখা ম্বরে একদম্‌তে চেয়ে বার বার স্খাচাল্য কণ্ঠে মন জড়িয়ে বলেন—“আবার আসিবি। আবার আসিবি।”

অজানা আনন্দ, অজানা এক মন কেমন করা বেদনা সেই সবে সুন্দর। অসহায় অপরিণত দৃষ্টি। ভীয়ে এই প্রবলের প্রবল এক অবশ্যনীর আকর্ষণ নিয়ে কিহে এলাম সেদিনের মত।

আমার ছোটেকলার কল্লনার গড়া সোনার তরী পেরোঁছিল সেদিন জইন্দনের দিশারইক।

—ঃঃ—

তুই যে আমার প্রিয়

ঐজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক

কোনো কাজে তব লাগি না ত' আমি,
চাঁদ মৃৎপানে বে জগৎ স্বামী,
করুণার অর্ধি স্খা পান করি,
পরম কৃপার, প্রশামটি মোর নিও।
ঠাকুর বলেন, তুই যে আমার প্রিয়।

ভালারে আঁধার আলো কলমল,
ঢালো রূপ রস স্খাংশে পাগল,
শুভ অকৃপণ মমতা পত্র,
পরম কৃপার প্রশামটি মোর নিও।
ঠাকুর বলেন, তুই যে আমার প্রিয়।

অক্ষয় এ দীন বসে লাগে পাই,
কল্প হরয়ে ও মৃৎপানে চাই,
অভর হাসিতে ভীতুতার হরি,
পরম কৃপার প্রশামটি মোর নিও।
ঠাকুর বলেন, তুই যে আমার প্রিয়।

হেতুহীন কৃপা মায়ের নজর,
তুচ্ছ তৃণ কাঁটি পায় সমাদর!
দীনের দয়াল সুন্দর হে প্রভু,
পরম কৃপার প্রশামটি মোর নিও।
ঠাকুর বলেন, তুই যে আমার প্রিয়।

ঐশ্বর্য তীর্থ :

টাকা হারানো

স্বামী সত্যানন্দ

টাকাটা যে বড়ই মিষ্টি
সবাই জানে জানি
হারিয়ে গেলে আরো মিষ্টি
নেবে নেহাৎ মানি ।
ছুলো মনে একটি ছেলে
চলেছে পথেরে
কলকাতারই পথ সে, যে দার
গঙ্গা চলেন ধেরে ।
সঙ্গে ছিল পরের টাকা
কেমনে না জানি
হারিয়ে গেল পথের মাঝে
ব্রীল কামাখানি ।
হাপস্‌ হাপস্‌ দু'চোখ ঘেরে
করছে শব্দই জল
ফেরে সেবে পরের টাকা
নাই যে সম্বল ।
কারেই বা কম কেই বা আছে
গরীব ঘরের ছেলে
দু'হাত জুড়ে গম্বাভীরে
রর বে আঁখি মেলে ।
হঠাৎ মনে পড়লো গো তার
দীনবন্দ্র কথা
দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বিনি
বিনি গদু মিতা ।
ইহকালের গতি তিন
পরকালের প্রহু

ভুলেছিল আশ্রমকা তাও
মনে পড়ে তব্দ ।
কান্ডেরেতে দু'হাত জুড়ে
বলে দয়াময়
এত টাকা ফিরিয়ে দেওয়া
সম্বল যে নয় ।
অগতির গতি তুমি
দু'খের রাসের সাথী
অসম্মে আজকে প্রহু
ভাইতো তোমার ডাকি !
পাইয়ে বাও গো টাকাগুলি
নইলে যে যাই মারা
দীনের ঠাকুর আর কি পারেন
না দিরে গো সাড়া ।
গঙ্গা হ'তে উঠে আসেন
উল্লল আকুল রূপে
কাছে এসে হাতটি ধ'রে
বলেন চুপে চুপে ।
অদাবখানে পরের টাকা
বাস্তবত যে গো নাই
পাথর চাপা রাসেরে দেখ
টাকার খলিটাই ।
মিছিলে গেল দীনের ঠাকুর
পূর্ণ করে আশ
স'রে গেল তেজস্কপের
দু'খ ব্যথার রাস ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথায়ুত অবলম্বনে—পদ্ম আর ছড়া

—শ্রবুদ্ধ

—ব্যাঙের আধুলি—

এক বেঁটিল ব্যাঙ
আধুলি এক পেয়ে
দেগদেগে গ্যাল ছুটিয়ে
হাঁকতো ব্যাঙের ব্যাঙ ।

একদিন এক হাতী এল
গতটা তার ভিসিরে গেল
তাই না দেখে ব্যাঙ মহারাজ
দেবার তারে ঠাং ।

কল্লো—আমার ভিসিরে গেলি ?
লন্দা তুই কোথায় গেলি ?
জানিস্ আমি রাজা উজীর ?
তুই একটা চাং ?

হাতী শূনেও নাহি শূনে
ভিসিরে গেল গজগজনে
ব্যাঙ মহারাজ ঠাং ঝড়িরে
চ'গাচার ব্যাঙের ব্যাঙ ।

—১০১—

বাজনার বোল শূখে হর ইন্ত
শূখে আনা বার বেশ হাতে আনা শন্ত ।

বানর ছানা চাইনে হ'তে
বিড়াল ছানা হ'তে চাই
বানরছানা মাকে ধরে
বিড়ালী মা ধরে ছানার ।

কাক নিজেকে চালাক ভাবে
তাই মল্লা খেরে করে
ডেরানি চালাক হও যদি ভাই
ঠকবে তুমি আখেরে ।

সহজ মানুষ না হলে সে বার না চেনা সহজে
সবজ হবে সবল হবে তাকেই পায়ে সহজে ।

—১০২—

কিশোর রাজ।

ঐশ্বৰ্য্যদাম্পরী

ফাগুনের বিকালত চুলের দিনগুলির মাঝে মনে পড়বে কিশোর রাজার কথা। সুবর্ণের মত সাতজন্মের সুবর্ণভূত বাতাস ঝেঁজে গান বাজনার, লেখা পড়ার, খেলাধুলার, নৃত্যে শিল্পে কাব্যে সাহিত্যে। তাঁর দৃষ্টি একটী ছোট-বেলার সাহসের কথা শোন।

বীরভূমে ঘেঁষে কোলকাতার মেলে বেড়াতে। কখনও সিউড়ীর ভিত্তি বাড়ীতে গিয়ে আনন্দ কখনও চোড়ুরে গ্রামে। সেদিন চোড়ু গ্রামে সসী সাখীসের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে গল্প হয়, কখনও রেললাইনের ধারে কখনও অজন্মের নদীর তীরে, সেদিন রেললাইনের ধারে বেড়াতে বেড়াতে 'গেট ম্যানের' বার্তাগুলিতে মগ্ন হয়ে চরণ দুটি ভূবিরে চর্যামৃত করছেন ভগবান। কখনও কখনও সাহসের কথা আলোচনা হয়—ট্রেন এলে লাইনের নীচে কে শূরে থাকতে পারে। কখনো কিশোর রাজা সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে রেললাইনের নীচে শূরে পড়ে। এদিকে ট্রেন এসে গেছে বারী বাজারে। সাখীসের ভেতরে মৃৎ শূবিরে গেছে। ট্রেন চলে যাওয়ার পরে হাসতে হাসতে উঠে এলেন বীরপুত্র। কখনও অথবা, তাকে দেখে আনন্দের শব্দ নাই শিশুরাজার ঘৃণা দেখে। আবার কখনও সাহসের পরীক্ষা দেন। সসীসের নিয়ে ব্রীজের খেঁকে লাফান সবারে মিলে। আবার কখনও ক্রিকেট বল নিয়ে খেলা; ভয়জয়ের খেলা।...তোমরা ভাব কিশোরটী কে?—প্রিয়ান সত্যরত্ন, আমাদের ভগবান সত্যানন্দমথের।

—১০১—

“ভগবানকে ভোগ দিয়ে যদি প্রসাদ গ্রহণ করি, তো সেই প্রসাদের মধ্যে ভগবানের কৃপার স্পর্শ থেকে ধাবে। আর সেই স্পর্শে আহাৰ্য্য বস্তুর স্পর্শ দোষ ইত্যাদি সব চলে যায়। কাজেই দিবা, স্পর্শিত প্রসাদ খেলেও মন উন্নত হবে। সেই উন্নতি নিবেদন করে ষাওয়ার নিয়ম।”

✽

✽

✽

✽

“তোমাদের কর্তব্য যা কিছু সত্য, শিব, স্মৃতির প্রকাশযুক্ত সেই সব ভাবধারা ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। শিশুমনে সব সময়ে ভাল খোঁজার ধরে দিতে হয়। স্মৃতিতে সে সবার মনে হয়তো তারা বুঝতে পারবে না, কিন্তু বড় হয়ে বুঝতে পারবে, কি শিক্ষা পেয়েছি। তখন তারা তোমার শিক্ষার মূল্য মিতে পারবে। আমার Educational Theory হচ্ছে তাই।

—ঐশ্বৰ্য্যদাম্পরী

भजन

श्रीश्रीठाकुर सत्मानन्द देव

प्रभु कैसे तेरो गुण गाई
बचल चित मेरो, चरण सुलाई ॥
सूख गयी प्रेम यमुनाकी बारि
मरत न चावे नैना की धारि
हृदय निचोरी कहाँ तुझे बुलाई ॥

मेरो बसकी बसुरी आज़ु मरत सुमरि
बिना सुर बिहारी कौन बजाई ॥
तुँह परश रतन मोरि देखो दरश परश धरि
मलिन लोह होई कंचन कायी ॥



गीत

श्रीअर्चनापुरी मा

बोणाके अकेलापन में
अब स्तब्ध मये सब गुंजन
ओमल गये सब तारे
बस दीप अले एक अंगन ॥
आसनाके रजत मारग से
एक सपना उतर आया आँख में
बड़ा सुन्दर बड़ा मन्दर
मानो भौन मधुर एक बुम्बन ॥
शबनम के तो निदुराई से
मर गई थी हर एक कलियाँ
बेपताके देश गये बुलबुल
कर सूनी जीवन की डालियाँ
बाँदसे बाँदनी छीन कर लायी
राजवन की एक आशा
मन पंछी अब तो उड़ना
तेरे पंखमे आकाश का स्पन्दन ॥

भजन

स्वामी मृगानन्द

ठाकुर तुम्हारी कैसी ये लीला
चाहत जगाके छुपना चाहो
दिल दुखाके बनो रंगीला ॥
धीते विफल दिन रात भी गुजरे
(अब) मेरी नजर से मिलाके नज़रें
सुनावो फिर वो वचन सुरीला ॥
मैं तो जानूँ बस एक सहारा
मरण ना तोड़े आस से गहरा
जनम जनमका सोई आसरा
(अब) सुनको पुकार न बनो हटोला ॥

स्मृति तीर्थ स्वामी निर्वेदानन्द

अच्छी अवस्था सम्पन्न निष्ठावान परिवार की बड़ी पुत्रवधू होनेके नाते भालोमा को शुरु से ही धर्माचरण की शिक्षा मिली थी। साथ ही साथ वास्तव धर्माचरण भी करना पड़ता था। घरके सभी धर्म-निष्ठ थे। और फिर ठाकुर को घेर कर भाई बहनोंको लेकर एक धर्मचक्र सा गठित हुआ था। उन दिनों श्रीश्रीरामकृष्ण देव के लीला पार्षद युगाचार्य श्रीमन् स्वामी अमेदानन्द भारत लौट कर श्रीरामकृष्ण वेदान्त मठ की प्रतिष्ठा कर चुके थे। उनकी कृपा पा कर धन्य होने के लिये लोग उद्गमोव हो हुंठे थे। हमारे ठाकुरने तथा उनके अग्रजने पूज्यपाद स्वामीजी महाराज से दीक्षा ग्रहण किया।

युग युग में आधिकारिक पुरुष जब पृथ्वी की धूलिकी धन्य करने मानवी माता के गर्भ में जन्म लेते हैं, तो उनकी वाल्य तथा किशोरावस्था खेलकूद हँसी मजाक आदि के बीच साधारण रूपसे ही बीतती है। उनको इस अप्रकट अवस्था में उन्हें पहचानना उनकी कृपा से कदाचित् किसी भाग्यवान के लिये ही सम्भव होता है। ठाकुर की भाभी हमारी पूजनीया भालोमा इस याक की थी। उन्होंने पहले से ही ठाकुर को जीवोद्धार के लिये अवतीर्ण पुरुष के रूप में पहचाना था। 'भालोमा' नाम ठाकुर का ही दिया हुआ है।

भालोमा की दीक्षा की बात उठी। स्वामाविक ही था कि, स्वामीजी महाराज से ही दीक्षा ग्रहण का प्रस्ताव किया जाय। ठाकुर ने भी इस बात का

समर्थन किया। लेकिन भालोमा राजी नहीं थी। ठाकुरसे ही दीक्षा ग्रहण का उनका अटूट संकल्प था।

युगावतार भगवान रामकृष्ण के लीलापार्षदोंमें विशेष रूपसे मान्य तथा स्वयम् ठाकुर तथा उनके अग्रज के दीक्षादाता गुरुसे दीक्षा ग्रहण सौभाग्य की बात थी। किन्तु वह! राजी न होकर ठाकुर से दीक्षा ग्रहण को आकांक्षा तथा दृढ़ निश्चय दीक्षादाता पर कहाँ तक स्थिर विश्वास होने से सम्भव हो सकता है, यह सहजही अनुमेय है।

अन्तमें भालोमा तथा जैठामोशायक (ताऊजी) सनिर्वन्ध अनुरोधसे ठाकुरको राजी होना पड़ा और उन्होंने भालोमाको प्रथम कन्या तथा शिष्या के रूप में ग्रहण किया। उस समय तक भी ठाकुर मालकुल के सांनिध्य से दूर रहते थे। इसलिये ठाकुर एक जगह बैठकर होमानुष्ठान करने लगे, और दूसरी जगह एक कमरेमें बैठी शिष्या के पास मन्त्र लिख कर भिजवा दिये।

गहरी रात गये वह अनुष्ठान सम्पन्न हुआ था इसलिये विशेष किसीको इसका पता नहीं था। भालोमा गुप्तरूपसे सबकी आँख बचाकर ठाकुर के खड़ाई पर पुष्पाञ्जली देती, गुरु की तस्वीर को फूलोंसे सजाती। लेकिन एकदिन घरकी सर्वमय कर्त्री बूढ़ी ठाकूमा (दादी) ने देख लिया। जननी स्वरूपा भाभी द्वारा स्नेहास्पद देवरकी इस तरह पूजा — यह तो उनके 'प्रत'के अकल्याण का कारण बन आयगा! उन्होंने इसके लिये भालोमा को खूब

होता। अन्तमें जैठामोशाय ने जब रहस्य प्रकाश किया, तो कुछ शान्त हुई। फिर भी 'व्रत' के अकल्याण की आशंका मनसे सम्पूर्णतया दूर नहीं हुई। उस दिन किसीको, विशेष कर जिन्होंने ढाँट फटकार किया या उनको, इस बातका पता नहीं था कि, वो दिन दूर नहीं है अब श्रीश्रीठाकुरकी आध्यात्मिक शक्तिमत्ता का परिचय वाकर पूजनीय पूजनीय के रूप में उँची घाप पर बैठे सब के सब उन्हीं दिव्य पुरुषको मुक्तिपथ का दिशारी मान कर घन्य होंगे।

भालोमा ठाकुर को 'मा' के रूपमें देखा करती। यह इच्छाकृत नहीं था—वल्कि दर्शन-धन्य होकर ही उन्होंने 'मा' सम्बोधन शुरू किया था। दिल्ली, बाहवालपुर आदि स्थानों में उनको भी जैठामोशाय के साथ रहना पड़ना था। सारा दिन बिलकुल निःसंग साधिका जैसा जीवन बिताती। जैठामोशाय आफिस चले जाते। भालोमा एकान्तमें बैठी ठाकुरकी मूर्ति सजाती, पूजा करती, भोग तैयार करती, निवेदन करती और अन्तमें खुद प्रसाद ग्रहण करती। और जब मन होता ठाकुर की मूर्ति से बातचीत करती। इतने बड़े अफसर की सहधर्मिणी होने के नाते बहुतसे लोग उनसे मिलने आते, सभासमितियों में जाने के लिये निमन्त्रण करने आते, लेकिन उन अनादृश्यर सादेसीधे वस्त्रोंमें आवृत मारुमूर्ति को देखकर कोई फिर उनके करीब नहीं आ पाता। यहाँ तक होता कि, कोई कोई भालोमासे ही पूछ बैठते, मिसेस मूलर्जी कहाँ हैं? भालोमा सावधानीसे हट जाया करती।

डॉक्टर मूलर्जी (जैठामोशाय) की भी एक ही अवस्था थी। जबतक आफिसके काम में रहते तब

तक तो कड़े अफसर। पर विश्राम आदिके अवसरों में अपनी कुर्सी पर बैठे ही गहरे ध्यान में आत्म-समाहित हो जाते। फिर शामको घर लौट कर आध्यात्मिक आलोचना, संगीत रचना, भालोमा के साथ ठाकुर का प्रसंग आदि दिव्य भावों में समय बिताते। ये लोग जैसे इस जगतके मनुष्य ही नहीं थे—दिव्यानन्द में भरपूर, दिव्यशक्तिला अस्वादन में विभोर, दिव्यलोकके मनुष्य थे। मानो कोई प्रयोजन-वश आ पड़े हैं, और प्रयोजन शेष होते ही लौट जायेंगे स्वलोक में।

ठाकुर के श्रीमुखसे भी सुना है हमने—
“भालोमा की बात छोड़ दो, उसके विश्वास भक्ति की याह पाना मुश्किल है।”

अपने इकलौते पुत्रको कभी एक दिन के लिये भी साथ नहीं ले गईं। ठाकुरके पास ही उनका रहना पड़ना-लिखना सब कुछ हुआ। इसीलिये धनी पिता माता का पुत्र हो कर भी ठाकुर की इच्छा व कृपा से वह आकुमार ब्रह्मचारी रहकर पूर्णरूपसे साधु जीवन बिताने के लिये दृढ़ संकल्प है। और आज वह आश्रम का एक विशेष सम्म बन गया है।

❁ ❁ ❁

श्रीश्रीठाकुरने कहा है—सहज नहीं होनेसे सहज को पाना सम्भव नहीं है—‘वाल्कि की तरह विश्वास और सरलता चाहिये’, ईश्वर वालक स्वभाव है, और ईश्वर का जिन्होंने साक्षात्कार किया है वे भी वालक बन जाते हैं। इसलिये प्रकट अवस्था में उनकी देखभाल के लिये, उनकी जरूरतों को पूरी करनेके लिये, हरवक्त एक प्रबंधक की जरूरत होती है—ठाकुर की भाषा में जिन्हें ‘रसद्वार’ कहते हैं।

सिक्की में आश्रम की प्रतिष्ठा हुई अंग्रेजी सन

१६ ५ में। ठाकुर कुछ भक्तों को लेकर कभी काशीपुर कभी सिवड़ी रहा करते। एकदिन सिद्धासनास्थित मूर्ति को भोग निवेदन के विषय में चर्चा चलती। भक्तोंमेंसे किसीने कहा—पूजा भोग इन सबके स्वर्च के भ्रमेलों को कौन सम्भालेगा ? इससे ज्ञान ध्यानादि लेकर रहना ही भक्तों के लिये उचित होगा। किसी किसीने कहा ठाकुरकी मूर्ति रहेगी और पूजा भोग नहीं होगा, यह कैसी बात हुई ? अन्तमें पाँच पैसे रोज के भोग की व्यवस्था काफी कष्टसे चालू की गई।

ठाकुरका खुदका भी उस समय खानापीना सब मिलाकर दैनिक सिर्फ दस पैसा का स्वर्च था। आज भी दो वक्त जो लेते हैं इस मँहगी के बाजार में उसका मूल्य मासिक बीस रुपये से ज्यादा नहीं होगा।

धीरे धीरे जब आश्रममें रहने के वधेश्य में भक्तों का आगमन शुरू हुआ, तो उनका भार ग्रहण कर सकें ऐसे कुछ रसहारों की भी आवश्यकता हुई। ठाकुर के पूर्वाश्रमके वहनोई श्रीरामचन्द्र (हमारे पीसेमोशाय) और समुल्ले माई (हमारे सेजकाका) को हमने ऐसे दो रसहारों के रूपमें पाया।

आश्रमके मकानों की मरम्मत, आश्रमके किसी पुस्तक का मुद्रण, उत्तरवादिका स्वर्च दरिद्र-नारायणों की सेवा, संगीतानुष्ठान, सुधी-सम्मेलन आदि सभी आयोजनों का भार वे स्वेच्छा से अपने कंधों पर ले लेते थे। वस्तुतः ठाकुर के आदेश या निर्देश की बात तो दूर है, जरासा भी किसी प्रकार इशारा मिलतं ही, उसी क्षण उस काम को कर दाखना इन दो भक्तों का कर्तव्य हो गया था।

ठाकुर के सन्तानों में सेजकाका ही प्रथम

दीक्षित सन्तान थे। भक्तों में भी वे ही प्रधान थे यह बात ठाकुर के मुँहसे भी कई बार सुना है हमने।

काशीपुर उद्यानवाटी—जहाँ अवतार वरिष्ठने स्वेच्छा से शरीर त्याग किया था, जहाँ भविष्यत् विप्रव्यापी श्रीरामकृष्ण संघ का बीज बोया गया था, जहाँ श्रीरामकृष्ण के चिह्नित संतानों ने पूर्ण रूपसे त्याग तपस्या शुरू किया था, वही काशीपुर उद्यान-वाटी एक विदेशी वणिक् के हाथ सूअर के माँस तथा चर्चों बनाने के कारखाने में रूपान्तरित हुई थी। श्रीश्रीठाकुर के देशान्त के करीब साठ वर्ष बाद एक नवोदित शिष्ट प्रतिष्ठान—सिवड़ी श्रीरामकृष्ण आश्रम के जनक श्रीठाकुर सत्यानन्द देवके मनमें श्रीश्रीठाकुर की इस शेष लीलाभूमि के उद्धार की इच्छा जगी और इस विषय में चेष्टा शुरू हो गई। पहले अत्यन्त कठिन महसूस होने पर भी धीरे धीरे यह कार्य सहज होता गया। अन्तमें ठाकुर के रसहार पुण्यश्लोक श्रीरामचन्द्र वन्दोपाध्याय ने वाटी तथा वाटी-संलग्न सारी जमीन खरीदने के लिये करीब षेढ़ लाख रुपया ठाकुर के हाथों में दिया। उद्यानवाटी खरीद ली गई। आगे चलकर बेलुदूमठ के कर्तृपक्ष ने सिवड़ी श्रीरामकृष्ण आश्रम की गवर्निंग बाँड़ी से यह स्थान खरीद लिया।

क्रमशः भक्त संख्या, शाखा आश्रम संख्या, तथा सेवादिकार्यके लिये सरकारी योगसूत्र जैसे जैसे बढ़ने लगा, व.सकता था उसके आसपास एक शाखा आश्रम की जल्दतः महसूस होने लगी। वहाँ भी ये विराटमना भक्त दानशील हृदय लिये आगे बढ़े और सुरधुनि के पूरव पार में बेलुद के दूसरे किनारे युगतोर्थ दक्षिणेश्वर के पास, अपनी एक प्रकाण्ड उद्यान बाड़ी, जिसकी कीमत उस समय करीब दो

साख डपये थी, आश्रम को दान कर दिये। यहाँ बराहगुजर श्रीरामकृष्ण सेवायतन की प्रतिष्ठा हुई।

ठाकुर के किसी भी प्रयोजन को पूरा करने के लिये सेजका और श्रीरामचन्द्र कहने के पङ्क्ति ही तैयार रहते थे। हर विषयमें हर समय छोटे बड़े सभी काम के पीछे सेजका की सज्जग दृष्टि रहती। सामयिक रूपसे सारे आश्रमको सजा सजाया रखने में सेजका मानो आश्रम के गृहिणी थे। हमेशा ठाकुर-सर्वस्व हो कर रहते इन दो भक्तों के माफिक और किसीको नहीं देखा। वक्तपर ठाकुर इन दो प्रिय भक्तों को सजा देने में भी संकोच नहीं करते। उन्हें भी देखा है—ठाकुर की दी हुई सजा सर नवा कर ग्रहण करते। एकबार तर्क के जोशमें पिसेमोशाय ने आश्रम पत्रिका 'भावमुखे' को जोर से जमीन पर फेंक दिया। ठाकुर अग्रिमूर्ति हो उठे। कितने ही बड़े दाता क्यों न हों, आश्रमके मुख्य स्तम्भ और ठाकुर के प्रथम रसहार ही क्यों न हों, श्रीश्रीठाकुर और श्रीश्रीमा की मूर्ति तथा श्रीठाकुर की, श्रीमा की, तथा भागवती कथा ही जिसमें हो, ऐसी पुस्तक की अवमानना असह्य थी। आदेश हुआ, 'तुम अग्रकृतिस्थ हो, इसी क्षण आश्रम प्रांगण से बाहर हो जाओ'—वन्हीं का दिया मकान से उनका निर्वासन। एकबार हाथ ओढ़कर ठाकुर के मुँह की ओर देखकर सिर्फ बोले—ठाकुर आपकी यह मूर्ति तो मैंने कभी नहीं देखी। फिर उसी वक्त घर लौट गये। वैचैनी और अन्तरवेदना से असीर हुए रात के दो घंटे घर से निकल पड़े और कुछ पैदल कुछ टेकसी द्वारा चलकर रात तीन घंटे आश्रम पहुँचे। स्वामी निर्वेदानन्द उस समय होम कर रहे थे। वे वहीं बैठकर आप करने लगे। चार घंटे ठाकुर मन्दिर से

बाहर आते ही उनके चरणों में जा गिरे। स्वामी-मुन्दर ठाकुर उसी वक्त क्षमा कर दिये—एक अपरूप दण्ड था! ठाकुर उन्हें समझाते हुए बोले—भागवत, भक्त, भगवान् तीनों एक हैं—यह सिर्फ मुँहसे कही गई बात तो नहीं होनी चाहिये, आवरण में भी हमें दिखाना होगा। भक्तने आँसू धरी आँखों से यह बात मान ली। पूजनीय जेठामोशाय के देहान्त के बाद दिल्ली से लौट कर हमसे बोले—तैयार हो जाओ अब मेरी बारी है। बाहर के बहुतसे काममें उन्हें रहना पड़ता था, फिर भी उत्सव शरीर में सिर्फ अर्थ दान ही नहीं, बल्कि सारे सारे दिन खड़े रह कर बाहरी भक्तों के लिये प्रसाद ग्रहण की व्यवस्था, उनके सौटने का इन्तजाम वगैरह सब करके, अन्तमें खुद घर लौटते। दौलत के ऐश्वर्य से झुक हो कर विलकुल रिक्त सन्यासी हो जाने की अदम्य आकांक्षा वन्हींने काफ़ी दिनोंसे मनमें पोषण कर रखी थी। एकबार श्वदा स्टेशन से भक्तों की गाड़ी तथा मास वगैरह की गाड़ी रवाना करके वे स्वामी निर्वेदानन्द के साथ अपनी गाड़ी में बैठे बरानगर आ रहे थे। रात ग्यारह बज चुका था। जनवरी की ठंड उसवार कुछ ज्यादा कड़ी थी। आते आते बोसने लगे—“देखो भाई, इस जाड़े की रात में रास्ते के फूटपाथ पर ये जो नारायण के दल नंगे बदन सोये हैं—मन करता है दौड़कर जाऊँ और उनके साथ सोकर उनके दुःखमें शामिल हो जाऊँ। कितने दिन ऐसा किया भी है मैंने। गहरी रात गये नंगे बदन घरसे निकल कर उनके पास जाकर बैठे हैं और कुछ रूपये उनके सिर के नीचे रखकर चला आया हूँ। इसीको पक्का करने के लिये ही तो ठाकुरसे मंगता हूँ तुम्हारा यह गेरुआ वस्त्र, पर

ठाकुर देते कहा है ?” उनकी इस उक्ति में असत्य का आँच भी नहीं है। उनके देहान्त के पूर्व ठाकुर ने उन्हें गुमरूपसे सन्यास दिया था। ठाकुर के श्रोमुखसे भी सुना है—देखो, गहरी रात गये उसकी अन्तरात्मा का कन्दन मुझे चौंका देता है—नींदके घोर में वह जो अस्फुट ध्वनि कर रो उठता है, यह भी सही बात है। रेणुके मुँहसे मैंने सुना है। वह एक योगध्वज महःतापस है।

कही हुई बात को रखने के लिये ही जैसे उन्होंने मृत्युको वरण किया। शेष मुहूर्त के दो एक घन्टे पहले पोसीमा ने देखा—मुण्डित मस्तक, ज्योतिर्मय देह, हाथ में कमण्डलू, गेरुआधारी पोसेमोशाय दूसरे मुण्डित मस्तक गेरुआधारियों के साथ चले जा रहे हैं। पोसीमा चीख उठी—“वो चले आ रहे हैं, तुमलोग देख नहीं रहे !” यहाँ एक और चरित्र नहीं जोड़ने से बात असमाप्त रह जायगी। ये हैं हमारी पोसीमा—हमारी मा। विश्व की सारी माताओं की पवित्रता, ममता और निविड़ स्नेह को बटोर कर ही जैसे इस अपरूप मातृमूर्ति का गठन हुआ था ! उनका सबकुछ ही था मातृत्व से भरा। “योग्यं योग्येन योजयेत्” कहावत की इतनी बढ़ी सार्वकला बहुत कम पायी जाती है। एक ओर ठाकुर की सहोदरा दूसरी ओर श्रीरामचन्द्रकी सङ्घर्षिणी। दोनोंतरफ की मर्यादा को समान रूपसे बनाये रखते हुए निष्ठा के साथ संसार धर्म तथा पारमार्थिक धर्म दोनों के आचरण में युक्त रहकर चलने का वे एक प्रकृष्ट उदाहरण थीं।

आकाशरश्मीं बिराट मन लेकर स्वामी आये थे,

उनके पास रहकर उनके सारे सन्कार्यों में शामिल रहकर दान आदि करवाने में पोसीमा की भी समान प्रवेष्टा रहती थी। बचपन से ही पोसीमा पर विशेष देवी कृपा हरदम रहती थी और इसके मूलमें था उनका भक्ति-विश्वास। बचपन में एकवार छत के कमरे में भाई बदन खेल रहे थे, कि अचानक किसी अदृश्य हाथने कमरे की भिक्कली बंद कर दी। छोटे छोटे थे, इसलिये भिक्कली तक हात नहीं पहुँच पाया। तब गहरे विश्वास से रोते हुए ठाकुर को पुकारने लगीं—ठाकुर ! तुम भिक्कली खोल दो। थोड़ी ही देर में आश्चर्यजनकरूपसे भिक्कली खुल गई और वे मुक्त हुए। विवाह के विषय में भी एक परमहंस सन्यासीने उन्हें देखते ही कहा था—“अरे रानी बनोगी, तुम तो रानी ही हो।” उसी सूत्र से बात चीत शुरू हुई और कुछ ही दिनों में राजाओं की तरह अवस्था सम्पन्न घर की बड़ी बहू बन गईं पोसीमा।

साथ ही धैर्य और तितिक्षा की पूर्ण प्रतीक थीं वे। श्रीरामचन्द्र जैसे पति के देहत्याग पर भीर कण्ठसे बोलीं—“मेरा जो प्राप्य है मुझे वही मिला है, इसमें दुःख की क्या बात है ?” ठाकुर हर तरहसे उनके भी ठाकुर थे। इसलिये ठाकुरने उन्हें भी, सन्यास की दीक्षा दी। त्याग का मन्त्र उनके अन्तर में पहले से ही था, और अब तो ठाकुरकी कृपासे वह सौगुणा हो गया। और वे एक निष्कलुष त्याग-मूर्ति में प्रतिष्ठित हुई हैं। इसीलिये आज वे हमारी स्नेहमयी मा हैं—हर कार्य में हमारी सहायक हैं।

[बंगला से अनुवाद : स्वामी मृगानन्द]

अमिट स्मृति

सुन्दर गगन, सुन्दर भुवन, सुन्दर ये दुनियाँ, सुन्दर तो बहुत देख चुकी हूँ। सुन्दर पुरुष सुन्दरी रमणी। परन्तु ये जो अनूठा सुन्दर देखी यी ऐसा कभी नहीं देखी। ये सौन्दर्य जैसे बोल रहे हैं, मैं ही भगवान। इन देवताके आँखों में थी लाखों माँ की स्नेह की मारी। ये जैसे श्यामल धरणी पर सुधा की एक लहर दौड़ पड़ी।

छोटे छोटे वषे सब फूल से आकर आश्रम भगा रहे हैं कि ठाकुरजी से छेलेंगे। जब ही आश्रम पहुँच आओ तो देखो की देवना खेल रहे हैं। खुरी से वनंग से श्रीमुख कान्ति चमक रही है, श्रीअंग से गैरिक छटा विकीर्ण हो रही है। खेल ही खेल में मन में बस गयी भगवान की चाह। जब देखो सब लड़के लड़कीयाँ हाथ में लिये फूलके डारी, फूल तोड़ कर घर चले रहें हैं कि, माता बना कर देवताके गले में पहानायेंगे। इकादशी के दिन देवता रहे मौन और उपासी। छोटे छोटे वषे जान गये आज इकादशी है। वे सब मौन रख लिये और रह गये उपासी। ठाकुरजी इशारे से कह दिये वषों को पानी या दुध पीने को। किसीने इशारे से बोले दोदी नूँ पियेगी ? वे इशारा से ठाकुरजी को दिखाकर अखि तरेर कर मुझाव दे रही—वे जब तक नहीं पियेंगे तब तक हम भी नहीं पियेंगे। बस तो हम भी नहीं। सब बच्चे रह गये चुप चाप। अब ठाकुरजी ने एक उपाय किया। एक गिलास पानी में अपने चरणों का अंगुठा डुबो दिया। अब सब बच्चे पी लिए चरणामृत। ऐसी कठिनसे कठिन तपस्या बच्चे खेल ही खेल में शुरु किये। पाँच साल से ले कर सोलह

साल तक लड़के लड़कियों को लगन लगी तपस्या की। गरमी का दिन जब तेज धूप से चारों ओर जल रहा, तब ये सब बच्चे जलती हुई धरती में आसन लगाकर बैठ जाते तपस्या करने। जब धूप से जल पीले हो कर घंटे दो घंटे बाद आ जाते, तब ठाकुरजी के स्नेह की तरी में सब के देह मन तर हो जाते।

मुझे आश्रम जाने का मौका कभी कभी मिलता। जब आश्रम पहुँच जाती तो आँखों में माँ की स्नेह धारा छड़ेल कर देवता पास बुला लेते और अमृतमयी वाणी से कह देते “क्या रे तूँ आ गयी ? आन छुट्टी मिली ?” पिता माता साधु बने। उन सब के बच्चे साधु बनने की तपस्या करने लगे। ठाकुरजी को घेर एक आनन्द का मेला लग गया। आनन्दधनरूप देवता के चरणों में मैं भी प्रार्थना करने लगी कि मुझे भी संसार रूप कारागार से मुक्त करो। इसके बाद मुझे भी मौका मिल गया तीन चार दिन बाद आश्रम जाने का। प्रार्थना करने लगी देवता से छुटा दो अब मेरा बंधन, नित देखूँ चरण कमल और रह जाऊँ पास। देवता ने दिक् उमासा हँसो हँस कर फरमाया “अरे अब तो तीन चार दिन बाद आ रही, फिर आओगा दो दिन बाद फिर एक दिन बाद, फिर रोज रोज। फिर और नहीं आओगी यही” पर रह आओगी, ” क्या बनाऊँ, मेरा आश्रम-जीवन इसी तरह से ही सुख हुआ था और जिसा अनमोल साधु जीवन, ठाकुरजी की कृपासे जीवन बना अमृतमय।

बसविन एक मुहावनी सन्मया थी। मन्विर् में

आरती हो चुकी। आरती के घनन गा कर दो छोटी छोटी लड़की एक छोटे से कमरे में छुप कर सोने लगी। अंधेरा घर में अचानक खट खट अवाज आई। तब सितरी आभ्रम में बिनली बत्ती न थी, लाटन का जमाना था। दोनों डर के सारे घर से निकल पड़ीं। लाटन लाठी हाथ में लिये देखने आये सब। देखा एक कात्ता कुत्ता कुत्त खाने के लिये अपना सिर चला दिया कनश्तर के अन्दर और निकलना मुश्किल हो गया। बड़ा बुरा हालत था कुत्ता का। यह मजा पाकर सब हँसने लगे और कुत्ता इधर उधर घूमा खाने लगा, परन्तु देवता देखने लगे दरदमरी नजरों से—दरद से रक्तिम हो उठा श्रीमुख। उनके

आदेश से सेवकने कुत्ते को इस हालत से मुक्त किया।

कोई पगली अपने छोटे से बच्चे को आभ्रम के दरवाजे पर छोड़ गयी। शीतकाल था। बच्चा जाड़े में ठिठुरता और रोता रहा। देवता कम्बल टाट मंगवा कर बच्चाको जाड़े से बचाये। समय पर उसे खिलाने पिलाने का हुक्म दिये। देवता की दयासे वह बच्चा बच गया। ऐसी घटना बहुत है। यह था देवता का हमदर्दी रूप। इन से बढ़ कर दयालु, इनसे बढ़ कर स्नेही और इनसे बढ़ कर सुन्दर और कोई भगवान है क्या ?

वेदछन्दा

श्रीठाकुर सत्यानन्द देव की वेदवाणी

❧ नवीनता सर्वत्र है। फिर एक ओर से सोचा जाय तो नवीनता कहीं है ही नहीं। वही एक ही वस्तु घूम फिर कर विभिन्नतया प्रकाशित होती है और नवीन की भाँति प्रतिभात होती है। नया कैसे हो सकता है ? उस ब्रह्म से ही तो जगत है। उनके सिवा कोई super (सुपर) ब्रह्म तो हो नहीं सकता ! मगर उनको चिरनूतन कहा जा सकता है। कारण वे अनेकों रूपसे सृष्टि में विलसित हो रहे हैं। पाश्चात्य दर्शन में उन्हें Elan vital (इलान व्हाइटल) कहा गया है।

❧ यह जगत अन्ततया शांति कल्याण का ही राज्य है। परन्तु मनुष्य ही इसको अशांति से भर देते हैं। अगर योद्धा सा समझ बूझ कर पड़े, श्रीठाकुर का नाम लेते हुए सत् भाव से जीवन बिताये, तो अवश्य ही समझ पायेंगे—यह पृथ्वी कितनी शांति व आनन्द

की जगह है। प्रकृति की ओर ताक कर देखो—चारों तरफ कैसी शांति विराज रही है, कैसा कल्याण का वातावरण है। उन्होंने एक के आगे एक सबकुछ देकर हमारे लिये कितनी सुविधा कर दी है, अपनी सृष्टि को कैसा सजा कर रखा है। इसे न समझ कर हम अपने मन की मलिनता व हीनता की नजर से जगत को देखते हैं और नित नया मगढ़ा मचा कर दुनिया को अशांतिपूर्ण कह देते हैं। लेकिन इकीकत यह नहीं है। यह जगत उस मंगलमय का जगत है। इसीलिये आखिरकार यह एक शांति कल्याण का ही साम्राज्य है।

❧ बहुतेरी समस्याओं के बीच भी श्रीठाकुर का हमरण रखना चाहिये, यहीं तो मन की परीक्षा है।

❧ हरिमय होओ, हरिचरणायित होओ—मन वचन-कायासे। —[अनुवाद : स्वामी मृगानन्द]

The Lord's Play

Swami Satyananda

The world at our feet—an electronic play
You of science have none other say
But the super-unconscious in voice so grim
Cry aloud Oh ! it's not so much serene
Electrons play and the do indeed
But can they love with floral wreath
Can they sing with sweet embrace
And longing look blue-bell grace
Such things happen even this day
No love is lost and He returns the play
Lend your ears and listful be
In this crowded city He plays in glee
A Brahmin poor but pious at heart
Dreams at peep of day while inert
The Lord of love Krishna in glow
Come to speak sweet and low—
Get a garland this day in time
It is not so costly and a few of dime
Would fetch you right from the market on way
You say—runshort, Oh don't dismay
The priest startles and thinks in him
Am I beguiled and it's only a dream
The work ushers, he trips withal
And breaks the journey to buy a wreath from the stall
The shopman showed a wreath so fine
It was just what he saw in dream design
The price was just what suited in line
The only wreath that was fresh and subli
Psychology says it is wish fulfilled
But a voice beneath can never be stilled.

Swami Satyananda Deva—a poet of Divinity

Compiled by—Swami Shivananda

A Poem, Shelley says, cannot be made. It is born as a flower bursts into crimson stain. Poetry grows naturally as the leaves of a tree. If it does not, it is better that it should not grow at all. That was the romantic conception of Poetry. All the Poets of the nineteenth century believed that Poetry is the profuse strains of unpremeditated art.

In the twentieth century, Poetry seems to have fallen on evil days. Poets by and large believe in effort. Composition has become more conscious, and there is always a striving after effect. The element of musicality has become a rarity. Such Poetry is the Poetry of art and intellect, and not the Poetry of the soul. It has its appeal to the intellect and leaves the emotional and imaginative sensibility starved. It is not the rhythmic creation of beauty.

Swami Satyananda appears to be an anachronism in the modern age. He is a Poet who compares favourably with John Keble, John Henry Newman, St. John Perse, and Francis Thompson, has all the mystical glow, religious fervour and beatific vision of those writers, to whom Poetry became a revelation. Such writers were the patriarchs of the Bible, and the Rishis of the Upanishad, whose stock to-day in the materialistic age, has become pretty low. As civilisation advances, culture and religion decline. Swami Satyananda has thrown a challenge to those writers who prize Mammon above God, and consider man to be a rational animal, and nothing more. To Swami Satyananda man is the child of immortality, to him, man is divine. He retains the sincere conviction that out of the saturnalia of passions and fury, violence and suffering will emerge a better world where man will get back his lost heritage that he has ruthlessly and sneeringly spurned to day.

If true poetry is the spontaneous outpouring of powerful feelings, and if in this age of cynicism and Pseudo-Intellectualism it is accepted that true poetry springs from the heart and goes straight to the heart, Swami Satyananda's poems should be hailed as belonging to this class of genuine poetry. All the Poems in his book, 'Song of the Soul', be they on Sri Sri Thakur, or on the Holy Mother, or on Swami Vivekananda or on Swami Abhedananda have welled out of the poet's heart and have an unmistakable ring of sincerity about them. In them there is nothing conventional or platitudinous. The rounded perfection and felicity of expression have immeasurably heightened their charm. There has been no attempt at phrase-mongering. The glowing tributes to Sri Ramakrishna, the Holy Mother, Swami Vivekananda and Swami Abhedananda are all paid from a rewarding angle. So many poets and savants of India and abroad have written about them in effusive terms. But Swami Satyananda's verse is not rehash or

carbon copy of them. It is strikingly original. For it is written by one who has a rare poetic gift and a rarer mystic vision. Such Poems are the outpourings of a mind in deep meditation on the Supreme Being. They have in them the traces of a communion with the over-soul. They have in them the light that never was on sea or land.

His poems are rare combination of a true Poet's imaginative faculty and emotional fervour, always under control, with the deep faith of a true devotee in the Divinity of the Mother, in the grace and compassion of the Lord of Dakshineswar, in the clarion call of the cyclonic Swami Vivekananda and finally in the sweet assurance given to him by his Guru who spoke to him, 'I stay for thee,' and whom he seeks with a passionate yearning in a language that breathes poetry, "Abhedananda Thee I seek."

The Poems in his book, Song of the Soul are the concrete and artistic expression of a soul in emotional and rhythmical language. The untranslatable delicacies of colour, the subtleties and nuances of expression, the rich melody and verbal marvels, and above all, the extraordinary syntheses of thought, content and music have made the poems unforgettable treasures that will not only inspire the posterity with its beauty but also encourage them to delve more deeply into the rich spiritual dimension of the great Soul. In conclusion, we pray, 'In a world torn by passion and lush, while life is callous and cold; the only hope is the 'Song of Heaven', to be played on the Flute by the Lord of Dakshineswar.

—40—

World Philosophy, World Ethics and World Psychology—three outstanding contributions of Srimad Swami Satyananda Deva

Compiled by—Swami Shivananda

The author, Srimat Swami Satyananda Deva who is essentially a Godly personality has traversed his way, with that spiritual disposition, through the three worlds—World of Philosophy, Ethics and of Psychology. These three great works are the fruits of his widest possible study, erudition and a penetrative insight. The chief merit of these three books lies in bringing together within the area of a small compass almost all the Philosophical, Ethical and Psychological views of representative thinkers of the East and the West respectively.

According to Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, Swami Satyananda did a great job in writing the book World Philosophy as an world outlook is an imperative necessity for breaking down the physical barriers and establishing the intellectual affinities. The world is a unity in diversity. The World Philosophy gives us divergent currents of

thought, as also the unity underlying them all. This underlying theme is the music of life, it is the ruling principle, the keynote that runs through every soul. We should know this in order to live in harmony with the cosmic process. As there is a philosophy of the Greeks, a philosophy of the Indians and so on, so there is a philosophy for the whole world; and the master principle behind it is truth, Satyam. We may call it by any name whether God in heaven, Brahman of the Vedas, Ahuramazda of the Parsees, Allah of Islam, Tao of the Chinese or only a void of Nirvan but we have to be united with it through love.

The author has given his Interaction complex theory of knowledge in the World. Philosophy Which is given here in nutshell: "knowledge, in the author's opinion, is an interaction complex. It is an interaction in the sense that the subject emerges out and becomes one with the object, and the object also comes into our consciousness through some medium to become one with the subject. Now, in this interaction, both the subject and the object take part as living and sensible. Both are active to react and act on each other. There is Prehension' in both. But these two do not act equally, our mind is more active and more Potent; it is complex in this sense that the subject mind has many impressions and instincts (Samskaras) both racial and individual. These take part in the shaping of human knowledge. Again, the object is being modified by the individual soul's impact, in the act of knowing. If according to Jeans, the emerging Photon kicks and alters the atom that it leaves, the mind or soul emerging from the subject can be presumed to alter the subject. It also alters the object on which the impact occurs. Thus both subject and object undergo a double change. This interaction serves as a corrective to the knowledge that is our Quest. when we see a hill from a distance we get the impression of its small size by our sense of sight. But our soul reaching out knows the size of it.

This individual interaction alters the cosmic subject and object. So knowledge is micro-macrocosmic re-arrangement of the scient vibrations existing in the subject and the object. This re-arrangement leads us from truth to truth which has no end. Thus the theory gives us highly dynamic nature of knowledge. Viewed from lower strata, it is an interaction to reach the higher knowledge, and viewed from the higher, it is a play of the Being for Becoming.

World Ethics—is in the main a compilation of the ethical ideas and principles which have been forming the basis of individual and social actions in diverse climes and ages since the days of Rgveda.

Ethical speculations stem from the consciousness of the opposition of good and evil. That there is evil and imperfection which has to be over come and transcended was present to the human mind, particularly of thinking men and women is a truism not capable of being repudiated. This is confirmed by the survey of the ethical ideas from ancient times to the present day as given in the World Ethics.

Ethics is a universal science, which has relevancy in every field of intellectual activity. Ethics analyses the factors of the human mind which tend to ennoble the

individual or debase him. In one word, it serves to present the results of its enquiry and directly or indirectly help in the formation of character. Ethics has formed an essential part of philosophy as moral science and practical ethics is the basis of religion. Whereas religion in the main relies on faith based on intuition of the gifted sages and seers who have promulgated the truths envisaged by them. Philosophy seeks to find out the rational justification of the professed dogmas by reasoning. Such is the case with moral science vis a-vis the moral precepts advocated by religion.

So far as ethics of Hinduism is concerned, the author has tried to dispel the notion that there is no ethics in Hinduism.

Unlike Bertrand Russell, who decries the association of ethics with religion and condemns both, the author views them as closely connected and recognises the contributions of practical ethics towards man's spiritual progress. Pointing out the distinction between the animal mind and the human mind, he declares that the former cannot reach the spirit which is the top most rung in the ladder of life.

His own views on ethics are that the will to be good is the first principle upon which our ethical life depends. This will should be developed by selfless, austere life, a divine life that reaches divinity. He emphasises good will in ethical pursuits.

Aware of the influence of environment on man, he advises us to get our environment ethically charged by our ways of life and keep it alive like a magnet-charged field.

He writes : ethically conditioned reflex should be practised to produce recoil in the nervous and bodily systems by electrodes or by strong autosuggestions when objects that arouse non-ethical ideas are put in contact.

World psychology contains almost all the psychological findings of all thinkers since the time when 'Soul' was the subject of study, up to the present age when on one side 'behaviours' and on the other 'Para-Psychological probings' have figured most in the study of psychology.

Psychology is now a full-fledged science not only of the mind or of the body in particular but of all the activities mental and physical. This science has been carrying on wonderful experiments over a wide range of spheres in the life of human beings and animals. Newer truths are unfolding with the application of newer methods of experiments in the newer regions of physico-mental existence.

The author, himself a spiritually realised saint of the highest orders had the much-needed experimental outlook of a scientist and actually carried on some experiments in religious psychology—as we may call it with some of his admirers as his subjects. He had his telepathic communion with persons living a thousand miles away ; with his will force he helped others when they prayed for a 'speeding up' of their 'Japa' or repetition of God's name ; he used some scientific instruments like vibrators, electric lamps, as devices to help their meditative concentration, he explained his theories of 'Mathematical Japam', 'Pranayam' etc, demonstrated his experiments on 'division of attention' with the subjects attending at the same time to reading of a book and doing

Japam, he thought of methods of 'substitution and sublimation' of psychoanalysis and tried them, by allowing the spiritual aspirants to indulge in theatrical performances of plays written on holy lives, music with elevating songs, literary works composed on divine themes, games and many other activities of 'Catharsis', in order to prevent frustration in their minds. Thus, throughout his life he was an experimenter and this outlook permeated all his activities and his world psychology as well.

—:0.—

Divine Name and the Divine Reality

Swami Bimalananda

Sri Sri Ramakrishna Deva used to say, "Nām Nāme Abhed"—the Divine name and the Divine Reality are identified and one. It seems that the practical implication of this saying is that repetition of Divine name, 'Japam', brings the devotee in close contact with God, the Divine Reality, bestowing thereby a reorientation of the self, 'Jīvātmā.' Socially though a brahmin priest of the Dakshineswar Kali temple of devoted Rani Rasmani and although known as a person bereft of academic sophistications, Sri Ramakrishna Deva has been regarded as the Divine Incarnate of this age. People really wonder when they read about the amazing simplicity and straightforward way of His life and sayings. We cannot but infer that His life and sayings are practically the divine expressions of His spiritual realisations. As such, when He says, "Divine name and Divine reality are identified and one", we begin to believe in this. The history of spiritual tradition also upholds this. Sri Sri Gouranga Deva also encouraged people in the same strain. "Hare'r nemoibe kevalam", and He prescribed singing of the great 'mantram', "Hare' Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare; Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare." Saint Eknath of the South and Saint Tukaram also taught the devotees repetition of God's name 'Krishna' & 'Bithala.' Singing God's name as 'Giridhari Gopala', saint Mirabal had the divine vision of the Lord to her full spiritual satisfaction. Saints like Sri Suradas, Kavira, Tulsidas and Nanak were also fully devoted to singing Divine Names of God 'Gopal', 'Rama' and 'Hari', and all such 'Sadhenas' had the spiritual bliss which inspired thousands of their admirers. 'Ave Maria' and 'Allah Akbar' are the echoes of the same Divine realisations of the Saints. Thus, many such saints of the world sang the name of God and were graced with faith in God, love for God and spiritual bliss.

Sri Sri Thakur Satyananda Deva, a saint of this age, in spite of all his academic acumen and versatility in philosophy and science, used to teach the devotees and seekers how only repetition of Divine name can grow devotion, faith and love for God-realisation. We saw him discussing varied topics and deeper problems of life and

thinking with the Holy personalities of different religious orders, professors and savants of this age coming to Him from within India or from abroad. Strangely enough, at the time of discussions he could at ease rise above all sophistications of modern times and explain easily in a very simple and straightforward way all these questions from his own standpoint of spiritual realisations. Even those who were bent on doubting all these faiths and propositions as superstitions, really developed a contradiction within themselves and started thinking a little more positively. They saw that Sri Sri Thakur in spite of his scientific and logical attitude of mind, did unequivocally prescribe repetition of God's name or 'Japam' as the basic process of spiritual uplift. That is why every year, either at Surl Sri Ramakrishna Ashram or at Baranagar Sri Ramakrishna Sevayatan, the renunciate and non-renunciate devotees attended a 'Havan' ceremony of sacred fire service lasting for an unceasing period of a week or more. During the period, Havan, Japam, reading from the holy books and Nama-kirtana were held round the clock.

Moreover, every year Sri Sri Thakur gave us a couple of lines containing the name of God for us to sing aloud throughout the period by turns. The attendees sang these lines sometimes individually and sometimes in groups. One of such divine couplets runs thus, "Sarode Shive' Trinayanae Ramakrishna Rakshamam; Sarode Shive Bhabatarinee Ramakrishna Pahimam." This is perhaps the last one handed over to us by Him. Since then, every year during that continuous 'Havan' service and also on different other occasions of worship the devotees sing these lines with prayers and devotion.

Now, going back to the original proposition 'Nam Namee Abhed', we can refer to Sri Thakur Satyananda Deva's expositions. He told that whenever we begin to love an object, the name of the object of love peeps into our head and heart time and again. Thus the 'Japam' goes on. Moreover, if I am a seeker of Divinity, the realised preceptor gives me an 'Istam' or the form of Divinity I would meditate on. The 'mantra' contains the 'Ista-name'. If I start loving Him more and more His name will be dear to me as an object to talk about. This is in a form 'Japa' or 'Namakirtana'. Our personality begins to transform towards a spiritual uplift when Divinity as the loving object begins to unfold itself in and through our intelligence and emotions. Nama kirtana helps the process a lot even if it is done mechanically.

Yet, a sceptic may still ask, "what is the gain?" The reply to this is, "If you are not a seeker of the spiritual truth, you need not bother now; but if you are a seeker, please do it and see what you gain by this."

— ❦ —

Let us work without desire for name or fame or rule over the others. Let us be free from the triple bonds of lust, Greed and gain. And the truth is with us.

—Swami Vivekananda.

Ramkrishna Vivekananda Movement

Prof. Premballav Sen

Prof. Danilchuk of the Mosco Oriental Institute paid a visit to Sree Satyananda Devayatan on 21st December, 1993. He was offered Sree Thakur's blessings by Sree Archana Ma and welcome by the Sannyasis of the Asram and was introduced to the audience by Dr. Jhara Basu. Prof. Premballav Sen was then requested to give a discourse on the significance of Ramakrishna Vivekananda Movement. The gist of Prof. Sen's discourse is given below.]

The Ramakrishna Vivekananda Movement is a movement of very great significance in the history of the world. Two forces have played the dominating role in giving shape to the human life and society. One was the force of bringing cohesion among large number of men through compelling military strength with the aim of making social life easy and materially prospectus. The other was the force of unifying men through the cultivation of higher mental qualities which finds expression through Art, Literature and Philosophical thoughts. In the 19th Century these two forces were facing a trial after centuries of development in their respective spheres. The authoritarian experiment based on physical force led to series of sanguinary wars and enslavement of men by the creation of successive empires. The peaceful channel was utilised by Philosophers, Artists, Musicians and Poets to unify successive generations of men in different countries of the world through their creative talents promoting a feeling of love and human brotherhood.

In the 19th Century the world was facing a crisis as different and opposing forces were trying to establish supremacy by monopolising the right of shaping the life of man. Big empires attempted to bring men within the imperial fold that was to unite them by bringing them under one political structure. Utilitarianism and other secular movements stood for looking upon man as purely a creature of the world whose only worthy craving was the desire for living a smooth life centering round worldly pleasures. All ideas about the spiritual aspect of life were ridiculed and rejected. The result was that imperialism was extending slavery and exclusive secularism were destroying all the deeper and nobler feelings of the human heart. With the secularists material prosperity was the only thing that mattered and consequently all human efforts were directed towards achieving fulfillment through the enjoyment of worldly pleasure and possession of wealth. In these two fields human conflicts had led to savage and sanguinary clashes. Sree Ramakrishna came to point out that man must overcome the mad rush for material possessions and enjoyment, and then only the unfoldment of the inner wealth of human life would be possible. Proclaiming the message of Sree Ramakrishna, Swami Vivekananda fearlessly declared that lure of gold and the lust for

earthly joys were bound to disfigure human society with the sordid touch of greed and licentious living. He drew attention to the real dignity of man which could be felt only after realising the spark of divinity that is inherent in the life of every one.

That is why Vivekananda travelled over half of the world to proclaim the great truth that he found so wonderfully manifested in the life and the teaching of Sree Ramakrishna. In brief, the coming of Sree Ramakrishna revealed the idea that an individual's life was meant for securing his own liberation as well as contributing benefit to others. The collective life of man had no chance of becoming faultless until the individuals forming the basis of the collective life were good. At the same time, if the individual is callous to the improvement of the collective life, its own excellence however well cultivated that may be, will ultimately fail to confer real benefit to it. Upliftment of the individual life joined with the aim of social improvement is the need of the day. Therefore, Swamijee wanted everybody to proclaim the God within and not to deny Him. Neither economic plannings, nor political systems can serve any purpose if the human element is not properly regenerated. This most essential regeneration of man is possible through the spiritual unfolding and development of the inner Divinity. The divine element in man exists with all its perfection, but he has to develop his realisation of inner perfection. Today this transformation of man the animal, to man the transcendental, has become the most urgent problem. To solve the problem the journey to inner sublimation has got to be combined with the march for an all round betterment of the world in different fields of human activity. In this march of humanity towards the total betterment of the world mankind is to proceed as the standard-bearer of Sree Ramakrishna and Swami Vivekananda.

—10—

Sister 'Nivedita'-or-the Dedicated One

Kalikinkar Sengupta

1]

Swami Vivekananda left us two great disciples to prove the Great Dynamo that he was, emanating heat, light, electricity and magnetism to all who came in contact with his person or happened to read his speeches and writings. One was Sister Nivedita, the other was 'Netaji'.

Romain Rolland said 'I cannot touch these sayings Swami Vivekananda's, scattered as they are through the pages of books at thirty years' distance, without receiving a thrill through my body like an electric shock. And what shocks, what transports, must have been produced, when in burning words they issued from the lips of the hero !'

Sister Nivedita heard his 'burning words' directly from him—these incendiary bombs that fell upon her, burnt the dross of her baser self and transformed her,—'Miss Noble — into the precious Noble metal of right real Gold.

BHABMUKHEY

Like Rolland, Subhas Chandra, 'while yet a boy, felt the thrill through his body' and exclaimed that Swamiji entered his body through those words that infiltrated into and permeated every fibre of his being. Presumably, Swamiji transformed him into a valiant 'Napoleon', expurgated of the element of tyrant that tainted that great and dreaded figure of history. It was this transformation that sowed the seed of 'Netaji' that Subhas Chandra became in his later life. For, Rolland has said of Swamiji that 'he suffered from that excess of power which insists on domination and within him there was a Napoleon'. That explains how that 'Napoleon' in Vivekananda begat the 'Napoleon' in Subhas Chandra and made him 'Netaji' in the history of India's fight for Independence.

The message of Swamiji was the message of strength and of self-reliance. He said 'Above all, be strong, be manly. I have a respect even for one who is wicked so long as he is manly and strong for his strength will make him someday give up his wickedness'.

He had a beautiful voice 'with deep vibrations that filled both hall and hearts... piercing his hearers to the soul'. Emma Calve described it as 'an admirable baritone, having the vibrations of a Chinese gong.'

It was his aim to rouse the higher conscience of Hinduism to elevate its woe-begone and ill-fated members at its lowest strata and give them recognition as equal partners in the sanctuary of that great faith regardless of all consideration of caste, culture or position in society.

His approach was neither aggressive nor iconoclastic. It was an appeal to human sympathy and reason, so that 'reform' would sprout from within and not have to be grafted as an exotic from without. For real progress means that,—as in a tree,—so in human society,—the sap should rise from the bottom of the roots and course and carry nutriment to every part of the entire tree.

'What good is the reading of the Vedanta to me? We have to realise it in practical life.' He asks 'what consequence is it to the world if you or I attain to Mukti (Liberation)? We have to take the whole Universe with us to this bliss of liberation' condensed from 'Book of Vivekananda's Dialogues'.

Vivekananda has been aptly compared by Rolland with a lofty edifice, which bears a twofold impress. "The basement is a nursery of apostles of truth and social service, who mix in the life of the people and the movement of times. But the summit is the lantern of the dome, the spire of the cathedral, the Ashrama of all Ashramas, where the two hemispheres, the West and the East, met at the confluence of all mankind in absolute Unity". He had the satisfaction to see that he had laid the foundation of the Ramkrishna Math and Mission in May 1897 a great religious and social service order, by which he had inserted, in the meselve block of India, 'a level' for the upliftment of humanity (letter of July 9, 1897). He completely demolished the separatist Kink of Kipling's perverse hypothesis that 'the twain i. e. the East and the West shall never meet'. He sought to set free the sleeping forces of the enslaved Spirit and thus 'to reawaken God in Man'.

To be Continued)

With Best Compliments Of :



Gram : COKEOVEN, CALCUTTA
Telephone : 24-4492, 24-5980

INDIA POTTERIES LTD.

Manufacturers of :

Electrical Insulators upto 33 kv range as per I. S. Specification
And

Quality Tableware, 'India' Water Filter, Filter
Candles, Figures, Dolls, Toys, Industrial
Ceramics Etc. Etc.

Factory :

8, Nilgunj Road, Belgharia,
Calcutta-700056
Phone : 58-1199

Office :

91, Dharmatala Street,
Calcutta-700013

**'SAFEX' LAMINATED SAFETY GLASS
TOUGHENED GLASS
"TWINBIRD" MIRRORS ETC.**

Manufactured by :

Hindusthan Safety Glass Works Private Ltd

**2, ST. GEORGE GATE ROAD, HASTINGS,
CALCUTTA-22.**

Gram : "DEVGLASS"

PHONE : 45-0125 (2 Lines)



পরিচয়—স্বামী পরমানন্দ । সম্পাদক—স্বামী অরুণানন্দ ও স্বামী নীলানন্দ । প্রথম শিল্পী—ডঃ লক্ষ্মণ চিত্রা ।

প্রিন্টার—সেবাস্তন, ২নং প্রাণক সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভাবান প্রেস,
মহাশিল্পী, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রিত (ফোন : ৫২-৫১৭২) । মুদ্রাকর ও প্রকাশক—স্বামী পরমানন্দ ।

এই সংখ্যা : তিন টাকা মাত্র ।

বার্ষিক মূল্য : চৌদ্দ টাকা মাত্র ।